~ www.amarboi.com ~

আলবেয়ার কামু-র ছোট গল্প

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলবেয়ার কামু-র ছোটগল্প

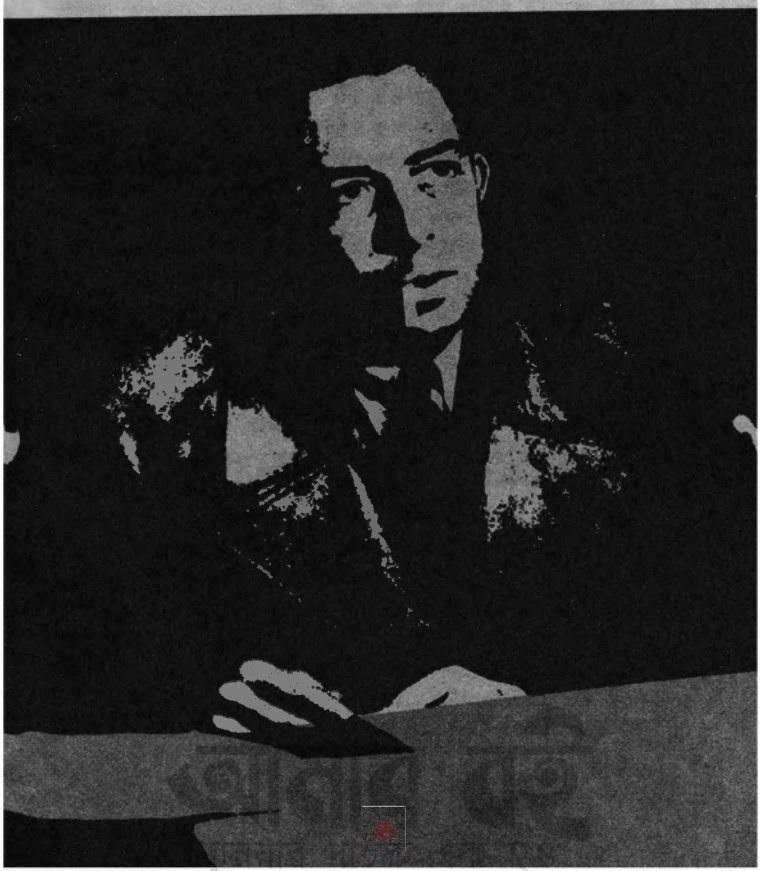

~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
তপন মাহমুদ
বিজয় প্রকাশ
১২ বাংলাবাজার, ঢাকা

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
নাসিম আহমেদ

কম্পোজ
শাওন কম্পিউটারস্
৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টার্স
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র ।

ISBN 978-984-8988-55-8

Alber Camur Chhotogalpo Translated by Kaish Ahmed edited by Avijit Deb Roy Published by Tapan Mahmod, Bijoy Prokash, 12 Banglabazar, Dhaka-1100. First Published February 2012. Cover Design Nashim Ahmed
Price Taka 150.00 [illegible] $ 6

~ www.amarboi.com ~

সূচি

স্বৈরিণী ৭
ধর্মদ্রোহী ২৩
মৌন মানুষেরা ৩৯
অতিথি ৫১
কারুমগ্ন শিল্পী ৬৪
বর্ধিষ্ণু শিলাখণ্ড ৯৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বৈরিণী

জানালাগুলো বন্ধই ছিল, বাসটার ভেতরে একটা ঘর-মাছি চক্কর দিয়ে যাচ্ছিল সেই তখন থেকেই। খুবই বিসদৃশ্য দৃশ্য, ক্লান্ত পাখায় মাছিটা নিঃশব্দে উড়েই চলেছিল সামনে-পেছনে। মাছিটাকে জেনিন আর দেখতে পেল না। তারপরেই চোখে পড়ে গেল, মাছিটা নেমে এল তার স্বামীর স্থবির হাতের ওপরে। ঠাণ্ডার দিন। বাসের জানালায় ধুলো-বাতাসের প্রতিটি ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল মাছিটা। শীতের সকাল। অল্প আলোয় ধাতব শরীর আর এক্সেলে উচ্চকিত বাসটা গড়াচ্ছিল, থামছিল, তেমন বিশেষ এগোতে পারছিল না। জেনিন স্বামীর দিকে তাকাল। অপ্রশস্ত কপালের ওপরে নেমে আসা কিছু ধূসর চুলের গুচ্ছ, প্রসারিত নাক আর মাংসল মুখমণ্ডলে মার্সেলকে একটা বেদিত অপ্রসন্ন-মুখের গ্রাম্য-দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। পথের প্রতিটি খানাখন্দের ঝাঁকুনিতে মার্সেল ভেঙে পড়ছিল তার গায়ের ওপরে। পরক্ষণেই ছড়ানো পায়ের ওপরে ভর দিয়ে বিশাল বপুটাকে সামলে নিচ্ছিল সে, পরক্ষণেই নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল। দৃষ্টিতে শূন্যতা। তার রোমশূন্য হাত দুটি ছাড়া কিছুই আর সক্রিয় মনে হচ্ছিল না। সেই হাত দুটিও যেন ছোট হয়ে গিয়েছিল মণিবন্ধের নিচে নেমে-আসা মুঠি-দুটোকে আবৃত করা ফ্লানেলের অন্তর্বাসে। তার হাত দুটি দু হাঁটুর ভেতরে গোঁজা ছোট্ট একটা ক্যানভাসের সুটকেস এমন শক্ত রকমে আঁকড়ে ধরে ছিল যে সেই ঘর-মাছিটার সবিরাম হেঁটে-চলা অনুভবে পৌঁছাচ্ছিল না তার।

সহসাই গর্জন করতে শোনা গেল বাতাসকে আর বাসটিকে বেষ্টন করা ধুলোময় কুয়াশা যেন গভীরতর হলো। জানালার ওপর আছড়ে পড়তে লাগল বালির পিণ্ড, যেন কোনও অদৃশ্য হাত ছুড়ে দিচ্ছিল সেগুলো। ঘর-মাছিটা হিম-পাখায় শিউরে উঠল, পা-গুলোকে ছড়িয়ে দিল, উড়ে গেল তারপর। বাসটার গতি আরও কমে গিয়ে মনে হলো থেমেই পড়েছে বুঝি বা। কিন্তু বাতাস যেন মরে এল অতঃপর, কুয়াশাও ফিকে হলো কিছুটা, গাড়িটা আবার গতি ফিরে পেল তার। ধুলো-বিহীন দৃশ্যপটে খণ্ডিত আলোর চিহ্ন পরিস্ফুট হলো। দু-তিনটে শীর্ণ সাদা-হয়ে-আসা খেজুর গাছ– একেবারেই নিশ্চিহ্ন মনে হচ্ছিল যাদের– হঠাৎই ঝলসে উঠল জানালার ফ্রেমে, মুহূর্তে হারিয়ে যাবে বলেই যেন ফেরা।

'দেশ বটে!' মার্সেল বলল।

আরবেরাই ভরে ছিল বাসটায়, সকলেই ঘুমোচ্ছে যেন, জোব্বায় আবৃত-প্রায়। কেউ কেউ সিটের ওপরে পা মুড়ে বসেছিল, আর বাসটার ঝাঁকুনিতে অন্য সকলের চাইতে তারাই আন্দোলিত হচ্ছিল বেশি। তাদের নৈঃশব্দ্য আর অস্থিরতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দুঃসহ লাগছিল জেনিনের। তার মনে হচ্ছিল সে যেন এই নির্বাক রক্ষীদের সঙ্গে বহুদিন- ধরে পথ-পরিক্রমা করছে। অথচ রেল-লাইনের প্রান্ত থেকে বাসটা বেরিয়েছে এই সকালেই এবং ঘণ্টা দুয়েক ধরে এই হিম-প্রভাতে একটা পাথুরে নির্জন অধিত্যকায় এগোচ্ছিল সে, শুরুতেই অন্তত যার রৈখিক বিস্তার রক্তিম দিগন্তে প্রসারিত হয়ে ছিল। কিন্তু হাওয়ার দাপট বাড়ছিল এবং ক্রমেই সেই বিশাল বিস্তারকে গ্রাস করে ফেলেছিল তা। সেই মুহূর্ত থেকে যাত্রীরা আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। একের পর এক কথা বন্ধ হচ্ছিল তাদের, আর নির্ঘুম রাতের মতোই একটা কিছুর ভেতরে এগিয়ে চলেছিল তারা, মাঝে-মধ্যে ঠোঁট মুছে নিচ্ছিল, গাড়ির ভেতরে উড়ে-আসা বালিতে কর কর করছিল তাদের চোখ।

'জেনিন!' স্বামীর ডাকে চমকে উঠল সে। আবারই মনে হলো, তারই মতো দীর্ঘাঙ্গী আর শক্ত-পোক্ত চেহারার কারও পক্ষে নামটা কীরকম হাস্যকর। মার্সেল জানতে চাইল নমুনা-রাখা বাক্সটা তার কোথায়। পা দিয়েই জেনি তার সিটের নিচে শূন্য জায়গাটা খুঁজল। একটা কিছু ঠেকতে সেটাকেই সেই বাক্স বলে ভাবল। ঝুঁকল সে, সামান্য হাঁফ ধরে গেল যেন তার। অথচ স্কুলে জিমন্যাসটিকসে প্রথম পুরস্কার পেত সেঠ। হাঁফ-ধরা ব্যাপারটা জানতই না একেবারে। খুব কি পুরনো দিনের ব্যাপার সেটা? পঁচিশ বছর। পঁচিশ বছর কিচ্ছু না, মনে হচ্ছিল এই গতকাল, স্বাধীন আর বিবাহিত জীবনের মাঝখানে দোলাচলে ছিল সে, নিতান্তই গতকাল– একা একাই প্রৌঢ়ীতে পৌঁছানোর সময়ের কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত ছিল সে যখন। একা ছিল না সে, আইনের সেই ছাত্রটি যে তার নিয়ত-সঙ্গলোভী ছিল, সে-ই এখন তার পাশে আছে। শেষমেশ তাকেই সে গ্রহণ করেছে, যদিও তার চেয়ে লম্বায় একটু ছোটই ছিল সে, আর তার আগ্রহী ধারালো হাসি অথবা তার ঠেলে-বেরোনো কালো চোখের তারা কোনোটাই তার বিশেষ পছন্দ ছিল না। কিন্তু জীবনের মুখোমুখি হবার তার যে সাহস, সেটুকু তার ভালো লাগত। তার দেশ ফ্রান্সের সকলের সঙ্গেই এ ব্যাপারে মিল ছিল তার। যখন ঘটনাবলি বা লেকজন তার প্রত্যাশ্যা পূরণ করতে পারত না, তখন তার হতাশ চাউনিটুকুও তার পছন্দের ছিল। সব থেকে বড় কথা, ভালোবাসা পেতে তার ভালো লাগত, আর সে-ও ভরিয়ে রেখেছিল তাকে দেখ ভালে। সে যে তারই জন্য, সেই কথাটা প্রায়ই তাকে মনে করিয়ে দিয়ে তার অস্তিত্বকে বাস্তব করে তুলেছিল সে। না, একা ছিল না সে

সজোরে ঘন ঘন ভেঁপু বাজিয়ে অদৃশ্য সব বিঘ্ন পেরিয়ে এগিয়ে চলেছিল বাসটা। ভেতরে সবাই স্থির। সহসা জেনিনের মনে হলো কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে। গলি-পথের ওপাশে সিটটার দিকে ঘুরে তাকাল সে। লোকটি আরব নয়। প্রথমেই কেন যে তাকে নজরে পড়েনি তার, ভেবে অবাক হলো সে। সাহারায় ফরাসি সৈন্যদলের পোশাক তার গায়ে, রোদে পোড়া লম্বাটে ছুঁচালো শেয়ালের মতো মুখের ওপরে কাপড়ের মলিন টুপি। স্থির নজরে তার ধসর দুটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চোখ অপ্রসন্ন বিষণ্ণতায় জরিপ করে যাচ্ছিল তাকে। হঠাৎই রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ, স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল সে। কুয়াশা আর বাতাসের মধ্য দিয়ে মার্সেল তখনও সিধে মেলে রেখেছে তার দৃষ্টি। নিজের কোটেরে কোটরে অনেকটাই ঢুকে পড়ল জেনিন। তবুও লম্বা আর শীর্ণ সেই ফরাসি সৈনিকটিকে দেখতে পাচ্ছিল সে। সৈনিকটি পোশাকের ভেতরে এতটাই শীর্ণ হয়ে ছিল যে মনে হচ্ছিল শুকনো দাহ্য কোনও পদার্থেই তৈরি বুঝি সে, বালি আর হাড়ের মিশ্রণে। তারপরেই তাদের সামনে রোগাটে হাত আর তামাটে মুখের আরবদের দেখতে পেল সে। জবরদস্ত পোশাক সত্ত্বেও তাদের সিটগুলোতে অনেকখানিই জায়গা ছিল। এই সিটগুলোর পেছনেই যেন আটকে ছিল সে আর তার স্বামী। হাঁটুর চারপাশে কোটটাকে টেনেটুনে রাখল সে। তেমন কিছুই ভারী চেহারা নয় তার, লম্বা এবং নিটোলই বরং, তন্বী আর নজর-কাড়া। জেনিন ভালোভাবেই জানত পুরুষেরা যখন তার দিকে, বিশেষ করে তার শিশুর মতো মুখ, উজ্জ্বল, দুষ্টুমি-ভরা চোখের দিকে তাকাত, দীর্ঘ চেহারা সত্ত্বেও উষ্ণতা আর আহ্বান জড়ানো থাকত সেখানে।

না, সে যা আশা করেছিল তেমন কিছুই ঘটল না। মার্সেল যখন তাকে তার সফর-সঙ্গী হতে বলেছিল, আপত্তিই জানিয়েছিল সে। কিছুদিন ধরেই এই সফরের কথা ভাবছিল মার্সেল, যুদ্ধের শেষ থেকেই, আরও গুছিয়ে বললে, ব্যবসা-পত্তরে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে যখন। যুদ্ধের আগে আইন পড়ায় ইস্তফা দিয়ে ছোটখাটো শুকনো জিনিসের পৈতৃক যে ব্যবসাটা শুরু করেছিল সে, ভালোই আয় দিচ্ছিল সেখান থেকে। সাগর-বেলায় যৌবনের বছরগুলো আনন্দেই কাটানো যেত। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের ব্যাপারে তার বেশ অনীহাই ছিল। জেনিনকে সাগর-বেলায় নিয়ে যাবার পাট চটপটই চুকে গিয়েছিল তার। কেবল রবিবারের বিকেলে তাদের ছোট্ট গাড়িটা শহরের বাইরে নিয়ে যেত তাদের। বাকি সময়টা নানা রঙের টুকরো জিনিসে ঠাসা তার দোকানটিই ছিল তার পছন্দের। কিছুটা দেশজ, কিছুটা ইউরোপীয় এই শহরাঞ্চলের ছায়ায় অবস্থিত তার দোকান ঘরটি। দোকানের ওপারে তিন-কামরার বাসস্থান তাদের, আরবি পর্দা আর আসবাবে সজ্জিত। সন্তান আসেনি। অর্ধ-উন্মুক্ত দরজার আধো-অন্ধকারে বছরগুলো কেটে গেছে তাদের। গ্রীষ্ম, বেলাভূমি, আনন্দ-ভ্রমণ, শুধুই আকাশ নিরীক্ষণের দিনগুলো অতীত হয়ে গেছে। ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই যেন টানেনি মার্সেলকে। জেনিন বুঝতে পেরেছিল টাকাই তার সব, আর কেন, সে কথা সত্যি সত্যিই না বুঝে, ব্যাপারটা পছন্দ করেনি সে। সব মিলিয়ে, ব্যাপারটা নিজেরই অনুকূলে ছিল তার। কৃপণতা দূরে থাক, মার্সেল ছিল দরাজ হাতের, বিশেষ করে জেনিনের প্রয়োজনে। 'যদি কিছু ঘটে আমার', মার্সেল বলত, 'তোমার জন্য ব্যবস্থা থাকবে।' আর সত্যি বলতে কী, কারও প্রয়োজনের জন্য ব্যবস্থা একটা জরুরি ব্যাপারই বটে। কিন্তু আর সব কিছুর জন্য, প্রাথমিক প্রয়োজনগুলোর বাইরে যা, তার ব্যবস্থা কী করে হবে? থেকে থেকেই অস্পষ্ট এই অনুভূতি ভোগাত তাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ওরই মধ্যে মার্সেলকে খাতাপত্র ঠিকঠাক করতে সাহায্য করত সে, কখনও কখনও মার্সেলের বদলে দোকানেও বসত। গ্রীষ্মই ছিল সবচেয়ে কঠিন, একঘেয়েমির মিষ্টি অনুভবেরও গলা টিপে ধরত যখন দাবদাহ।

হঠাৎই গ্রীষ্মেই ঘটল সেই যুদ্ধ, মার্সেল ডাক পেয়েও স্বাস্থ্যের কারণে অমনোনীত হলো, টুকরো মাল-পত্তরের আকাল পড়ল, ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল, রাস্তাগুলো শূন্য আর তপ্ত হয়ে রইল। সে সময়ে কিছু ঘটলে জেনিনের জন্য কোনও সংস্থানই থাকত না। সে কারণেই টুকরো মাল-পত্তর যেই ফিরে এল বাজারে, মার্সেল ঠিক করেছিল মালভূমির ওপরের দিকের গ্রামগুলো আর দক্ষিণাঞ্চল নিজেই সে ঘুরে আসবে যাতে দালালের খপ্পরে না পড়ে সরাসরি আরব ব্যবসায়ীদের কাছেই সে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে। সে নিজেই চেয়েছিল জেনিনকে সঙ্গে নিতে। জেনিন জানত, ঘুরে বেড়ানোটা সুখের নয়, তার নিঃশ্বাসের কষ্ট ছিল, ঘরে থাকাটাই পছন্দ ছিল তার। কিন্তু মার্সেল ছিল নাছোড়, আর জেনিন রাজি হয়ে গিয়েছিল, কেননা রাজি না হওয়াতে অনর্থক শক্তিক্ষয় হতো তার। এই ছিল তাদের অবস্থা, আর সত্যি বলতে তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল ছিল না। তাপে তার ভয় ছিল, ভয় ছিল মাছির ঝাঁকে, মৌরির গন্ধে ঝাঁঝালো নোংরা হোটেলগুলোয়। শীতের কথা ভাবেনি সে, দাঁত-ফুটোনো হিম-বাতাসের কথাও, হিমবাহ-পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপ বিশৃঙ্খল অর্ধ-মরু-অঞ্চলীয় এই মালভূমির কথা খেজুর গাছ আর মোলায়েম বালুকণার কথাও স্বপ্নে ভেবেছিল সে। কিন্তু এখন সে দেখতে পাচ্ছিল মরুভূমি আদপেই তা নয়, কেবলই পাথর, সর্বত্র পাথর, পাথুরে-ধুলোয় ভরে আছে আকাশটাও, ছেঁড়া-খোঁড়া, ঠাণ্ডা, জমিনেরই মতো, যেখানে পাথরের মাঝখানে শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।

আচমকাই থেমে গেল বাসটা। ড্রাইভার কী একটা ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, সারাজীবন ধরেই জেনিন যা শুনেছে কিন্তু বোঝেনি কখনও। 'ব্যাপারটা কী?' মার্সেল শুধালো। এবার ফরাসিতে ড্রাইভার জানাল, কার্বুরেটরটা নিশ্চয়ই বালিতে আটকে গিয়েছে। মার্সেল দেশটাকে অভিশাপ দিল আবার। হো-হো করে হেসে উঠল ড্রাইভারটি, বলল, এটা কিছু নয়, কার্বুরেটরটা পরিষ্কার করে এক্ষুনি আবার চলতে শুরু করবে তারা। দরজাটা খুলল সে, হিম বাতাস হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভেতরে, অযুত বালুকণায় আক্রান্ত হলো তাদের মুখমণ্ডল। আরবরা নিঃশব্দে জোব্বার ভেতরে তাদের নাক গুঁজে দিয়ে গায়ে গা ঘেঁষে বসল সবাই। 'বন্ধ করো দরজা', মার্সেল চেঁচিয়ে উঠল। দরজার কাছে ফিরে আসতে আসতে ড্রাইভারটি হাসল। তাড়াহুড়ো না করেই ড্যাসবোর্ডের তলা থেকে কিছু যন্ত্রপাতি বার করল সে, দরজা বন্ধ না করেই অস্পষ্ট কুয়াশায় সামনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মার্সেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নিশ্চিত জেনে রাখো, লোকটা জীবনে কখনও মোটর দেখেনি।' 'চুপ করো', জেনিন বলল। বাসটার কাছেই রাস্তাটার গা ঘেঁষে সর্বাঙ্গ আবৃত করা কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল নিশ্চল। বোরকা আর গুণ্ঠনের আড়ালে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শুধু তাদের চোখগুলোই পরিদৃশ্যমান ছিল। নির্বাক, যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত, যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে ছিল তারা। 'মেষপালক', মার্সেল জানাল।

গাড়িটার ভেতরে নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্য। অনন্ত সেই অধিত্যকা জুড়ে মত্ত বাতাসের কণ্ঠস্বর শুনছিল যেন যাত্রীরা সবাই মাথা নিচু করে। লটবহরের নিতান্ত অনুপস্থিতি হঠাৎই বিস্মিত করল জেনিনকে। রেললাইন ফুরিয়ে যাবার পর ড্রাইভার তাদের ট্যাঙ্ক এবং আরও কিছু গাঁটরি তুলে দিয়েছিল ছাদে। বাসের ভেতরের র‍্যাকগুলোতে কিছু গাঁট-অলা লাঠি আর বাজারি ঝুড়ি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দক্ষিণের এই লোকগুলো একরকম খালি হাতেই বেরিয়ে পড়েছিল।

ড্রাইভারটি কিন্তু ফিরে আসছিল, ব্যস্ত পায়েই। তার মুখ-ঢাকা ওড়নার ওপরে চোখ দুটিই কেবল হাসছিল। সে জানিয়েছিল এক্ষুনি তারা চলতে শুরু করবে আবার। দরজাটা বন্ধ করল সে, বাতাসের শব্দ শোনা গেল না আর, জানালার ওপরে স্ফুটতর হলো বালুকণা-বৃষ্টি। মোটর শব্দ করে উঠেই আবার ঠাণ্ডা মেরে গেল। অনেকক্ষণ স্টার্টার চেপে ধরে থাকায় শেষমেশ গর্জে উঠল আবার সে। অ্যাকসিলেটরে চাপ দিয়ে গাড়িটার রেশ বাড়াল ড্রাইভার। একটা মস্ত খাঁকারি দিয়ে চলতে শুরু করল বাসটা। তখনও নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা ছিন্ন-পোশাকে দলা-পাকানো সেই মেষ-পালকদের মধ্যে থেকে একটা হাত ওপরের দিকে উঠেই পেছনের কুয়শায় মিলিয়ে গেল আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা রাস্তার ওপরে লাফাতে শুরু করল। খুবই খারাপ অবস্থা রাস্তাটার। ঝাঁকুনি খেয়ে আরবরা দুলতে লাগল। তবুও, ঘুমে জড়িয়ে আসছিল জেনিনের দুচোখ। হঠাৎই তার সামনে একটা ছোট্ট হলুদ বাক্স দেখতে পেল সে, লজেন্সে ভর্তি। শেয়ালের মতো সেই সৈনিকটা তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। একটু ইতস্তত করল সে, একটা তুলে নিল, ধন্যবাদ জানাল। শেয়ালটা পকেটে পুরে ফেলল বাক্সটা আর হাসিটাও গিলে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। সোজা তার সামনে রাস্তাটার দিকেই তাকিয়ে রইল সে তারপর। জেনিন মার্সেলের দিকে ফিরল। তার গলার নিটোল পেছনটুকুই দেখতে পেল সে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল মার্সেল, ক্ষয়িষ্ণু বালিয়াড়ির গা থেকে উঠে-আসা ঘনতর কুয়াশার দিকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছিল তারা। ক্লান্ত বাসটার ভেতরে প্রাণের কোনও সাড়া ছিল না। ঠিক এমনি সময়েই বাইরে হট্টগোল শোনা গেল। বোরকা-পরা শিশুর দল লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছিল, লাফাচ্ছিল, হাততালি দিচ্ছিল আর বাসটার চারপাশে দৌড়াচ্ছিল। দু পাশে নিচু বাড়ির লম্বা একটা রাস্তা দিয়ে বাসটা যাচ্ছিল তখন। সামনেই মরুদ্যান। হাওয়া চলছিল, কিন্তু দেয়ালের গায়ে আটকে যাচ্ছিল বালুকণা। একটু আগে এই বালিতেই আঁধার হয়ে ছিল চারপাশ। মেঘলা আকাশ। সেই হট্টগোলের রৌদ্র-দগ্ধ ইটের গুল্মাচ্ছাদিত প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বাসটা। জেনিন বেরিয়ে পড়ল। বাঁধানো পথের ওপরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল। বাড়িগুলোর মাথার ওপর দিয়ে তীব্র একটি সজিদ-চুড়ো চোখে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পড়ল তার। বাঁ দিক থেকেই মরুদ্যানের পাম-বৃক্ষের প্রথম সারিটির শুরু। ইচ্ছে হলো সেদিকেই হেঁটে চলে যাবে সে। সময়টা দুপুরের কাছাকাছি হলে কী হবে, তীব্র শীত-বাতাসে কাঁপছিল তার সর্বাঙ্গ। মার্সেলের দিকেই ফিরল সে, আর দেখল সৈনিকটি তারই দিকে আসছে। জেনিন আশা করেছিল তার দিকেই তাকিয়ে হাসবে সে, কিংবা অভিবাদন জানাবে। না তাকিয়েই চলে গেল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল। টুকরো মাল-পত্রের ট্রাঙ্কটা নামাতে ব্যস্ত ছিল মার্সেল, বাসের ছাদেই রাখা আছে সেটা। কাজটা সহজ নয়। মাল-পত্রের দেখভালের একটিই মাত্র লোক– বাসের ড্রাইভার। কিন্তু বাসের ছাদে থধমকে দাঁড়িয়ে আছে সে, বাসটাকে ঘিরে বোরকার চক্রটাকে দেখতে ব্যস্ত। জেনিনের মনে হলো, হাড় আর চামড়ায় ঢাকা কতগুলো মুখ ঘিরে আছে তাকে, চিৎকার আর চেঁচামেচির ভেতরেই প্রখর হয়ে উঠল তার ক্লান্তিবোধ। 'আমি ভেতরে যাচ্ছি', মার্সেলকে বলল সে। অধৈর্য মার্সেল ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে তখন।

হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়ল জেনিন। পাতলা ছিপছিপে চেহারার ফরাসি ম্যানেজার এগিয়ে এল তার দিকে। তিনতলায় রাস্তার দিকে মুখ করা একটা ব্যালকনিতে নিয়ে এল সে তাকে, সেখান থেকে এটা ঘরে যেখানে লোহার একটা খাট, সাদা-রঙের একটা চেয়ার, পর্দাবিহীন একটা ওয়ার্ডরোব আর খেলো একটা পর্দার আড়ালে বালু-রেণু-ভরা একটা বেসিন। ম্যানেজার দরজা বন্ধ করতেই চুনকামকরা ন্যাড়া দেয়ালগুলো থেকে উঠে আসা হিম টের পেল জেনিন। কোথায় ব্যাগটা রাখবে, কোথায় বা নিজেকে– কিছুই জানে না সে। হয় তাকে শুয়ে পড়তে হয়, না হলে দাঁড়িয়েই থাকতে আর ঠকঠক করে কাঁপতে। দাঁড়িয়েই রইল সে, ব্যাগটাকে হাতে করেই, আর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সিলিং-এর নীচে ঘুলঘুলির মতো ছোট্ট একটা জানালার ফোকর দিয়ে দৃশ্যমান আকাশের দিকে। যেন সে কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে, কীসের জন্য– জানে না। কেবল নিজস্ব নির্জনতা, অতিশায়ী হিম আর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের চাপটুকুই অনুভব করতে পারছিল সে। আসলে সে মগ্ন ছিল স্বপ্নে, মার্সেলের চিৎকারসহ রাস্তা থেকে উঠে-আসা যাবতীয় শব্দের প্রতিই সে ছিল বধির। কান পেতে যেন সে শুনছিল ঘুলঘুলি-সমান সেই জানালা দিয়ে আসা একটা নদীর শব্দ, একেবারে কাছাকাছি তার, পল্লবিত পাম আর বাতাসের যৌগ থেকে উৎসারিত। তারপরেই বাতাসের গতিবেগ যেন বেড়ে গেল, আর জলের ওপরে নরম ঢেউ থেকে উঠে এল চাপা গর্জন। মনে হলো, দেয়ালের ওপাশে ঋজু, নমনীয় এক পাম-সমুদ্র ক্রম-প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে ঝড়ে। কিছুই তার প্রত্যাশা মতো ছিল না, কিন্তু অদৃশ্য সেই ঢেউগুলোয় জুড়িয়ে যাচ্ছিল পরিশ্রান্ত তার দুটি চোখ। দাঁড়িয়েই ছিল সে, দুটি হাত ঝুঁলিয়ে, ভারী শরীরে, সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে। তার পুরুষ্টু পা বেয়ে উঠে আসছিল হিম-স্রোত। স্বপ্নে ছিল ঋজু আর নমনীয় সেই পামবৃক্ষগুলো আর সেই মেয়েটি নিজেই সে ছিল যা একদিন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাত-মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে চলে গেল তারা। ন্যাড়া দেয়ালগুলোতে উট আর পাম গাছের ছবি গোলাপি আর ল্যাভেন্ডারের আঠালো প্রেক্ষাপটে ডুবে ছিল যেন। গুল্মাবৃত জানালা দিয়ে সামান্যই আলো আসছিল। মার্সেল ম্যানেজারের কাছে সেখানকার বণিকদের সম্বন্ধে জানতে চাইল। একজন বয়স্ক সৈনিক বেশী আরব তাদের খাবার পরিবেশন করল। অন্যমনস্ক মার্সেল রুটিকে টুকরো-টুকরো করল। স্ত্রীকে জল খেতে দিল না সে। বলল, 'ফোটানো হয়নি এটা। মদ নাও।' জেনিনের পছন্দ হলো না কথাটা, মদে তার ঘুম পায়। তাছাড়া খাবার-তালিকায় শূকর মাংস ছিল। 'কোরানের জন্য ওরা এটা খায় না। কিন্তু ভালো করে তৈরি শূকর মাংসে যে অসুখ করে না, কোরানের তা জানা ছিল না। আমরা ফরাসিরা জানি কেমন করে রান্না করতে হয়। কী ভাবছ তুমি?' কিছুই ভাবছিল না জেনিন, পয়গম্বরদের ওপরে বিজয়ী রান্না-বিশারদদের কথাও না। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হলো তাকে। পরদিন সকালেই আরও দক্ষিণে বেরিয়ে পড়তে হবে তাদের, আর আজ বিকেলেই এখানকার সব বড় বণিকের সঙ্গে তাদের দেখা করা চাই। বয়স্ক সেই আরবকে তাড়াতাড়ি কফি নিয়ে আসতে বলল মার্সেল। মুখে কোনও হাসি না ফুটিয়েই ঘাড় কাত করল সে, দ্রুত পায়ে চলে গেল। মার্সেল হাসল, বলল, 'সকালে ঢিমেতাল, বিকেলেও সে রকম তড়িঘড়ি কিছু নয়।' তবুও কফি এল শেষমেশ। গলায় ঢালতে যেটুকু সময়, তারপরই ধুলোয় ধূসর আর হিম-শীতল পথে বেরিয়ে পড়ল তারা। তার ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে মার্সেল একজন আরব যুবককে ডাকল। কিন্তু তার মজুরি নিয়ে যথারীতি দর কষাকষি করল। জেনিনের কাছে আগেও বলেছে সে, তার অস্পষ্ট ধারণা, এক-চতুর্থাংশেই রাজি হবার আশাতেই দ্বিগুণ দাবি করে এরা। অস্বস্তি নিয়েই দুজন টাঙ্ক পরিবাহককে অনুসরণ করল জেনিন। ভারী কোটের তলায় একটা উলের পোশাক তার গায়ে। আর একটু কম সময় হলেই হয়তো ভালো হতো। শূকর মাংস, যদিও ভালোই রান্না ছিল তা, আর সামান্য মদ কিছুটা উত্তেজিত করেছিল তাকে।

ধূলি-ধূসর বৃক্ষপূর্ণ একটা সরকারি উদ্যানের মধ্য দিয়ে তারা হাঁটতে লাগল। বোরখা-ঢাকা কিছু আরবের সঙ্গে তাদের দেখা হলো। যেন দেখতেই পায়নি তাদের এমনিভাবেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল তারা। এমনকি যখন তারা কম্বল গায়ে দিয়ে ছিল, জেনিনের মনে হলো নিজের শহরের আরবদের চাইতে সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাদের। মূল পথটাই অনুসরণ করল জেনিন। ভিড়ের ভেতর দিয়েই এগিয়ে চলল সে। গেট পেরিয়ে মাটির দেয়াল-ঘেরা একটা জায়গায় পৌঁছল তারা। সেখান থেকে চৌকোনা ছোট্ট একটা বাগানে, যেখানে সেই একই পান্থপাদপের গাছ, আর তারই সবচেয়ে চওড়া যে দিক সেখানেই ছিল গুল্মাবৃত পথ আর দোকান-পসরা। কিন্তু তারা থেমে দাঁড়াল সেই বাগানটিরই কামানগোলার মতো ছোট্ট একটি নির্মাণের কাছে, নীল খড়ি-মাটি লেপা। ভেতরে, কেবল প্রবেশপথের আলোকেই আলোকিত একটিমাত্র ঘর। সেখানেই ঝকমকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা কাঠের টুকরোর ওপরে বসে ছিল এক বৃদ্ধ আরব। গোঁফ তার সাদা। তিনটি নানা রঙের গ্লাসের ওপরে টি-পটটা উঠিয়ে নামিয়ে চা পরিবেশন করছিল সে। অন্ধকারে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজার সামনে মার্সেল আর জেনিনকে মিস্ট-মেশানো চায়ের ঠাণ্ডা সুগন্ধ যেন আমন্ত্রণ জানাল। কাউন্টারের দিকে এগোতে গিয়ে মার্সেল তখন সবে চৌকাঠ পেরিয়ে ধাতব টি-পট, কাপ আর ট্রে-র মালা এবং পোস্টকার্ড প্রদর্শনীর পাশ কাটিয়েছে। জেনিন দরজাতেই স্থির দাঁড়িয়ে। একটু সরে দাঁড়াল সে, আলো যাতে আটকে না যায়। ঠিক তখনই অন্ধকারে বৃদ্ধ বণিকটির পেছনে দুজন আরবকে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখল সে। দেকান-ঘরের পেছনে ঠাসা উপু-চুপু বস্তার ওপরে বসে ছিল তারা। লাল আর কালো কম্বল আর ছুঁচের কাজ-করা ওড়না ঝোলানো ছিল চোয়াল-জুড়ে, মেঝেয় ছড়ানো-ছিটানো ছিল বস্তা আর সুগন্ধী বীজ-ভরা বাক্স। কাউন্টারে তামা আর দস্তার ঝকঝকে দুটি দাড়িপাল্লা আর পুরনো বিবর্ণ একটি মাপকাঠির পাশে একসারি মিষ্টি রুটি। সেখানে খসখসে নীল মোড়ক থেকে বের করা ছিল একটি রুটি, মাথার দিকটা তার কাটা। চায়ের সুগন্ধের পেছনে পশম আর মসলার সুবাস স্পষ্টতর হলো। বৃদ্ধ বণিকটি টি-পটটি রেখে শুভদিন জনাল তাদের।

ব্যবসার কথা বলার সময় যে রকম নীচু গলাতে কথা বলে, সে রকম গলাতেই দ্রুত কথা বলতে শুরু করল মার্সেল। তারপর সে ট্রাঙ্কটি খুলল, পশম আর রেশমি বস্ত্র সম্ভার দেখাল, বৃদ্ধ বণিকটির সামনে তার মাল-পত্র মেলে ধরবার জন্যে দাড়িপাল্লা আর মাপকাঠিটা পেচনের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিল। উত্তেজিত হয়ে উঠল সে, কণ্ঠস্বর তুলে ধরল, অস্থিরভাবে হাসল ঠিক একজন মহিলারই মতো যে কারও মনে দাগ কাটতে চাইছে অথচ যে নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে ভঙ্গিতে কেনা-বেচার অভিনয় দেখাচ্ছিল সে। বৃদ্ধ মানুষটি মাথা ঝাঁকাল, চায়ের ট্রে-টি পেছনের দুই আরবের দিকে বাড়িয়ে দিল আর সামান্য দু-চারটি কথা বলল। মার্সেল হতাশ হলো। মালপত্র তুলে নিল সে, ট্রাঙ্কের ভেতরে গুছিয়ে রাখল সেসব এবং কল্পিত ঘাম মুঝে ফেলল কপাল থেকে। মুঝে কুলিকে ডাকল সে, এরপর গুল্মাবৃত পথের দিকে এগোল দুজনে। প্রথম দোকানটিতে যদিও সেই একই উদাসীন ব্যবহার পেল তারা মালিকটির কাছ থেকে, এবারে ভাগ্য কিঞ্চিৎ সুপ্রসন্ন হলো। 'এদের ধারণা, এরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' মার্সেল বলল, 'কিন্তু এদেরও ব্যবসা করে খেতে হয়। জীবন সকলের জন্যই বেশ কঠিন।'

প্রত্যুত্তর না দিয়েই জেনিন অগ্রসর হলো। বাতাস প্রায় নেই বললেই চলে। আকাশও কোথাও কোথাও পরিষ্কার হয়ে আসছিল। ঘন মেঘের ভেতরের গভীর গহ্বর থেকে হিম তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বাগানটি সবে অতিক্রম করেছে। তারা। মাটির প্রাচীর-ঘেঁষে গলিপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রাচীরের ওপরে ঝুলেছিল ডিসেম্বরের পচা গোলাপ, মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও শুকনো পোকা-ধরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ডালিম। ধুলো আর কফির গন্ধ, কাঠ-আগুনের ধোঁয়া, পাথর আর ভেড়ার গন্ধে জায়গাটা আকীর্ণ ছিল। প্রাচীরের গা কেটে একটা থেকে আর একটা বেশ দূরত্বেই অবস্থিত ছিল দোকানগুলো। জেনিন টের পেল, পা ভারী হয়ে আসছে তার। কিন্তু তার স্বামী ক্রমেই উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। তার বিক্রি-বাটা শুরু হয়েছে, মন স্নেহার্দ্র, জেনিনকে সে 'খুকু' বলে ডাকল। যাত্রা বিফল হবে না। 'ঠিক' জেনিন যান্ত্রিক গলায় জানালো, 'সরাসরি ওদের সঙ্গে কথা বলাই ভালো।'

অন্যপথে মধ্যবিন্দুতে ফিরে এল আবার তারা। বিকেল মরে আসছে। আকাশ এখন প্রায় একেবারে পরিষ্কার। বাগানটিতে থামল তারা। মার্সেল হাত দুটি ঘষল এবং তাদের সামনে রাখা ট্রাঙ্কটির দিকে সস্নেহে তাকাল। জেনিন বলল, 'ওই দেখ।' বাগানটির অন্য প্রান্ত থেকে একজন আরব আসছিল– লম্বা, পাতলা, শক্তিমান; পরনে আকাশি বোরকা, নরম বাদামি বুট এবং দস্তানা। ব্রোঞ্জের ঈগলের মতো মুখটাকে সমুচ্চে তুলে রেখেছিল সে। দেশীয় ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফরাসি অফিসার, জেনিন মাঝে-মধ্যে তারিফ করত যাদের, তাদের থেকে আলাদা ছিল পাগড়ির মতো ফেট্টি-বাঁধা এই মানুষটা। গটমট করে তাদের দিকেই আসছিল সে। কিন্তু যখন সে এক হাত থেকে ধীরে তার দস্তানা খুলে ফেলছিল, তখন মনে হচ্ছিল দৃষ্টি তার ছাড়িয়ে গছে দূরে। 'বটে', কাঁধ দুটি ঝাঁকিয়ে মার্সেল বলল, একজন অন্তত দেখা গেল নিজেকে যে জেনারেল বলেই ভাবছে।' হুম, এদের সকলেরই এখানে দাম্ভিক এই চেহারা, কিন্তু এই লোকটি যেন সকলকে ছড়িয়ে গেছে। যদিও তাদের চারপাশেই শূন্য বাগানটি। লোকটি ট্রাঙ্কটার দিকেই সোজাসুজি এগোচ্ছিল, ট্রাঙ্কটাকে না দেখেই। তাদেরও না। তাদের মধ্যে দূরত্ব খুব দ্রুত কমে এল এবং আরবটি প্রায় তাদের ওপরেই এসে পড়ল। মার্সেল সহসা ট্রাঙ্কটির হাতল ধরে পথ থেকে সরিয়ে রাখল তাকে। আরবটি কোনও কিছু নজর না করেই যেন এগিয়ে এল এবং প্রাচীরের দিকে একই পদক্ষেপে চলে গেল। জেনিন স্বামীর দিকে তাকাল। মার্সেল হতভম্ব। 'ওরা ভাবছে সব কিছুই ওরা এখন নিয়ে যেতে পারে।' জেনিন উত্তর দিল না। সেই আরবটির মূঢ় ঔদ্ধত্যকে ঘৃণা করল সে। সহসাই অসুখী মনে হলো নিজেকে তার। চলে যেতে ইচ্ছে হল, নিজের ছোট্ট ফ্লাটটিতে। সেই হোটেলটিতে, সেই হিম ঘরটিতে ফিরে যাবার কথা মনে হতেই মুষড়ে পড়ল সে। হঠাৎই তার মনে পড়ল, ম্যানেজারটি কেল্লার ওপরে খোলা ঘেরা জায়গাটায় উঠে মরু-দর্শনের কথা বলেছিল তাকে। কথাটা মার্সেলকে বলল সে, বলল, ট্রাঙ্কটা হোটেলেই রেখে আসতে তাকে। কিন্তু মার্সেল ক্লান্ত ছিল, রাতের খাবারের সামান্য আগে একটু ঘুমোতে চাইছিল সে। 'চলো না', জেনিন বলল। সহসাই মনোযোগী হলো মার্সেল, জেনিনের দিকে তাকাল। বলল, 'নিশ্চয়ই, প্রিয়তমা।'

হোটেলের সামনে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রইল জেনিন। শ্বেত-বোরকার জনতার আকার ক্রমেই বাড়ছিল। একেবারে নারী-বর্জিত। জেনিনের মনে হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এত পুরুষের ভিড় একসঙ্গে আর কখনও দেখেনি সে। তবু কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাল না। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ না দেখার মতো করেই তার দিকে মুখ ঘোরাল। সেই পাতলা, রোদ- পোড়া মুখ। জেনিনের মনে হলো, একই রকম সব। বাসের ভেতরে সেই ফরাসি সৈনিক অথবা দস্তানা-পরা সেই আরবেরই মতো কুটিল আর দাম্ভিক। বিদেশিনীর দিকে তারা তাদের মুখ ফেরাল, দেখল না তাকে। ফুলে-ওঠা হাঁটু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার চারপাশে হালকা আর নিঃশব্দ পায়ে হাঁটাহাঁটি করল তারা। একটা অস্বস্তি, সেখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছে তীব্রতর হলো তার। 'এখানে আসা কেন?' মার্সেল এতক্ষণে ফিরে আসছে।

কেল্লার সিঁড়ি বেয়ে তারা যখন ওপরে উঠল, পাঁচটা বাজে তখন। হাওয়া একেবারেই মরে গেছে। সাফ-সুফ আকাশ, তামাটে নীল। শুকনো ঠাণ্ডায় তাদের গালগুলো সপ্রতিভ দেখাল। সিঁড়িগুলো অর্ধেক ভেঙেছে, দেয়ালের গায়ে ছড়ানো এক আরবকে দেখল তারা। তাদের প্রদর্শক চাই কি না জানতে চেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে। উত্তরটা যে 'না' হবে, সেটা যেন আগেভাগেই জানা ছিল তার। সিঁড়িগুলো ছিল লম্বা আর খাড়াই, মাঝে-মধ্যেই ভরাট মাটির চবুতরা। যতই উঠছিল তারা, ততই চওড়া হচ্ছিল সিঁড়িগুলো, আলো আরও বাড়ছিল, ঠাণ্ডা আর শুকনো-ভাব। মরুদ্যান থেকে উঠে-আসা প্রতিটি শব্দই স্পষ্ট আর অবিকৃত শুনতে পাচ্ছিল তারা। চারপাশে বিকম্পিত আলো দীর্ঘায়ত হচ্ছিল, তাদের এগিয়ে চলার সংঘাতে। সেই আলোর কেলাস থেকে উত্থিত একটা শব্দ-তরঙ্গ বিস্তারিত হয়ে চলেছিল ক্রমেই যেন। ওপরের ঘোরানো চবুতরায় পৌঁছে পাম-বনের সীমানা পেরিয়ে যেই তাদের চাখ হারিয়ে গেল দূর-দিগন্তে, জেনিনের মনে হলো গোটা আকাশই ছোট্ট তীক্ষ্ণ একটা সুরে বেড়ে উঠল সহসাই। মাথার ওপরে শূন্যে শনৈঃ ছড়িয়ে গেল তার প্রতিধ্বনি, সহসাই নিঃশব্দে মরে গেল তারপরে আবার। দাঁড়িয়ে রইল জেনিন, একেলা, পরিত্যক্ত, নিঃসীম সেই বিস্তারের মুখোমুখি।

পুব থেকে পশ্চিমে দৃষ্টি ফেরাল সে– ধীরে, একটা নিখুঁত চক্র রেখায়, বাধা-বন্ধহীন। নিচে সেই আরব-নগরীর চবুতরাগুলো একটার সঙ্গে মিশে আছে আর একটা, রোদ্দুরে শুকানো ক্যাপসিকামের কালচে লাল দাগ লেগে আছে সেখানে। একটাও প্রাণী দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্দরমহল থেকে কফির সুবাসের সঙ্গে কলহাস্য আর অস্পষ্ট পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল। অদূরে মেটে প্রাচীরে বিভক্ত অসমান পাম-বীথির ওপরের পাতাগুলো ঝরঝর করছিল বাতাসে। তাদের টেরাসে সে বাতাস এসে পৌঁছচ্ছিল না। দূরে আদিগন্ত ছড়িয়ে আছে হলুদ-ধূসর পাথরের জগৎ, প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই যেখানে। মরুদ্যান থেকে কিছু দূরে পাম-বীথির পশ্চিমে কালো মস্ত সব তাঁবু। তাদের চারপাশে একদল উট, দূরের জন্যই নিশ্চল আর ছোট দেখাচ্ছিল তাদের। ধূসর সেই প্রেক্ষাপটে তাদের মনে হচ্ছিল অদ্ভুত কালো হস্তাক্ষরের মতো, দুর্বোধ্য যার পাঠ। মরুভূমির ওপরে নৈঃশব্দ্য ছিল শূন্যেরই মতো অকূল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমস্ত শরীর দিয়ে পাঁচিলের গায়ে ঝুঁকে ছিল জেনিন– নির্বাক। সমুখের উন্মুক্ত শূন্যতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার ক্ষমতা ছিল না তার। পাশেই মার্সেল, ক্রমেই অস্থির হচ্ছিল। শীত করছিল তার, নিচে নেমে যেতে চাইছিল। এখানে আবার দেখার কী আছে? কিন্তু দিগন্ত থেকে জেনিন তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনতে পারল না। ওইখানে, আরও দক্ষিণে, আকাশ আর পৃথিবী যেখানে নির্ভুল এক রেখায় অবলীন, সেইখানে, হঠাৎই তার মনে হলো, কিছু একটা অপেক্ষা করছে তার জন্য, কোনও দিনই ছিল না যা তার, আর এই মুহূর্তের আগে যা তার মনেও আসেনি কোনও দিন। আসন্ন গোধূলিতে ম্লান আর মোলায়েম হয়ে আসছিল আলো, স্বচ্ছ থেকে ঘোলাটে। সেইসঙ্গে ঘটনাচক্রেই সেখানে চলে-আসা এক নারীর বয়স, অভ্যাস আর ক্লান্তির কারণে হৃদয়ের কঠিন গ্রন্থি-বন্ধনীগুলোও শিথিল হতে শুরু করেছিল। যাযাবরদের তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল সে। এর ভেতরের মানুষগুলোকে দেখতেও পায়নি; কালো সেই তাঁবুগুলোতে কোনও চাঞ্চল্য ছিল না; তবুও, সেই তাদেরই কথা, আজ এই মুহূর্তের আগেও যাদের সে কিছুই জানত না প্রায়, ভাবনাতে লেগে রইল তার। তাদের বাড়ি নেই, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন তারা, গুটিকতক লোক, তারাই ঘুরে বেড়াচ্ছে, যতদূর চোখ যায় বিশাল সেই ভূখণ্ড, যেটা আবার আরও বিশাল এক বিস্তারেরই ভগ্নাংশ মাত্র, হাজার হাজার মাইল আরও দক্ষিণে গিয়ে যার বিহ্বল পথের শেষ, যেখানে অবশেষে বনাঞ্চলে জল-সওগাতে পৌঁছে গেছে প্রথম সেই নদী। সময়ের শুরু থেকে শুষ্ক অস্থিসার সীমাহীন এই ভূখণ্ডে অনন্ত প্রবজ্যায় চলেছে একদল মানুষ, অকিঞ্চন, কাউকেই দেখে না তারা, গরিব, কিন্তু অদ্ভুত এক সাম্রাজ্যের সার্বভৌম অধীশ্বর। জেনিন বুঝতে পারল না এ রকম মধুর আর ব্যাপ্ত বিষণ্ণতায় কেন ভরে উঠল তার মন, বুজে এল দু চোখের পাতা। সে জানত অনন্তকাল ধরে এই সাম্রাজ্যের প্রতিশ্রুতি তারও ছিল, তবুও কোনোদিনই তা হবে না তার, কোনোদিনই না, কেবল এ রকম চলিষ্ণু মুহূর্ত ছাড়া, যখনই সম্ভবত সহসাই চোখ মেলে ধরবে সে স্থবির আকাশের দিকে, সেখান কার সুনিশ্চিত আলোক-তরঙ্গের দিকে, আরব-নগরী থেকে সমুদয় কোলাহল অকস্মাৎ থেমে যাবে যখন। তবু মনে হলো সেই মুহূর্তে সর্বত্রই যতি পড়ে গেছে প্রাণে, শুধু তার হৃদয় ছাড়া, যেখানে সেই মুহূর্তে কেউ একজন কাঁদছিল বিস্ময়ে, বেদনায়।

আলো সরতে শুরু করল। পরিষ্কার অনুষ্ণ সূর্য হেলে পড়ল পশ্চিমে, ঈষৎ গোলাপি করে দিয়ে দিঙমণ্ডল। ধূসর এক তরঙ্গ-প্রবাহ ক্রমশই আবির্ভূত হল পুবে। বিশাল সেই বিস্তারে মন্থর গড়িয়ে যেতে এইবারে প্রস্তুত সে। প্রথম কুকুর ডেকে উঠল, দূরের সেই ডাক আরও ঠাণ্ডা এক বাতাসের দিকে উঠে চলে গেল। জেনিন দেখল, তার দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে। মার্সেল বলল, 'ঠাণ্ডায় মরতে চলেছি আমরা। বোকা কোথাকার। চলো, ফিরে যাই।' অসভ্যের মতোই জেনিনের হাত ধরে টানে সে। বাধ্য মেয়ের মতোই পাঁচিল থেকে সরে এল

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জেনিন, মার্সেলকে অনুসরণ করল। বৃদ্ধ সেই আরব ঠাঁয় দাঁড়িয়ে শহরের দিকে যেতে দেখল তাদের। কাউকে না দেখেই হেঁটে চলল জেনিন, প্রচণ্ড আর আকস্মিক এক ক্লান্তিতে ন্যুব্জ, দুর্বহ বোঝার মতোই দেহটাকে টানতে টানতে তার। বোধির সেই তীব্রতা আর নেই। এই মুহূর্তে যে জগতে প্রবেশ করল সে, তার জন্য নিজেকে অতিমাত্রায় দীর্ঘ, পৃথুল আর শ্বেত-বর্ণের বলে মনে হল তার। একটা শিশু, একটা মেয়ে, বেরসিক একটা মানুষ আর গা-ঢাকা দেওয়া একটা শেয়ালই কেবল এ রকম পৃথিবীতে নিঃশব্দে বিচরণ করতে পারে। এরপর কী করবে সে সেখানে, ঘুমের দিকে নিজেকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া, মৃত্যুর দিকে?

টানতে টানতে রেস্টুরেন্টের দিকেই নিজেকে টেনে এগিয়ে যেতে লাগল জেনিন। নিজের ক্লান্তির কথা ছাড়া হঠাৎই চুপ হয়ে গিয়েছিল তার স্বামী। ভীষণ একটা শীতবোধের বিরুদ্ধে দুর্বল প্রতিরোধ গড়তে গড়তে স্বতই সে টের পাচ্ছিল শরীরের ভেতর থেকে জ্বর উঠে আসছে। তার নিজের বিছানার দিকেই টেনে নিয়ে গেল নিজেকে সে, মার্সেলও সেদিকেই এল, তারপর কোনও কথা না বলে তক্ষুনি নিবিয়ে দিল আলোটাকে। হিম-জমাট ঘর। জ্বর চড়ছিল, জেনিনের মনে হলো শীত হামাগুড়ি দিয়ে শরীরের ওপরে উঠে আসছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার, রক্ত চলাচলে কোনও উষ্ণতা নেই শরীরে, বুকের ভেতরে একটা কীরকম ভয় টের পেল সে। পাশ ফিরে শুল, শরীরের চাপে কঁকিয়ে উঠল পুরনো লোহার খাটটা। না, অসুস্থ হয়ে পড়তে চায়নি সে। তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে; তাকেও ঘুমোতে হবে; জরুরি সেটাই। জানালার ফাঁক দিয়ে শহরের অস্পষ্ট আওয়াজ কানে পৌঁছাচ্ছিল তার। আচ্ছন্নতার ভেতরেই সে অনুভব করল কোনও এক মুর-কাফের ভেতরে পুরনো এক গ্রামোফোনে অনুনাসিক স্বরে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে একটা সুর: মন্থর-গতি জনতার এগিয়ে চলার শব্দের ভেতর দিয়েই পৌঁছে যাচ্ছিল তার কাছে তা। তাকে ঘুমোতেই হবে। কিন্তু সে শুনে চলেছিল কৃষ্ণবর্ণের তাঁবুগুলো; চোখের পাতার পেছনে স্থির উটের দল চরছিল; অন্তহীন মরু-প্রান্তর পাক খেয়ে উঠছিল তার অভ্যন্তরে। হ্যাঁ, কেন এসেছিল সে? প্রশ্নটার ওপরেই যেন ঢলে পড়ল সে ঘুমে।

একটু পরেই জেগে উঠল সে। তার চারপাশে নিঃসীম নৈঃশব্দ্য। শহরের প্রত্যন্তে শব্দহীন রাতে কর্কশ কুকুরের হাঁক। কেঁপে উঠল জেনিন। পাশ ফিরল সে, স্বামীর কঠিন কাঁধে কাঁধ ঠেকে গেল তার, এবং হঠাৎই, আধো ঘুমে সেদিকেই সরে গেল। ডুবে না গিয়ে ঘুমেরই ওপরতলায় ভাসছিল যেন সে, আর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের মতো সেই কাঁধটাকেই আঁকড়ে ধরে ছিল অচেতন আগ্রহে। মুখ থেকে কোনও শব্দোচ্চারণ ঘটছিল না তার, কিন্তু সে কথা বলছিল। কী কথা, নিজেই সে শুনতে পাচ্ছিল না কিছু। শুধু মার্সেলের শরীরের উষ্ণতাটুকু অনুভবে আসছিল তার। কুড়ি বছরেরও বেশি প্রতিটি রাতে এ রকমই ঘটেছে, এই উষ্ণতা, শুধু তারাই দুজনে. এমনকি অসুস্থ রাতে কিংবা বেড়াতে বেরিয়ে, এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যেনম ....। তাছাড়া একাকী বাড়িতেই বা কী করত সে? কোনও সন্তান হয়নি। সেটাই কী তার অপ্রাপ্তি? জানে না সে। শুধু মার্সেলকেই অনুসরণ করেছে, তাকেও যে কারও প্রয়োজন এই ভেবে পুলকিত থেকেছে। সে যে প্রয়োজনীয় এই বোধটুকুই একমাত্র আনন্দ মার্সেল যা তাকে দিয়েছে। সম্ভবত মার্সেল তাকে ভালোবাসেনি। ভালোবাসা, যখন তা ঘৃণায় পরিপূর্ণ, তখনও তার মুখ অপ্রসন্ন থাকে না। কিন্তু মার্সেলের মুখ কী রকম? অন্ধকারে স্পর্শেই শরীরী ভালোবাসায় লিপ্ত হয়েছে তারা, পরস্পরকে না দেখেই। অন্ধকারের সেই প্রেমের অতীত কী আরও এক প্রেম আছে, দিনমানের আলোতেই যা উদঘোষিত হতে পারে? সে জানে না, কিন্তু জানে, মার্সেল তাকে চায়, আর সেই চাওয়াটাকেই চায় সে, রাত এবং দিন এই বোধেই তার বাঁচা, বিশেষ করে রাতে– প্রতি রাতে, যখন একা হতে চাইত না মার্সেল, বুড় হতে কিংবা মরতে, পরিচিত সেই অভিব্যক্তি– জেনিন কখনও কখনও অন্য পুরুষের মুখের আদলে যার অভিপ্রকাশ দেখেছে, মত্ততা যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলে তাদের এবং উন্মত্তের মতোই একটি নারীদেহের দিকে নিক্ষিপ্ত করে দেয় নিজেদের– একেবারে ডুবে যেতে– বাসনাহীন, আপাত-প্রজ্ঞার অন্তরালে সংগোপন সেইসব মত্তমানুষের যা কিনা নিঃসঙ্গ সদৃশ আত্মপ্রকাশ, সবটাই যার ভয়ংকর– নির্জনতা আর রাত্রিতেই যা স্বয়ংপ্রকাশ।

নড়ে-চড়ে উঠল মার্সেল, যেন সরে যেতে জেনিনের কাছ থেকে। না, জেনিনকে ভালোবাসেনি সে; জেনিন যা নয়, ভয় তার তাকেই্ঠ। আর তাদের দুজনেরই ঢের আগেই আলাদা হয়ে যাবার কথা ছিল এবং শেষের সেদিন পর্যন্ত একলাই ঘুমোনোর। কিন্তু চিরদিন একলা ঘুমোতে পারে কারা? কেউ কেউ পারে, কোনও বৃত্তি বা দুর্ভাগ্যের কারণে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন যারা, যারা প্রতিরাতে একই শয্যায় মৃতের মতোই শুতে যায়। মার্সেল কখনোই পারে না সে রকম– আসলে সে দুর্বল নিরস্ত্র শিশুরই মতো সবসময় যে দুঃখ-কষ্টকে ভয় পায়, জেনিনের নিজেরই সন্তান যেন, তাকে যার প্রয়োজন, আর এই মুহূর্তেই নাকিসুরে শব্দ করে উঠল সে। জেনিন গা-ঘেঁষে শুল তার, বুকের ওপরে হাতখানি রাখল। আর ভালোবাসার ছোট্ট যে একটা নাম তাকে সে দিয়েছিল একদা, নিজের মনেই সেই নাম ধরে ডাকল তাকে। কখনও-সখনও এই নামটা দুজনেই ব্যবহার করত তারা, কী বলছে, সে ভাবনা না ভেবেই।

সমস্ত অন্তর দিয়ে জেনিন তাকে ডাকল। তাকেও তো প্রয়োজন তার, তার শক্তির, তার কিঞ্চিৎ পাগলামির। আর নিজেও তো সে মৃত্যুকে ভয় পায়। 'এই ভয়টা জয় করতে পারলে সুখী হতাম আমি । সেই মুহূর্তেই অজানা এক দুঃখ ধরে ফেলল তাকে। মার্সেলের কাছ থেকে সরে এল সে। না, কিছুই সে জয় করতে পারেনি, সুখী নয় সে, মরতেই চলেছে বরং– মুক্তি ছাড়াই। বুকের ভেতরে যন্ত্রণা মুচড়ে উঠল; হঠাৎই সে আবিষ্কার করল মস্ত একটা ভারের নিচে রুদ্ধশ্বাসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চাপা পড়ে আছে সে। কুড়ি বছর ধরে এটাকেই সে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই মুহূর্তে সর্বশক্তি দিয়ে তারই বিরুদ্ধে যেন তার লড়াই। মুক্ত হতে চাইছিল সে, মার্সেল বা অন্য কেউ না-ই বা হলো কখনও তা! সম্পূর্ণ জাগ্রত বিছানার ওপর উঠে বসল সে, ডাক শুনতে পেল একটা– খুব কাছেই। কিন্তু সেই রাত্রির প্রান্ত থেকে মরুদ্যানের নিঃশেষিত অদম্য সেই কুকুরগুলোর গলা ছাড়া অন্য কিছুই কানে পৌঁছাল না তার। মৃদু হাওয়া উঠেছিল, খেজুর বীথিতে হালকা জল-শব্দের মতোই কানে বাজল বুঝি তা। দক্ষিণ থেকেই আসছিল সেই হাওয়া– ফিরে সেই একই আকাশের নিচে মরু আর রাত এক হয়ে আছে যেখানে এখন, জীবন স্থবির হয়ে আছে যেখানে, যেখানে কেউ আর কখনোই বুড়িয়ে কী মারা যাবে না। সেই জল-শব্দ মুছে গেল তারপর, আর, নিঃশব্দ এক আহ্বান, দুর্মর দুর্নিরীক্ষা, এছাড়া অন্য কিছুই যেন শুনতে পায়নি সে আর। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই আহ্বানে সাড়া না দিলে কখনোই তার মানে খুঁজে পাবে না সে। এই মুহূর্তেই– হ্যাঁ, অন্তত এটুকু সুনিশ্চিত জেনেছিল সে।

উঠে দাঁড়াল জেনিন নিঃশব্দে, স্থির হয়ে বিছানার পাশে দাঁড়াল, মার্সেলের নিঃশ্বাস শুনতে পেল সে। নিদ্রিত মার্সেল। পরের মুহূর্তেই শয্যার উষ্ণতা অন্তর্হিত হলো, শীত চেপে ধরল তাকে। ধীরে-সুস্থে পোশাক পরল সে, ঝরোকা দিয়ে আসা রাস্তার ম্লান আলোয় হাতড়ে হাতড়ে। জুতোজোড়া হাতে নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছাল সে। এক মুহূর্ত অন্ধকারে অপেক্ষা করে আলতো হাতে দরজা খুলে ফেলল। হাতলটা শব্দ করে উঠল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। বুকের ভেতরে যেন মত্ত দুন্দুভি। কাঠ হয়ে শুনল সে, নৈঃশব্দ্যে আশ্বস্ত হলো, হাতলের ওপরে হাতখানি ঘোরাল আরও একটু। হাতলটা যেন ঘুরেই যাচ্ছে শুধু। অবশেষে দরজাটা খুলল সে, চুপিসারে বেরিয়ে পড়ল বাইরে, আগের মতোই নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা। বন্ধ দরজায় গাল ঠেকিয়ে অপেক্ষা করল তারপর। এক মুহূর্ত বাদে দূরে মার্সেলের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। মুখ ঘোরাল সে, হিম রাত-বাতাসের স্পর্শ পেল গালে, দৌড়ে গেল ব্যালকনির অপর প্রান্তে। সদর দরজা বন্ধই ছিল। ছিটকিনি খোলার শব্দ পেয়ে সিঁড়ির মাথায় রাত-পাহারাদারকে দেখা গেল, নিদ্রাতুর মুখ তার, আরবিতেই কিছু বলল তাকে। রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যেতে যেতে জেনিন বলল, 'ফিরে আসছি আমি।'

খেজুর গাছ আর ঘর-বাড়ির মাথার ওপরে কালো আকাশ থেকে নক্ষত্রের মালা ঝুলছিল। ছোট বীথি-পথে দৌড়ে এগোল সে, একাবারে শূন্য পথ– কেল্লার দিকে চলে গেছে। সূর্য নেই বলে রাতের বুকে চেপে বসেছে ঠাণ্ডাটা, হিম-হাওয়া যেন জমিয়ে দিচ্ছিল তার ফুসফুস। কিন্তু দৌড়াচ্ছিল সে, অন্ধেরই মতো প্রায়, অন্ধকারে। বীথি-পথের মাথার ওপরে অবশ্য আলো ছিল, এঁকেবেঁকে এসে পড়ছিল তার গায়ের ওপরে। থামল সে, চাকার শব্দ শুনতে পেল, ক্রমবর্ধমান আলোর পেছনে নড়বড়ে সাইকেলে আলখাল্লার বিশাল এক বাহিনী দেখতে পেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আলখাল্লাগুলো পাশ কাটিয়ে চলে গেল তার, তারপরেই পেছন দিকে তিনটে লাল-বাতি লাফ দিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল যেন। কেল্লার দিকেই দৌড়াতে লাগল সে। অর্ধেক সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পরেই থামতে চাইল বুঝি, খরশান বাতাসে তার ফুসফুস ফালাফালা যেন তখন। তবুও শেষ ধাক্কায় পৌঁছে গেল সে ওপরের মুক্ত চবুতরায়, পাঁচিলের গায়ে। পেট চেপে পাঁচিলের গায়েই থামল সে। হাঁপাচ্ছিল, চোখের সামনে আবছা দেখছিল সবকিছু। দৌড়ে আসায় এতটুকুও উষ্ণতা পায়নি সে, এখনও শরীর তার কাঁপছিল। হিম সেই বাতাস ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল তার অভ্যন্তরে, কাঁপুনির ভেতরেও উষ্ণতার আলো ঝলকে উঠল সেখানে। অনন্ত রাতের দিকে অবশেষে প্রসারিত হয়ে গেল তার দৃষ্টি।

নিঃশ্বাস নেই, শব্দ নেই, জেনিনের চারপাশে নির্জনতা আর নৈঃশব্দ্য বিঘ্নিত হচ্ছিল শুধু কখনও-সখনও পাথর গুঁড়িয়ে যাবার অস্পষ্ট জড়ানো শব্দে। একটু বাদেই তার মনে হলো মাথার ওপরের আকাশটা মন্থর চক্রগতিকে ঘুরে যাচ্ছে যেন। শুকনো শীতল রাতের বিশাল বিস্তারে হাজার তারার দীপ্ত উপস্থিতি। বরফকুচির মতো ঝিকিমিকি তাদের আলগা হয়ে ধীরে নেমে যেতে লাগল দিগন্তের দিকে। চলমান সেই দীপ্ত আলোর মায়া থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না জেনিন। তাদের সঙ্গে ফিরছিল যেন সে, আপাত-স্থির সেই যাত্রায় একটু একটু করে নিজেরই অন্তরতম সত্তাকেই যেন চিনতে পারছিল। হিম আরবাসনা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী এখন। চোখের সামনে একের পর এক নক্ষত্র-পতন ঘটছিল, মরু-পাথরের আড়ালে উধাও হয়ে যাচ্ছিল তারা, আর সেই সঙ্গে আরও একটু করে রাতের কাছে উন্মোচিত হচ্ছিল জেনিন। গভীর শ্বাস নিয়ে ঠাণ্ডা ভুলে গেল সে, মিথ্যে সব কিছুর ভার, খ্যাপামি অথবা বদ্ধ জীবন, বেঁচে থাকা ও মরে যাবার দুঃসহ সুদীর্ঘ যন্ত্রণা। থমকে এসে দাঁড়িয়েছে সে যেন, ভয়ের হাত থেকে অনেক অনেক বছরের উদভ্রান্ত দিক-ভুল এক পালিয়ে বেড়ানোর শেষে। সেইসঙ্গে নিজের শেকড় যেন খুঁজে পেয়েছে ফিরে, শরীর আর কাঁপছিল না তার, প্রাণ-শক্তির উদ্বোধন ঘটছিল। ঘূর্ণমান সেই আকাশে মগ্ন হতে গিয়ে পাঁচিলের গায়ে আরও সেঁটে গিয়েছিল তার গোটা মধ্য শরীর; যেন সে অপেক্ষায় আছে– শান্ত হবে তার চঞ্চল হৃদয়, ভেতরে বিরাজিত হবে নৈঃশব্দ্য। মরু-দিগন্তে নক্ষত্রপুঞ্জের শেষ নক্ষত্রনিচয় আরও একটু নিচে নেমে এসে স্থির হয়ে গেল। তারপরেই দুঃসহ এক কোমলতায় তরল সেই রাত পূর্ণ করে দিতে লাগল জেনিনকে, ডুবে গেল হিম, সত্তার গহীন সঙ্গোপন ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে এসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিতে লাগল তাকে, বিধুর কান্নার মতো উঠে এল মুখবিবরে তার। পর মুহূর্তে গোটা আকাশটাই যেন ছড়িয়ে গেল মাথার ওপরে, ভেঙে পড়ল পিঠ জুড়ে তার, শীতার্ত পৃথিবীতে।

পুরনো সতর্কতায় জেনিন যখন ঘরে ফিরল, মার্সেল তখনও জাগেনি। বিছানাতে ফিরে যেতেই তার নাকডাকার শব্দ শুনতে পেল সে। কয়েক মুহূর্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বাদে হঠাৎই উঠে বসল মার্সেল। কথা বলল সে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না জেনিন। মার্সেল উঠল, আলো জ্বালাল, চোখে আঁধার দেখল জেনিন। টলতে টলতে হাত ধোবার বেসিনের কাছে গিয়ে বোতল থেকে আকণ্ঠ জল খেল মার্সেল। বিছানার ভেতরে গলে যাবার মুখে একটি হাঁটুতে ভর রেখে বেকুফের মতো তাকাল তারপর। অঝোরে কাঁদছিল জেনিন, বেসামাল। বলল, 'কিছু নয়, প্রিয়তম, কিছু নয়।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধর্মদ্রোহী

কী যে গোলমেলে ব্যাপার! কী যে গোলমেলে ব্যাপার! মনটাকে অবশ্যই গুছিয়ে নিতে হবে আমাকে। যেহেতু আমার জিভটা কেটে নিয়েছে তারা, খুলির ভেতরে, মনে হচ্ছে আর একটা জিভ যেন ডগা নাড়াচ্ছে তার, বলছে কিছু, কিংবা কেউ, চুপ করে যাচ্ছে আবার, আর পরক্ষণেই শুরু করে দিচ্ছে ফের– ওহ্, যা কখনও মুখে আনিনি এমনি কত কী যে শুনতে পাচ্ছি, কী যে গোলমেলে ব্যাপার, আর যদি আমি মুখ খুলি, পাথরে ঠোকাঠুকির শব্দ ওঠে যেন। শৃঙ্খলা এবং রীতি, জিভ বলে, আর তার পরেই অন্য প্রসঙ্গে বলতে শুরু করে একই সঙ্গে– হ্যাঁ, আমি সব সময়েই শৃঙ্খলা চেয়েছি। একটা জিনিস অন্তত নিশ্চিত, আমি সেই মিশনারির জন্য অপেক্ষা করছি। সে এসে আমার স্থান অধিকার করবে। এখানে এক প্রান্তে আমি টাঘাজার থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে, লুকিয়ে আছি স্তূপাকৃতি পাথরের আড়ালে, আমার পুরনো রাইফেলখানির ওপরে বসে। মরুভূমির ওপারে সদ্য-সকালের আলো, ভারি ঠাণ্ডা এখনও, শিগগিরই ভয়ংকর তপ্ত হয়ে উঠবে, এই দেশ মানুষকে পাগল করে দেয়, আর আমি জানি না কত বছর এখানেই রয়ে গেছি আমি। না, হয়তো সামান্য বেশি কিছু দিন। এই সকালেই অথবা সন্ধেয় মিশনারিটির চলে আসার কথা। শুনেছি একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়েই আসবে সে, সম্ভবত তাদের মাঝখানে একটাই উট থাকবে। অপেক্ষা করব আমি, অপেক্ষা করছি, এই ঠাণ্ডাটাই শুধু যা কাঁপিয়ে দিচ্ছে আমাকে। আর একটুক্ষণ ধৈর্য ধরো হে, তুমি, নোংরা হতচ্ছাড়া একটা।

কিন্তু আমি তো দীর্ঘকাল ধরে ধৈর্য ধরেই আছি। মাসিফ সেন্ট্রালের উঁচু ওই মালভূমির ওপরে আমি যখন বাড়িতে ছিলাম, আমার রুক্ষ বাবা, অমার্জিত মা, মদ, প্রতিদিন শুয়োর-মাংসের সুপ, সবার ওপরে মদ, টক আর ঠাণ্ডা, আর দীর্ঘ শীতকাল, আড়ষ্ট বাতাস, তুষারপাত, বিদ্রোহী ফার্ন-ঘাস– ওহ্, পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম আমি, এক মুহূর্তে ছেড়ে যেতে সব কিছু, আর, অবশেষে, সূর্যালোক আর শুদ্ধ জলে নতুন করে বাঁচতে। সেই যাজকটিকে বিশ্বাস করতাম আমি, ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রের কথা শোনাত সে আমাকে, রোজই পড়াত, সেই প্রোটেস্ট্যান্ট অঞ্চলে প্রচুর সময় ছিল তার, গ্রাম পার হতে গিয়ে সেখানে সে দেয়ালগুলোকেও সস্নেহে আলিঙ্গন করত। ভবিষ্যৎ আর সূর্যের কথা বলত সে আমাকে, ক্যাথলিজমই হলো সূর্য, এমনই বলত সে, আর আমাকে পাঠে মনোযোগী করাত, আমার মোটা মাথায় জোর করে ল্যাটিন ঢোকাত (ছেলেটা তুখোড়, কিন্তু গোঁয়ার),

~ www.amarboi.com ~
এমনই শক্ত ছিল আমার মাথা যে বহুবার পড়ে গেলেও জীবনে রক্তপাত ঘটেনি কখনও। 'ষাঁড়ের মুণ্ডু', আমার অশিক্ষিত বাবা বলত। ধর্ম-শিক্ষা-কেন্দ্রে আনন্দে উৎফুল্ল ছিল তারা, প্রোটেস্ট্যান্ট অঞ্চল থেকে কাউকে নিয়ে আসতে পারা মানেই বিশাল জয়, আমাকে তারা অস্টারলিজের সূর্যের মতোই অভ্যর্থনা করেছিল। সূর্য ছিল ফ্যাকাশে আর নিস্তেজ, মদের জন্যই বলতে গেলে, টক মদ খেয়েছিল তারা সব, ঠকঠকিয়ে কাঁপছিল শিশুদের দাঁতগুলো, প্রত্যেকেরই যেন খুন করা উচিত তাদের বাবাকে, কিন্তু শেষমেশ মিশনারি কাজেই সে যে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে রকম কোনও শঙ্কা ছিল না, কারণ অনেক দিন আগেই মরণ হয়েছে তার, সেই অম্ল সুরা পরিশেষে পাকস্থলী কেটে নেমে গিয়েছে নিচে, মিশনারিটিকে খুন করা ছাড়া কিছুই আর করণীয় ছিল না তার।

তার সঙ্গে নিষ্পত্তি করার মতো কিছু বিষয় ছিল আমার এবং তার শিক্ষকদের সঙ্গেও, আমার শিক্ষকের সঙ্গে, যে আমাকে ঠকিয়েছিল, গোটা নোংরা ইউরোপের সঙ্গে, সকলেই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। মিশনারি কাজ, যা কিছু বলবার তাদের, তা ছিল এই, বর্বরদের কাছে চলে যাও, বলো তাদের 'এই আমার প্রভু, শুধু তাকিয়ে দেখ, কখনও আঘাত হানেন না তিনি, হত্যা করেন না, নিচুস্বরে তিনি তাঁর আদেশ ব্যক্ত করেন, অপর গালটি বাড়িয়ে দেন তিনি, প্রভুদেরও প্রভু তিনি, তাঁকে গ্রহণ করো, তাকিয়ে দেখ কতখানি ভালো করেছেন তিনি আমার, আমাকে আঘাত করো আর তাহলেই দেখতে পাবে তুমি।' হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছিলাম আমি, ভালো বোধ করেছিলাম, ওজন বেড়ে গিয়েছিল আমার, প্রায় রূপবান হয়ে উঠেছিলাম, চেয়েছিলাম কেউ আমাকে আঘাত করুক। দল বেঁধে আমরা কালোরা যখন বাইরে বেরোতাম, গ্রীষ্ম, গ্রেনোব্‌লস্-এর তপ্ত সূর্যের নিচে আর সুতির পোশাক পরা মেয়েদের সঙ্গে দেখা হতো, আমি তাকাতাম না, ঘৃণা করতাম তাদের, অপেক্ষা করতাম কখন আমাকে আঘাত করবে তারা এবং কখনও কখনও হেসে উঠত তারা। এ রকম সময়েই ভাবতাম আমি 'আমাকে আঘাত করুক ওরা, মুখের ওপরে থুতু ফেলুক', কিন্তু তাদের হাসিরাশি, সত্যি বলতে কী, দাঁড়াত সেই একই ব্যাপার, দন্ত-রুচি-কৌমুদী আর বক্রোক্তির সমাহার, আমাকে যা দিশেহারা করে দিত, এই আঘাত আর ক্লেশ মধুময় লেগেছিল আমার! যে যাজকের কাছে পাপের কথা কবুল করতাম আমি, আমাকে বুঝতে পারত না যখন সে, নিজের ওপরেই দোষের বোঝা চাপিয়ে দিতাম আমি। 'না, না, তোমার ভেতরে ভালো কিছু আছে!' ভালো! আমার ভেতরে টোকো মদ ছাড়া কিছুই নেই আর, আর সবচেয়ে ভালোর জন্যেই সেটা, কী করে একজন মানুষ ভালো হয়ে যেতে পারে যদি না সে খারাপ হয়, আমাকে যা কিছু শিখিয়েছে তারা তার ভেতরে থেকে আমার উপলব্ধি এ রকমই। সেটাই হলো একমাত্র বস্তু যা গেঁথে আছে আমার মনে, একতম ধারণা, আর, মোটা-মাথার ঝকঝকে ছেলে, এটাকে একটা যুক্তিসিদ্ধ পরিণামের দিকে নিয়ে যাই আমি, শাস্তির জন্য আমি আমার সীমা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অতিক্রম করে যাই, সামান্য গাঁইগুই করি, সংক্ষেপে, সবাই যাতে নজর করে দেখে আমাকে সেই কারণে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে চেয়েছিলাম এবং আমাকে দেখার পরে আমাকে মহৎ করেছে যা তারই গুণগান করে মানুষ আমারই মাধ্যমে বন্দনা করে আমার ঈশ্বরকে।

প্রখর সূর্য! উদিত হচ্ছেন তিনি, বদলে যাচ্ছে মরুভূমি, পাহাড়ি-সাইক্লামেনের রং হারিয়ে গেছে, ওহ্ আমার পাহাড়, আর বরফ, নরম ছড়ানো বরফ, না, এটা বরং ধূসর হলুদ, প্রবলভাবে ঝলকে ওঠার আগেকার ন্যক্কারজনক মুহূর্ত। এখান থেকে সামনের এই দিগন্তে, যেখানে স্থির নরম রঙের একটি বলয়ে নিরুদ্দিষ্ট হচ্ছে মালভূমি, কিছু না, কিছুই ঘটছে না এখনও। আমার পেছনে পায়ে-চলার পথটা টাঘাজাকে আড়াল-করা বালিয়াড়ির দিকে উঠে গেছে ওপরে। এরই লৌহ-কঠিন নাম বহু বছর ধরেই ঘা মেরে চলেছে আমার মাথায়। আমার কাছে প্রথম এর উল্লেখ করে সেই আধা-অন্ধ যাজক, আমাদের গির্জা থেকে অবসর গ্রহণ করেছে যে, কিন্তু তাকেই বা প্রথম বলব কেন, সে-ই ছিল একমাত্র, নুনেরই শহর ছিল না শুধু তা, চোখ আঁধার-করা সূর্যালোকে শ্বেত-শুভ্র প্রাচীর তার, তার বিবরণেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমি। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা বর্বর আর নিষ্ঠুর। বাইরের মানুষের কাছে এটা ছিল রুদ্ধদ্বার। এদের মধ্যে একজনই, যে এখানে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল, একজনই মাত্র, সে তাই জানত, বেঁচে ছিল নিজের অভিজ্ঞতা জানাবার জন্য। কশাঘাত করেছে তারা তাকে, তার ক্ষত এবং মুখে নুন ঠুসে দিয়ে তাকে তারা মরুভূমিতে বিতাড়িত করেছে, যাযাবরদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার, দয়াপরবশ হয়েছিল তার প্রতি তারা, ভাগ্যই বলতে হবে, আর সেই তখন থেকেই আমি তার কাহিনির স্বপ্ন দেখছি, নুন আর আকাশের জ্বালার, মায়াবী ক্ষমতায় অন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাসের দেবস্থান ও তার অনুগামীদের, এর চেয়ে বেশি বর্বর,, বেশি উত্তেজক আর কী-ই বা কল্পিত হতে পারে, হ্যাঁ, এই ছিল আমার অস্থিষ্ট আর তাদের কাছেই আমার ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে যেতে হয়েছিল আমাকে।

ধর্মশিক্ষার সেই কেন্দ্রে বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত বলেছিল আমাকে তারা, যাতে আমার উৎসাহ মরে যায়। প্রতীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিল তারা, বলেছিল সেটা কোনও মিশনারিদের দেশ নয়, আমিও তেমন প্রস্তুত নই তখনও, বিশেষভাবে প্রস্তুতির প্রয়োজন আমার, নিজেকে জানা প্রয়োজন, এমনকি এর পরেও আমাকে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, তাহলেই বিবেচনা করে দেখবে তারা। কিন্তু প্রতীক্ষায় বসে থাকা, আহ্ না!– জোর করত যদি তারা, বিশেষ প্রস্তুতির জন্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার, কারণ আলজিয়ের্সেই ঘটত সেগুলো আর আমাকেও নিয়ে আসত কাছাকাছি, হ্যাঁ বলতাম আমি, কিন্তু আর সব কিছুর জন্য আমার মোটা-মাথাটাই ঝাঁকিয়েছিলাম আমি এবং পুনরাবৃত্তি করেছিলাম তারই। সেই ভয়ানক বর্বরদের ভেতরেই যে এবং তাদের মতো করেই থাকতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চেয়েছিলাম আমি তাদের ঘরে এবং বিশ্বাসের সেই দেবস্থানে দেখাতে চেয়েছিলাম– আমার ঈশ্বরের সত্যই অমোঘ। আমাকে আঘাত হানবে তারা, অবশ্যই, কিন্তু আমি তাতে শঙ্কিত ছিলাম না, আমার প্রমাণের পক্ষে এটা ছিল জরুরি, এবং সেসব সহ্যের ফলশ্রুতি হিসেবেই পরাক্রান্ত সূর্যের মতোই সেইসব বর্বরদের ওপর অধিকার বিস্তৃত হবে আমার। শক্তিমান, হ্যাঁ, আমার জিহ্বাগ্রে এই শব্দটিই নিয়ত অবস্থান করত, অনপেক্ষ ক্ষমতারই স্বপ্ন দেখতাম আমি, সেই ক্ষমতা মানুষকে যা নতজানু করে, বিরোধীকেও আত্মসমর্পণে বাধ্য করে, ক্ষুদ্রে পরিণত করে তাকে, আর নিজের বিশ্বাসে বিপর্যস্ত, যত অন্ধ আর নিষ্ঠুরই হোক না সে, যে মানুষের পতন ঘনাল, প্রভুত্ব ততটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় নিজেরই বিবেকের ভেতরে তার। উচ্ছন্নে যাওয়া ভালো মানুষের ধর্মান্তরীকরণ আমাদের প্রাদ্রিদের একটা বিবর্ণ উদ্যোগ ছিল, আমি তাদের ঘৃণা করতাম, কেননা কদাচিৎ দুঃসাহসী হতো তারা অথচ হবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, বিশ্বাসে ঘাটতি ছিল তাদের, আমার নয়, উৎপীড়কের কাছে স্বীকৃতি কাম্য ছিল আমার, কাম্য ছিল দু হাঁটুর ওপরে ছুড়ে দিতে তাদের এবং বলতে বাধ্য করা 'হে ঈশ্বর, এই হলো বিজয়', দুষ্ট সেই মানবকুলকে নিছক শব্দেরই শক্তিতে শাসনের কারণে। ওহ্, ওই বিষয়ে আমি আমার যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে সুনিশ্চিত ছিলাম, নিজের সম্পর্কে আর কিছুতে না হলেও, কিন্তু একবার একটা ভাবনা মাথায় এলে আমি সেটা তা হাতছাড়া করি না, আমার জোরের জায়গা সেখানেই, হ্যাঁ সেই মানুষটিরই শক্ত ঠাঁই, করুণা, করুণা করত যাকে সকলেই!

সূর্য আরও ওপরে উঠে এসেছে, কপাল পুড়তে শুরু করেছিল আমার। আমার চারপাশে পাথর ফাটতে শুরু করেছিল অস্পষ্ট শব্দ করে। ঠাণ্ডা জিনিস বলতে কেবল রাইফেলের নল, চাষের জমির মতোই ঠাণ্ডা, অনেকদিন আগেকার বৃষ্টিভেজা এক সন্ধের মতো যখন ফুটে উঠেছিল সূপ, আমারই অপেক্ষায় ছিল আমার মা ও বাবা, কখনও-কখনও আমাকে দেখে হাসি ফুটত তাদের মুখে, আমি তাদের ভালোবাসতাম হয়তো। কিন্তু সেসব তো অতীত এখন, সেই পায়ে-চলার পথ থেকে তা উদঘোষিত হতে শুরু করেছিল, চলে এসো, মিশনারি, তোমারই জন্য বসে আছি আমি, এখন আমি জানি কী করে জবাব দিতে হয় সেই বাণীর, আমার নতুন শিক্ষকরা শিখিয়ে দিয়েছেন আমাকে, আর আমি জানি তারা নির্ভুল, প্রেমের সেই প্রশ্নেই সব হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ফেলতে হবে তোমাকে। আলজিয়ের্সে সেই ধর্ম-শিক্ষাকেন্দ্র থেকে যখন আমি পালিয়ে যাই, বর্বরদের সম্পর্কে তখন আমার ভিন্ন এক ধারণা ছিল, আর আমার কল্পনার একটা সিদ্ধান্তই সত্য ছিল কেবল, তারা ছিল নিষ্ঠুর। কোষাধ্যক্ষের অফিস লুটপাট করেছি আমি, আমার অভ্যাসগুলো ছুড়ে ফেলেছি, পার হয়ে গেছি মানচিত্র, উচ্চতর মালভূমি আর মরুভূমি, গোটা সাহারা পাড়ি দেবার বাস ড্রাইভার মজা করেছিল আমাকে নিয়ে 'ওখানে যেও না', সে পর্যন্ত, এদের সকলের মাঝে কী যে ঢুকে গেছে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আর বায়ু-বিদ্ধস্ত কয়েকশ কিলোমিটার পথে বালু-ঝড়, বাতাসের মুখে এগোচ্ছে পিছোচ্ছে, তারপরেই কালো শিখর আর স্টিলের মতো ধারালো প্রান্তের পর্বতমালা, আর তা পার হয়ে (উত্তাপে অস্থির) বাদামি পাথরের নিঃসীম এক সমুদ্র, যেখানে যেতে হলে পথ-প্রদর্শক আবশ্যক, সহস্র আরশির আগুনে দগ্ধ হচ্ছে যেন, শ্বেতবায়ু পরিবৃত সেই ভূমিখণ্ড, কৃষ্ণাঙ্গদের দেশ, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে নুনের সেই শহর। আর সেই পথ-প্রদর্শক, আমার টাকা, নিজেকে খুব চালাক ভেবে সেটা আমি তাকে দেখিয়েছিলাম, চুরি করে নিয়েছিল আর আমাকে ঠিক এইখানেই, সেই রকমই ঘটেছিল ব্যাপারটা, আমাকে ঘা মেরে ফেলে রেখে বলেছিল 'কুত্তা, ওই হলো রাস্তা, ঢের করেছি, আগে বাড়ো, যাও, ওরাই দেখাবে তোমাকে', আর, তারাই দেখিয়েছিল আমাকে, ওহ্ হ্যাঁ, তারা, সব সূর্যেরই মতো, রাত্রি ছাড়া বিরাম নেই, গর্বিত আর তীব্র প্রহারে, অর্থাৎ বেধড়ক মেরে আমাকে সেই মুহূর্তে, খুবই কঠিন মার, মাটি থেকে নিক্ষিপ্ত এক ঝাঁক বর্শায়, ওহ্ আশ্রয়, হ্যাঁ মস্ত এক পাথরের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবার আগেই।

এইখানে ছায়া আছে মনোরম। নুনের শহরে কেমন করে থাকতে পারে কেউ, চোখ-ঝলসানো উত্তাপে, ওই অববাহিকার গর্ভের ভেতরে? কোদাল দিয়ে কাটা প্রতিটি সমকোণী দেয়াল, যেমন-তেমন করে সমান করা, কোদালেরই সরু ফলায় ঝুরো রাবিশ ছড়ানো তাদের ওপর, খাড়াই সেই দেয়াল আর তার চবুতরায় একমাত্র বাতাস যখন ধুলো ছড়ায়, সেই সময়টুকু বাদে বিবর্ণ বিকীর্ণ বালু হলদেটে করে দেয় তাদের, নীল বিস্তার অবধি একই রকম ধূলি-ধূসর আকাশের তলায় চোখ-ধাঁধানো শুভ্রতায় সব কিছুই ঝলমলিয়ে ওঠে তখন। শ্বেত সেই চবুতরাগুলো, সুদূর অতীতে পৌঁছে গিয়েছিল বলে মনে হতো যাদের, তাদেরই উপরিতলে প্রহরব্যাপী স্থির আগুনের অশ্রুত বিলাপের সেই দিনগুলোতে অন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল আমার। একটা নুন-পাহাড়কে সমবেতভাবে তারাই যেন সামলে চলেছিল, প্রথমে সমতল করে তাকে, তারপর সেখান থেকেই সরাসরি কেটে বের করে পথ, ঘর-বাড়ির অভ্যন্তর এবং জানালা, অথবা, যেন– হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেই রকমই বরং, ফুটন্ত জলের শক্তিশালী একটা জেট দিয়ে তারা যেন কেটে বের করেছে তাদের শুভ্র প্রজ্বলন্ত নরক, এই শুধু দেখাতে যে যেখানে আর কেউ বসবাস করতে পারে না সেখানে তারাই শুধু পারে তা, জীবন্ত কোনও অঞ্চল থেকে ত্রিশ দিন লেগে যায় পৌঁছতে যেখানে, মধ্য-মরুর অববাহিকায় এই যেখানে দিনের উত্তাপ প্রাণীদের যোগাযোগের পরিপন্থী, অদৃশ্য অগ্নিশিখা আর জ্বলন্ত কণিকার খাড়াই দরোজায় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সব, যেখানে তাদের নুন-পাথরের আস্তানায় অপরিবর্তনীয় শীত-রাত জমিয়ে দেয় প্রত্যেককে তাদের শুকনো ভাসমান তুষারখণ্ডে নিশি যাপনকারী জীব যেন সব বর্তুল ঈগলুর ভেতরে সহসাই শীতার্ত কৃষ্ণাঙ্গ এসকিমো একদল। কৃষ্ণাঙ্গ, কেননা লম্বা কালো পোশাক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পরত তারা, এমনকি তাদের নখের ভেতরেও জমা হতো যে নুন, মরু-নিশীথের ঘুমের ভেতরেও সেই তিক্ত তার আস্বাদ পেত তারা এবং গিলে ফেলত, চোখ-ঠিকরানো এক ফাটলের গর্ভবতী একমাত্র ঝরনার জলে পান করত তারা যে নুন, বৃষ্টি হয়ে গেলে পর শামুকের চলে যাওয়ার মতোই একরকম দাগ রেখে যেতে তা তাদের কালো পোশাকের ওপরে।

বর্ষা, হে ঈশ্বর, কেবল একটিমাত্র বর্ষা এনে দাও, দীর্ঘ আর প্রবল, বর্ষা–স্বর্গলোক থেকে তোমার! তাহলেই অবশেষে জঘন্য এই শহর, ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু যা, ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবেই ভেঙে পড়বে, আর পঙ্কিল একটা উন্মত্ত স্রোতে সম্পূর্ণ বিগলিত হয়ে এর বর্বর বাসিন্দাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বালিয়াড়ির দিকে। একটা কেবল বর্ষা, ভগবান, কিন্তু কী বলতে চাইছি আমি, কোন ভগবান, তারাই তো ঈশ্বর এবং প্রভু। জীবাণুহীন আপন ঘর এবং তাদের কৃষ্ণাঙ্গ দাস সম্প্রদায়, খনিতে আমৃত্যু পরিশ্রম করে যারা, শাসনভার তো তাদেরই হাতে। নুনের কেটে তোলা প্রতিটি চাঁই দক্ষিণাঞ্চলে একটি মানুষের তুল্যমূল্য, পথের খনিজ শুভ্রতায় শোকের অবগুণ্ঠনে হেঁটে যায় তারা, নিঃশব্দে, আর রাতে, গোটা শহরটা যখন দুধ-সাদা অশরীরীর মতো দেখায়, মাথা নিচু করে নিজেদের ঘরের ছায়ায় ঢুকে যায় সকলে। নুনের দেয়ালগুলো আবছা আলোয় জ্বলতে থাকে সেখানে। নির্ভার ঘুমোয় তারা এবং যখনই ঘুম ভাঙে, হুকুম দেয়, আঘাত হানে, বলে ঐক্যবদ্ধ তারা, বলে তাদের ঈশ্বরই সত্যকার ঈশ্বর এবং তাকেই সকলের মান্য করতে হবে। তারাই আমার প্রভু, দয়া কী তারা জানে না, আর প্রভুর মতোই, একাই থাকতে চায় তারা, একাই এগোতে চায়, একাই শাসন করতে, কেননা নুন আর বালিতে একমাত্র তারাই এ রকম ঠাণ্ডা, তপ্ত আর শুষ্ক একটা শহর নির্মাণের দুঃসাহস দেখিয়েছে। আর আমি

গরম যখন বাড়তে থাকে, কী যে গণ্ডগোল তখন, আমি ঘামছি, কিন্তু তারা কখনও ঘামছে না, ছাউনিটাও তেতে উঠছে এখন, আমার ওপরে যে পাথরটা তার ওপরে সূর্যকে টের পাচ্ছি আমি, মারমুখী সে এখন, হাতুড়ির মতোই ঘা দিচ্ছে পাথরগুলোর ওপরে, মধ্যাহ্নের মস্ত এই সংগীত, বাতাস আর শহরগুলো শত শত কিলোমিটার জুড়ে কাঁপছে, আগে একসময় যে রকম পেতাম সে রকমই নৈঃশব্দ্য শুনতে পাচ্ছি এখন আমি। হ্যাঁ, সেই একই নৈঃশব্দ্য অনেক বছর আগে, রক্ষীরা আমাকে যখন তাদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, দিনের আলোয়, একটা খোলা জায়গার কেন্দ্রস্থলে, যেখান থেকে কেন্দ্রীভূত চবুতরাগুলো অববাহিকার কিনারায় অপেক্ষমাণ কঠিন নীল আকাশের ঢাকনা বরাবর উঠে গেছে ক্রমশ, এই নৈঃশব্দ্যই স্বাগত জানিয়েছিল আমাকে। সেখানেই ছিলাম আমি, শুভ্র সেই পাথরের আড়ালে গর্ভে দু হাঁটুতে শরীরের ভার রেখে, সমস্ত দেয়াল থেকে বিচ্ছুরিত আগুন আর নুনের তলোয়ারে ক্ষয়িত আমার দুটি চোখ, বিবর্ণ, ক্লান্ত, আমার পথ-প্রদর্শক আমাকে যে ঘুষি মেরেছিল তার ফলে কান থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল আমার, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তারা, দীর্ঘকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ, একটি কথাও না বলে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তখন মধ্যদিন। রুদ্র সূর্যের আক্রমণে বিস্তৃত প্রতিধ্বনি ছড়াচ্ছিল আকাশময়, তপ্ত শুভ্র টিনের আস্তর যেন একটা, সেই একই রকম নৈঃশব্দ্য ছিল এটা, আর তাকিয়ে দেখতে লাগল তারা আমাকে, সময় বয়ে যেতে লাগল, আমার দিকে তাকিয়েই রইল তারা, তাদের এই দৃষ্টিপাত দেখার সাহস হচ্ছিল না আমার, হাঁপাতে লাগলাম আমি, আরও, আরও প্রবলভাবে, শেষমেশ কেঁদেই ফেললাম, আর সহসাই নিঃশব্দে আমার দিকে পেছন ফিরল তারা এবং একই সঙ্গে একই দিকে হেঁটে চলে গেল। নতজানু আমি লাল আর কালো তাদের স্যান্ডেলে যা দেখতে পাচ্ছিলাম তা হলো তাদের পা, যখনই ঝুলন্ত কালো গাউন তুলছিল তারা, সেই পা ঝিকমিক করলিছ নুনে, গাউনের প্রান্তভাগ সামান্য উঠে যাচ্ছিল তাদের গোড়ালির মৃদু আঘাত ভূমিতে, আর সেই খোলা জায়গাটা জনশূন্য হয়ে গেছে, অন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাসের কৌম সেই দেবস্থানে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে।

এই যে পাথরের আশ্রয়ে প্রতীক্ষায় আছি আজ, আর আমার মাথার ওপরের আগুন পাথরের স্তর ভেদ করে চলে আসছে, সেই দেবস্থানের অন্ধকারে অনেক দিনই কাটিয়েছি আমি, অনেকের চাইতেই বেশ কিছু বেশি দিন, নুনের দেয়ালে পরিবৃত অবস্থায়, কোনও জানালা ছিল না, রাতগুলো ছিল ঝকঝকে উজ্জ্বল। অনেক দিন, আর আমাকে নোনা জলের একটা পাত্র দেওয়া হয়েছিল আর কিছু শস্যদানা, মুরগির কাছে ছিটিয়ে দেবার মতো করে, আমি তা কুড়িয়ে নিতাম। দিনের বেলা দরজা বন্ধ করা থাকত, তবুও অন্ধকারকে ততটা আগ্রাসী মনে হত না। নুনের স্তূপের ভেতর দিয়ে অপ্রতিরোধ্য সূর্যকে এভাবেই যেন পরিচালিত করা হতো। কোনও প্রদীপ ছিল না, কিন্তু দেয়াল ধরে আন্দাজে এগোতে গিয়ে শুকনো খেজুরের মালায় দেয়ালগুলোকে শোভিত অনুভব করেছিলাম, আর, একেবারে শেষ প্রান্তে, ছোট্ট একটা দরজা, যেমন-তেমনভাবে লাগানো, আমার আঙুল দিয়ে যার খিলটা আমি বুঝতে পারতাম। অনেক দিন, তারও পরে– কত দিন বা ঘণ্টা তা আমি গুনে বলতে পরব না, কিন্তু একমুঠো শস্যদানা বার দশেক প্রায় ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল আমাকে, আর আমার প্রাতঃকৃত্যের জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে নিয়েছিলাম, আমি, ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম ঢেকে রাখতে সেটাকে, একটি শ্বাপদের ডেরার দুর্গন্ধ ঝুলছিল চারপাশে– অনেক পরে তার, হ্যাঁ, দরজাটা খুলে গেল হাঁ হয়ে আর ভেতরে প্রবেশ করল তারা।

আমি যে কোণের দিকে বসে ছিলাম তাদের মধ্যে একজন সেদিকে এগিয়ে এল। থুতনির ওপরে নুনের জ্বালা টের পেলাম আমি, খেজুরের ময়লা গন্ধ নাকে এল আমার, আমি তার এগিয়ে আসা নজর করতে লাগলাম। আমার থেকে এক গজ দূরত্বে থামল সে, নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখল আমাকে, একটি সংকেত, আর দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, ধাতব চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে, বাদামি ঘোড়ার মতো মুখে সেই চোখ অভিব্যক্তিহীন, তীব্র। তারপর একটি হাত তুলল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সে। তখনও স্থবির, নিচের ঠোঁটখানি চেপে ধরল সে আমার, মোচড়াল যতক্ষণ না মাংস ছিঁড়ে আসে, আর, ছেড়ে না দিয়ে, ঘুরে দাঁড় করিয়ে ঘরের মাঝখানটায় ঠেলে নিয়ে গেল আমাকে, আমার ঠোঁট ধরে টান মারল, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম, যন্ত্রণায় পাগল তখন আমি, মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, তারপর দেয়ালের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা আর সকলের সঙ্গে যোগ দিতে ঘুরে দাঁড়াল সে। হাট করে খোলা দরজা দিয়ে আসা অনিরুদ্ধ দিবালোকের অসহনীয় উত্তাপে আমাকে গোঙাতে দেখল তারা, আর সেই আলোয় খেজুর পাতার মতো চুলে সহসাই আবির্ভূত হলো সেখানে গুনিন, মুক্তোর একটা লকেটে ঢাকা তার বুক, খড়ের নেংটির নিচে অনাবৃত পা, নলখাগড়া আর তার দিয়ে তৈরি মুখোশ মুখে, চোখের জন্য চৌকো দুটি খোলা জায়গা শুধু। তার পেছনেই এল বাজনদার এবং মহিলারা, তাদের গোটা শরীরই ঢাকা পড়ে গেছে ভারী রং-চঙে গাউনে। দরজার সামনে শেষ প্রান্তে নাচল তারা, মেঠো বেতালা নাচ প্রায়, নড়া-চড়াই শুধু যেন, আর সবশেষে সেই গুনিন আমার পেছন দিককার দরজাটা খুলে দিল, প্রভুদের কোনও চঞ্চলতা নেই, তারা দেখছিল আমাকে, আমি ঘুরে তাকালাম, আদিম সেই দেবতাকে দেখলাম, কুড়ুলের মতো তার দুটি মাথা, সাপের মতোই মোচড়ানো লোহার নাকখানি তার।

আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো, সেই বেদির পাদদেশে, একটা কালো, তেতো, ভয়ানক তেতো জল খেতে বাধ্য করা হলো আমাকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই পুড়তে শুরু করল আমার মস্তিষ্ক, হাসছিলাম আমি, সেটাই আঘাত, আঘাত হানা হলো আমাকে। আমাকে নগ্ন করল তারা, মাথা এবং দেহ কামিয়ে দিল, স্নান করাল তেলে, জল আর নুনে চোবানো কাঠের টুকরো দিয়ে মুখে মারল, আর আমি হাসতে লাগলাম আর ঘুরিয়ে নিতে লাগলাম আমার মুখ, কিন্তু প্রতিবারই দুজন স্ত্রীলোক আমার কান ধরে গুনিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, যাতে আমাকে সে ঘুষি মারতে পারে, আমি তার চৌকো চোখ দুটিই দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু, তখনও হাসছি আমি, রক্তাক্ত। থামল তারা, আমি ছাড়া কেউই কথা বলেনি আর, মাথার ভেতরে তালগোল পাকানো শুরু হয়ে গিয়েছিল, তারপর তুলে ধরল আমাকে তারা এবং কৌম সেই দেবমূর্তির দিকে চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য করল। হাসি থেমে গেছে আমার। বুঝতে পেরেছিলাম তার সেবার কারণেই তার কাছে উৎসর্গীকৃত আমি, তাকেই পুজো করতে হবে আমাকে, না, আমি আর হাসছিলাম না, ভয় আর যন্ত্রণায় রুদ্ধশ্বাস। আর সেখানেই, সেই শুভ্র দেবস্থানে, চারদিকে বাইরে দুর্দম সূর্যালোকে পুড়ে-যাওয়া দেওয়ালের ভেতরে, মুখ টানটান হলো আমার, স্মৃতি লোপ পেল, হ্যাঁ, সেই কৌম দেবতার কাছেই প্রার্থনার চেষ্টা করলাম আমি, সেখানে তিনিই যেন সব এবং বাকি পৃথিবীর তুলনায় মুখ তার কমই ভয়ংকর। এরপরেই আমার হাঁটু দুটো একটা দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা হলো যাতে এক পা করেই এগোনো সম্ভব, আবার নাচল তারা, কিন্তু এবারে সেই আদিম দেবমূর্তির সামনে, প্রভুর দল প্রস্থান করল একে একে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাদের পেছনে দরজা বন্ধ হতেই বাজনা বেজে উঠল আবার, আর সেই গুনিন একটা গাছের ছালে আগুন ধরিয়ে চক্কর কাটল চারপাশে তার, শুভ্র দেয়ালগুলোর কানায় কানায় দীর্ঘ তার দেহচ্ছায়া ভেঙে ভেঙে পড়ল, থিরথির করে কাঁপল দেয়ালের সমতল গায়ে, নাচের ছায়ায় ভরে গেল ঘরের ভেতরটা। এক কোনায় একটি আয়তক্ষেত্র আঁকল সে যেখানে আমাকে টেনে নিয়ে গেল স্ত্রীলোকের দল, তাদের শুকনো মোলায়েম হাতের স্পর্শ পেলাম আমি, আমার সামনে এক বাটি জল আর কিঞ্চিৎ শস্যদানা রাখল তারা আর ইঙ্গিত করল দেবমূর্তির দিকে, বুঝতে পারলাম তারই দিকে দুটি চোখ স্থির করে রাখতে হবে আমাকে। তারপর সেই গুনিন এক এক করে তাদের সকলকে আগুনের কাছে ডেকে নিল, তাদের ভেতরে কাউকে কাউকে মারতেই গোঙালো তারা, তারপর এগিয়ে গিয়ে আমার কৌম দেবতার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। গুনিন নাচতেই থাকল আর একজনকে বাদ দিয়ে সকলকেই বাইরে পাঠিয়ে দিল। সে ছিল নিতান্তই যুবতী, বাজনদারদের কাছেই বসে ছিল, এখনও গায়ে হাত পড়েনি তার। চুলে ঝটকা মেরে ধরল সে তাকে, মণিবন্ধে পাকাতে থাকল, চোখ ঠিকরে পেছন দিকে হেলে পড়ে শেষমেষ চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। তাকে ফেলে দিয়েই তীক্ষ্ণ চিৎকার করল গুনিন, বাজনদারেরা দেয়ালের দিকে ঘুরল, চৌকো-চোখের মুখোশের অন্তরালে সেই চিৎকার অসম্ভব এই উচ্চতায় পৌঁছে গেল, আর সেই মেয়েটি মেঝেয় গড়িয়ে গেল মূর্চ্ছিতার মতো, আর সব শেষে দু হাতের ভেতরে মাথা ডুবিয়ে রেখে চিৎকার করে উঠল নিজেও সে, অস্পষ্ট শূন্য গলায়, আর এই অবস্থায়, চিৎকার না থামিয়ে এবং দেবমূর্তির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়ে গুনিন ঝট করে বিশ্রীভাবেই তুলে নিল তাকে, মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কারণ তার পোশাকের ভারী ভাঁজে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তা। আর, সেই নির্জনতার কারণে উন্মত্ত আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, কৌম দেবতার দিকে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম যতক্ষণ না একটা লাথি দেয়ালের দিকে ছুড়ে দিল আমাকে, নুনে কামড় বসিয়ে, জিহ্বাহীন মুখে যেমন কামড় বসাচ্ছি এই পাথরে আজ, আর প্রতীক্ষায় আছি সেই মানুষের, যাকে আমি নিশ্চিত হনন করব।

মাঝ আকাশ পেরিয়ে আরও কিছুটা সরে গিয়েছে সূর্য এখন। পাহাড়ের ফাঁক-ফোকর দিয়ে শুভ্র-তপ্ত আকাশের ধাতব গাত্রে যে ছিদ্রগুলো তৈরি করেছে এই সূর্য, তাও দেখতে পাচ্ছি আমি। অবিরাম বক-বক করা আমারই মুখের মতো, বর্ণহীন মরুভূমির ওপরে, নিরন্তর অগ্নি-প্রবাহ উদ্‌গিরণ করে চলেছে তা। আমার সামনের পায়ে-চলার পথে, কিচ্ছু নেই, দিগন্তে নেই কোনও ধূলি-মেঘ, পেছনে নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে তারা, না, এক্ষুনি নয়, শেষ বিকেলেই এই দরজাটা খুলবে কেবল তারা, আর একটু বাইরে বেরোতে পারি আমি, গোটা দিনটাই সেই দেব-মন্দির সাফ-সুতরো করে, নতুন অঞ্জলি উৎসর্গ করে, আর সন্ধে হলেই সেই উৎসব শুরু হবে, কখনও মারা হবে আমাকে, কখনও নয়, কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কৌম সেই দেবতার সেবা নিরন্তরই করে চলি আমি, স্মৃতিতে লৌহ-মুদ্রিত হয়ে মূর্তিখানি যার, আমার সবিশেষ বিশ্বাসেও। কোনও দেবতা আর কখনোই এভাবে গ্রাস করেনি আমাকে, কিংবা পরবশ করেনি, আমার গোটা জীবন নিশিদিন তাকেই সমর্পিত ছিল, আমার যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণাহীনতা, আনন্দ ছিল না তা, তারই কারণে যেন, এবং এমনকি, হ্যাঁ, উপস্থিত থাকার সুবাদে, প্রতিদিনই প্রায়, নৈর্ব্যক্তিক এবং ন্যক্কারজনক সেই আচার এখন যেমন এই দেয়ালের দিকে মুখ করে আছি আমি সে রকমই না দেখেই শোনার ইচ্ছে হতো আমার, না হলেই পিটুনি খেতে হবে। কিন্তু, নুনের দিকে ঊর্ধ্বমুখ, দেয়ালের ওপরে আদিম চলন্ত প্রতিচ্ছবি– অভিভূত আমি সুদীর্ঘ সেই চিৎকার শুনতাম, কণ্ঠ বিশুস্ক, কোনও পাপের ফলশ্রুতির মতোই জ্বলন্ত অযৌন এক বাসনা আমার মস্তিষ্কের দুপাশ এবং উদর নিষ্পেষণ করে চলত। এভাবেই চলছিল দিন যাপন, তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্যই আমি করতাম না, শুষ্ক দাবদাহ আর নুনের দেয়াল থেকে দুর্বোধ্য প্রতিধ্বনিতে যেন তারা তরলীকৃত হয়ে ছিল সব, সময় যেন নিতান্তই ঢেউয়ের অগোচর ওঠা-নামা, নিয়মিত বিরতিতে, যন্ত্রণা কিংবা দৈবী অভিভবের হাহাকার বিস্ফোরিত হতো যেখানে, দীর্ঘ অফুরান দিন, আবার পাথুরে ঘরের এপারে ভয়ংকর সূর্যের মতোই কৌম দেবতার রাজত্ব ছিল যা, আর এখন, এরকমই তো করতাম আমি, দুঃখে বাসনায় কাঁদি, একটা অসৎভাবনা কুরে খায় আমাকে, বিশ্বাসঘাতক হতে চাই আমি, আমার বন্দুকের ব্যারেল আর তার অভ্যন্তরীণ আত্মা, এরই আত্মা, কেবল বন্দুকেরই আত্মা আছে– ওহ্, হ্যাঁ! আমার জিহ্বা কেটে নিল যেদিন তারা, ঘৃণার মৃত্যুহীন আত্মার উপাসনা শেখা হয়ে গেল আমার!

কী ধুন্ধুমার, কী আক্রোশ, দহন আর ক্রোধে বুঁদ আমি সাষ্টাঙ্গে শুয়ে আছি বন্দুকের ওপরে। কে এখানে হাঁপাচ্ছে? অনিঃশেষ এই উত্তাপ অসহ্য আমার কাছে, এই প্রতীক্ষা, তাকে আমার খুন করতেই হবে। একটা পাখি না, ঘাস-পাতা না, পাথর আর ঊষর বাসনা, ওদের হাহাকার, এই জিহ্বা, আমার ভেতরেই চলেছে সব নিরন্তর বকবকানি, আর, আমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করার দিন থেকে দীর্ঘ একঘেয়ে, নিঃসঙ্গ ক্লেশ, রাতের জলটুকু থেকেও বঞ্চিত, আমার নুনের ডেরায় কৌম দেবতার সঙ্গে বন্দি সেই রাতের স্বপ্ন দেখতাম আমি। শীতল নক্ষত্র আর অন্ধকারের নির্ঝর নিয়ে একমাত্র রাত্রিই বাঁচাতে পারত আমাকে, মানুষের অপদেবতার হাত থেকে অবশেষে দূরে সরিয়ে নিতে পারত আমাকে, কিন্তু চিরবন্দি সে কথা ভাবতেই পারতাম না আমি। নবীন আগন্তুক যদি আরও দেরি করে, আমি অন্তত মরু-প্রান্তর থেকে জেগে উঠতে দেখতে পাব এই রাতকে, ঢেকে ফেলতে আকাশকে, অন্ধকারের সর্বোচ্চ শিখর থেকে হিম সোনালি আঙুর-লতা ঝুলে পড়বে নিচে আর তা থেকেই আকণ্ঠ পান করতে পারব আমি, শুষ্ক কৃষ্ণ এই বিবর, জীবন্ত নমনীয় কোনও মাংসপেশিই যাকে পুনরুজ্জীবিত করছে না, সিক্ত করে দেব তাকে, অবশেষে বিস্মৃত হব সেই দিনের অনুষঙ্গ, যেদিন ছিন্ন হয়েছিল আমার জিহ্বা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কী তপ্ত ছিল সেই দিন, সত্যিই তপ্ত, বিগলিত হচ্ছিল নুন, অথবা সে রকমই মনে হচ্ছিল আমার, বাতাস আমার চক্ষু বিক্ষত করে যাচ্ছিল, আর সেই গুনিন তার মুখোশ ছাড়াই ভেতরে প্রবেশ করল। ধূসর ছিন্ন পোশাকে প্রায় নগ্ন নতুন একটি স্ত্রীলোক পেছনে পেছনে এল তার, সেই কৌম দেবতার মুখোশের আদলে অঙ্কিত চিত্রে আবৃত তার মুখ, সেই মূর্তির কুৎসিত মূঢ়তারই অভিপ্রকাশ সেখানে। তার সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাণবন্ত বাস্তুটি হলো তার চিকন চ্যাটালো দেহলতাখানি, সেই গুনিন গর্ভগৃহের দরজার পাল্লা খুলতেই দেবমূর্তির পদতলে লুণ্ঠিত হলো তা। এরপর বেরিয়ে গেল গুনিন, আমার দিকে দৃকপাত না করেই, তাপ ঊর্ধ্বমুখী হলো, আমি অচঞ্চল, নিশ্চল সেই দেহলতাখানির ওপর দিয়ে কৌম সেই দেবতার চোখ আমার ওপর, দেহখানির পেশিতে মৃদু কম্পন আর যখন আমি তারই দিকে এগিয়ে গেলাম, স্ত্রীলোকটির অপরূপ মুখাবয়বে কোনও পরিবর্তন সূচিত হলো না। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকানোর সময় কেবল বিস্ফারিত হলো তার চোখ, আমার পা স্পর্শ করল তাকে, তাপ যেন বিকম্পিত হতে লাগল, আর সেই অপরূপা তখনও বিস্ফোরিত চোখে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, একটি শব্দও উচ্চারণ না করে, ধীরে ধীরে চিৎ হয়ে শুল, অল্প অল্প করে টেনে তুলল দুখানি পা তার, হাঁটু দুটি কোমলভাবে দুপাশে ছড়িয়ে দিতে দিতে ওপরে তুলে ধরল সেই পা। কিন্তু, ঠিক তার পরমুহূর্তেই, সেই গুনিন ঘাপটি মেরে ছিল আমারই জন্য, সকলেই ঢুকে পড়ল তারা, সেই স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল সজোরে আমাকে, ভয়ংকরভাবে মারল আমাকে সেই পাপের অকুস্থলে, কী যে পাপ, হাসছি আমি, কোনখানে তা, পূণ্যই বা কোথায়, একটা দেয়ালের গায়ে চেপে ধরল আমাকে, লৌহ-কঠিন একটা হাত চেপে ধরল আমার চোয়াল, আর একটি হাত খুলে ফেলল আমার মুখ, টেনে ধরল জিহ্বা যতক্ষণ না রক্তাক্ত হলো তা, আমিই কী সেই পাশব চিৎকার করছিলাম, কেটে নেবার হিমশীতল স্পর্শ একটা, হ্যাঁ হিমশীতলই অবশেষে, জিহ্বাকে অতিক্রম করে গেল আমার। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, রাত, নিঃসঙ্গ আমি, সেঁটে আছি দেয়ালের গায়ে, গায়ে জমাট-বাঁধা রক্ত, অদ্ভুত গন্ধের শুকনো ঘাসের পুঁটুলি আমার মুখের ভেতরে, রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে, কিন্তু উদাসীন, আর সেই অন্যমনস্কতায় একমাত্র জীবন্ত ছিল মর্মান্তিক এক বেদনাবোধ। উঠে দাঁড়াতে চাইলাম আমি, পড়ে গেলাম, সুখী, নিদারুণ সুখী আমি মরে যেতে শেষমেশ, মৃত্যু তো হিমশীতলই, আর এর ছায়া লুকিয়ে রাখে না কোনও ঈশ্বরকে।

আমি মরলাম না, নতুন এক ঘৃণাবোধ জাগ্রত হলো আমার মধ্যে একদিন, একই সময়ে আর একটা কাজও করলাম আমি, সেই গর্ভগৃহের দরজার কাছে হেঁটে গেলাম, খুলে ফেললাম সেটা, এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিলাম পেছনে, আমার লোকজনকে ঘৃণা করতাম আমি, কৌম সেই দেবতা সেখানে, আর সেই গর্ভেরও গভীরে প্রার্থনাতিরিক্তই কিছু করলাম আমি, তাঁর প্রতি বিশ্বাস জাগল

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমার, আর অস্বীকার করলাম যা কিছু এ যাবৎ বিশ্বাস করে এসেছি। জয় হোক তাঁর! তিনিই শক্তি এবং ক্ষমতা, ধ্বংস করা যায় তাঁকে কিন্তু ধর্মান্তরীকরণ নয়, শূন্য রক্তিম চোখে আমার মাথার ওপর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। জয় হোক তাঁর। তিনিই প্রভু, একমাত্র অধীশ্বর, অসূয়াই যাঁর তর্কাতীত ঐশ্বর্য, ভালো আর কোনও প্রভুর অস্তিত্ব নেই। এই প্রথমবার, অপরাধের কারণে, একটিমাত্র যন্ত্রণায় ক্রন্দসী আমার সম্পূর্ণ শরীর, আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম নিজেকে আর মান্য করলাম তাঁর অপশাসন, জাগতিক নষ্ট নীতির স্তুতি করলাম তাঁরই ভেতর দিয়ে। তাঁরই রাজত্বের এক বন্দি মানুষ– নুনের এক পাহাড় থেকে কেটে বের করা হয়েছে নিষ্ফলা যে শহর, নিসর্গবিহীন, মরু-বালুকার দুর্লভ আর ক্ষণস্থায়ী সেইসব কুসুম-বর্জিত, আকস্মিক সৌভাগ্য কিংবা এমনকি সূর্য অথবা মরু-বালুতেও পরিচিত অপ্রত্যাশিত সেই মেঘসঞ্চার কিংবা প্রবল বর্ষণের স্নেহ-চিহ্ন থেকে সুরক্ষিত, সংকীর্ণ, সমকোণী, চতুষ্কোণ ঘরের শহর-শাসন, এক-কাট্টা মানুষ– এরই অত্যাচারিত, ঘৃণা-পুঞ্জিত নাগরিকে পরিণত হলাম স্বচ্ছন্দেই আমি, দীর্ঘ যে ইতিহাসে দীক্ষিত হয়েছিলাম তাকে বর্জন করলাম। আমাকে ভুল পথের নিশানা দেওয়া হয়েছিল, অসূয়ার দুঃশাসনই একামাত্র ত্রুটিহীন, আমাকে বিপথে চালিত করা হয়েছিল, সত্য হলো চতুষ্কোণ, ভারী, পুরু, কোনও শিরোপাকেই শিরোধার্য করে না তা, ভালো একটি অলস স্বপ্ন, একটি বাসনা নিরন্তর যা মুলতুবি হয়ে চলে আর নিরলস প্রচেষ্টায় অনুসৃত হয়, একটি সীমা যেখানে কখনোই পৌঁছোনো যায় না, অসম্ভব এর রাজ্যপাট। মন্দই কেবল তার সীমান্তে পৌঁছতে পারে, তার রাজ্যপাটই অবিসংবাদিত, এই দৃশ্য রাজ্যপাট স্থাপনের কারণেই দাসত্ব করতে হবে তার, তাহলেই দেখব আমরা, কিন্তু 'তাহলে' কথাটার অর্থ কী, মন্দই আছে শুধু চুলোয় যাক ইউরোপ, যুক্তিবাদ, সম্মান, এবং ক্রুশ-চিহ্ন। হ্যাঁ, আমার প্রভুর ধর্মেই আমাকে দীক্ষিত হতে হবে, নিশ্চিতভাবেই হ্যাঁ, আমি এক ক্রীতদাস ছিলাম, কিন্তু আমিও যদি পাপিষ্ঠ হয়ে উঠি, তাহলে আমি আর ক্রীতাদাস থাকব না, হোক না আমার পা শৃঙ্খলিত আর মুখ মূক। ওহ্, এই উত্তাপ আমাকে পাগল করে দিচ্ছে, দুর্মর আলোর নিচে সর্বত্রই কেঁদে উঠছে মরুভূখণ্ড, আর তিনি, দয়াল সেই প্রভু, যার নামেই বিদ্রোহ বিস্ফোরিত হয় আমার ভেতরে, আমি তাঁকে অস্বীকার করি, কারণ, তাঁর জিহ্বা ছেদন করা হয়েছিল যাতে তাঁর কথা পৃথিবীকে আর প্রতারিত করতে না পারে, পেরেক দিয়ে এমনকি তাঁর মস্তিষ্ককেও বিদ্ধ করা হয়েছিল, তাঁর দুর্ভাগা মস্তিষ্ক এখন আমার যেমন, কী গোলমেলে ব্যাপার, কত দুর্বল আমি এখন, অথচ পৃথিবী বিকম্পিত হলো না, নিশ্চিত আমি, তাঁকে যারা হত্যা করেছিল, পূণ্যবান মানুষ ছিলেন না তিনি, বিশ্বাস করি না আমি, কোনও পূণ্যবান মানুষের অস্তিত্ব নেই, আছে কেবল মন্দ প্রভুর দল, নিরবচ্ছিন্ন সত্যের সাম্রাজ্য সম্ভব করে যারা। হ্যাঁ, সেই কৌম দেবতারই কেবল ক্ষমতা আছে, এই জগতের তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, বিদ্বেষই তাঁর অনুশাসন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সমগ্র জীবন, শীতল জলের উৎস, মিন্টেরই মতো শীতল, মুখের ভেতরটা অসাড় করে দেয় যা, পুড়িয়ে দেয় পাকস্থলীর অভ্যন্তর।

অতএব বদলে গেলাম আমি, এটা তারা বুঝতে পারল, তাদের সঙ্গে দেখা হলে আমি তাদের হাত চুম্বন করতাম, তাদের পক্ষেই ছিলাম আমি, তাদের স্তুতিগানে কখনও অবসন্ন বোধ করিনি, তাদের বিশ্বাস করেছিলাম আমি, আশা করেছিলাম আমাকে যেমন করে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে, ঠিক তেমনি করেই আমাদের লোকজনকেও ছিন্নভিন্ন করবে তারা। আর যখন আমি জানলাম যে মিশনারিটি আসছে, আমি জানতাম কী আমার করণীয়। দিনটা ছিল অন্য দিনগুলোর মতোই, সেই একই চোখ-ঝলসানো রোদ্দুর, দীর্ঘদিন ধরেই যা চলছে! পড়ন্ত বিকেলে সেই অববাহিকার প্রান্ত ধরে একজন সেপাইকে ছুটতে দেখা গেল সহসা, আর, কয়েক মুহূর্ত পরেই, সেই দেবতার মন্দিরে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে আর বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তাদের মধ্যে একজন অন্ধকারে মেঝেয় চেপে ধরল আমাকে, ক্রুশ-আকারের তলোয়ারের নিচে, আর দীর্ঘক্ষণ ধরে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণ সেই শহর অদ্ভুত এক শব্দে পূর্ণ হয়ে গেল< নৈঃশব্দ্য অধিষ্ঠিত হলো সেখানে। কিছু কণ্ঠস্বর বেজে উঠল যা বুঝে উঠতে সময় লাগল আমার, কেননা, আমারই ভাষায় কথা বলছিল তারা, কিন্তু যেই তারা বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়াল, তলোয়ারের প্রান্তভাগ নামিয়ে আনা হলো আমার চোখের ওপরে, আমার সেপাইটি দিঃশব্দে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর দুটি কণ্ঠস্বর কাছাকাছি এল আর এখনও আমি শুনতে পাই তাদের, একজন প্রশ্ন করছে কেন সেই মন্দিরটি পাহারায় রাখা হয়েছিল, আর দরজাটা ভেঙেই ঢুকে পড়বে কি না তারা, অন্যজন, লেফটেন্যান্ট, বলল, 'না', তীক্ষ্ণভাবেই, একটু বাদেই যোগ করল, একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে এই শর্তে যে কুড়ি সৈনিকের একটি দল প্রাচীরের বাইরে ক্যাম্প করে থাকতে পারবে আর তাদের রীতি-নীতিকে সম্মান প্রদর্শন করবে। বেসরকারি সৈনিকটি হাসল, 'ওরা বশ্যতা মেনে নিচ্ছে', কিন্তু অফিসারটি জানত না, যাই হোক না কেন, এই প্রথম শিশুদের দেখভালের জন্য কাউকে গ্রহণ করতে উৎসুক ছিল তারা, আর সে-ই হবে গির্জার যাজক, অতঃপর রাজত্বের সীমানা নিয়ে ভাববে তারা। অন্যজন বলল, 'যাজকের কী কেটে নেবে তারা জানেন আপনি?' সৈনিকরা সেখানে যদি না থাকে। 'ওহ্ না!' অফিসারটি বলল। 'আসলে ফাদার বিফোর্ট এই সৈন্যদলের কাছে আসবেন, দুদিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবেন তিনি।' এ সবই আমি শুনছিলাম, নিশ্চল, তলোয়ারের নিচে শায়িত, যন্ত্রণাবোধ করছিলাম আমি, সুচ আর ছুরির একটা চক্র যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল ভেতরে আমার। ওরা পাগল, পাগল ওরা, এই শহরের গায়ে ওরা হাত দেবার উপক্রম করছে, তাদের দুর্জয় ক্ষমতার ওপর, সত্যকার ঈশ্বরের ওপর, আর যে লোকটির আসার কথা, তার জিহ্বা কাটা যাবে না, দুর্বিনীত তার ভালোমানুষী দেখাবে সে কোনও রকম প্রত্যাঘাত ব্যতিরেকেই। মন্দের রাজত্বকাল মুলতুবি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হয়ে যাবে, সন্দেহ পুনর্জাগরিত হবে, অসম্ভব ভালোর স্বপ্ন দেখে অপব্যয়িত হবে সময় আবার, একমাত্র সম্ভব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত না করে নিষ্ফল প্রয়াসে আত্মক্ষয় চলবে, আর, আমাকে ভীতি প্রদর্শন করা তলোয়ারের দিকে তাকালাম আমি, সমগ্র জগতের হে একমেবম অদ্বিতীয়ম! হে শক্তিময়, আর ক্রমেই সেই শহর শব্দহীন হয়ে উঠল, দরজা শেষমেশ খুলে গেল, একা রইলাম আমি, দগ্ধ এবং তিক্ত, কৌম দেবতার সঙ্গেই, আর তাঁর কাছেই নতুন আমার বিশ্বাস সুরক্ষার শপথ নিলাম আমার প্রভুদের, আমার অত্যাচারী ঈশ্বরের সুরক্ষার, বিশ্বাসঘাতকতা করতে, যে কোনও মূল্যে।

গরমের দাপট কিঞ্চিৎ কমেছে, পাথরে কম্পন হচ্ছে না আর, আমার বিবর থেকে বেরোতে পারি আমি, ক্রমেই হলুদ আর পাটকিলে রং-ধরা মরুভূমিকে দেখতে পারি, শিগগিরই নীল-লোহিত বর্ণ ধরবে সেখানে। গত রাতে তারা ঘুমনো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি আমি, দরজার তালা আটকে দিয়েছি, দড়ি দিয়ে মাপ করে সেই একই পদক্ষেপে বেরিয়ে গেছি আমি, রাস্তাগুলো আমার জানা, পুরনো রাইফেলটা কোথায় পাব তা-ও, কোন দরজা প্রহরীবিহীন, আর এইখানে পৌঁছলাম আমি ঠিক তক্ষুনি যখন এক মুঠো নক্ষত্রের চারপাশে ফিকে হতে শুরু করেছিল রাত, আর অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছিল মরু-প্রান্তরে। এখন মনে হচ্ছে দিনের পর দিন পশুর মতোই বিচরণ করছি প্রস্তরময় এই ভূখণ্ডে। অবিলম্বে, অবিলম্বে, আশা করছি অবিলম্বেই আসবে সে। মুহূর্তের ভেতরেই আমাকে খুঁজতে শুরু করবে তারা, পায়ে চলার পথে সমস্ত দিকেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে তারা, তারা জানবেই না যে তাদের জন্যই বেরিয়ে পড়েছি আমি, তাদেরই আরও ভালো করে সেবা করতে, আমার পা দুর্বল, ক্ষুধা আর ঘৃণায় প্রমত্ত। ওহ্! ওইখানে, পায়ে-চলা পথের প্রান্তে, দুটি উট ক্রমেই আকারে বাড়ছে, কদম কদম অগ্রসর হচ্ছে, হ্রস্ব প্রতিচ্ছায়ায় ইতিমধ্যেই বহুগুণিত তারা, প্রাণবন্ত স্বপ্নালু তাদের সেই চিরাচরিত কদমেই এগিয়ে আসছে তারা। এই তো এসে গেল, এসে গেল অবশেষে!

দ্রুত, এই তো রাইফেল, দ্রুতই গুলি ভরে ফেলি আমি। ওগো আদিম দেবতা, ঈশ্বর আমার, তোমার ক্ষমতা সুরক্ষিত হোক, আঘাত বহুগুণিত হোক, অভিশপ্ত মানুষের এই পৃথিবীতে ঘৃণার অকরুণ শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক, শয়তানেরাই চিরকালের জন্য প্রভুত্ব পাক, সেই রাজত্বের আবির্ভাব ঘটুক যেখানে নুন আর লৌহের একটিমাত্র শহরে কৃষ্ণাঙ্গ স্বেচ্ছাচারীরা নির্দয়ভাবে ক্রীতদাস বানাবে এবং বিস্তৃত করবে তাদের অধিকার-সীমা। আর, এখন, করুণাকে গুলি মারো, অক্ষমতা আর তার দাক্ষিণ্যকে গুলি মারো, মন্দের আবির্ভাবকে যা মুলতুবি করে গুলি মারো তার সব কিছুকেই , দুবার গুলি মারো, ওই যে, ওইখানে হুমড়ি খেয়ে নামছে তারা, পড়ে যাচ্ছে, আর দিগন্তরেখার দিকে পালাচ্ছে উটগুলো, উষ্ণ প্রস্রবণের মতো কালো পাখির একটা ঝাঁক অপরিবর্তিত আকাশের গায়ে এইমাত্র উঠে গেছে যেখানে। হাসছি আমি, হাসছি আমি, ঘৃণ্য অভ্যাসের দাস সেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লোকটা কাতরাচ্ছে, মাথাটাকে সামান্য তুলছে সে, আমাকে দেখছে– আমাকে, তার সর্বশক্তিমান শৃঙ্খলিত প্রভু, আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন সে, এই হাসি চূর্ণ করে দেব আমি! ভালোমানুষীর মুখের ওপর রাইফেলের বাটের ধ্বনিটুকু কী মধুর, আজ, অবশেষে আজই, সব কিছুই চূড়ান্ত, পূর্ণতা পেল, আর মরু-প্রান্তরের সর্বত্র, এমনকি এখান থেকে কয়েক ঘণ্টার দূরত্বেও, শৃগালেরা শূন্য-বাতাসে নিঃশ্বাস টানছে, তারপর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে গলিত-মাংসের ভোজের উৎসবে। বিজয়! করুণায় বিহ্বল এক স্বর্গের দিকে আমার হাত তুলে ধরি আমি, অপর প্রান্তে এই মাত্র আভাসিত এক ল্যাভেন্ডার-প্রচ্ছায়া ও ইউরোপের রাতগুলো, দেশ-বাড়ি, শৈশব, বিজয়ের এই মাহেন্দ্রক্ষণে কাঁদতেই হবে কেন আমাকে?

নড়ে-চড়ে উঠল লোকটা, না অন্য কোথাও থেকে আসছে শব্দটা, আর অন্যদিক থেকে ওই ছুটে আসছে তারা কালো পাখির ঝাঁকের মতোই, আমার প্রভুর দল, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, চেপে ধরল আমাকে, আহ্ হ্যাঁ! মারছে আমাকে, তাদের শঙ্কা– লুণ্ঠিত হচ্ছে তাদের শহর, তাই তারা আর্তনাদ করছে, তাদের শঙ্কা– প্রতিহিংসাপরায়ণ এই সৈন্যদলকে আমিই আহ্বান করে এনেছি, আর এটাই সত্যি কেবল, পবিত্র এই শহরে। নিজেদের রক্ষা করো এখন, আঘাত হনো! প্রথমে আমাকে মারো, সত্য তোমাদের অধিকার! ও আমার প্রভুর দল, সৈন্যদলকে জয় করে নেবে তখন তারা, পৃথিবী আর প্রেমকেও, মরু-প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে তারা, পার হয়ে যাবে সমুদ্র, কালো তাদের অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত করবে ইউরোপের আলো– পেটে আঘাত হানো, হ্যাঁ, চক্ষে– মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেবে তাদের লবণ, সমস্ত বৃক্ষলতা, সমস্ত যুবশক্তির মৃত্যু ঘটবে, আর সত্য বিশ্বাসের নির্মম সূর্যের নিচে বিশ্বব্যাপী মরু-প্রান্তরে শৃঙ্খলিত চরণে ক্লিষ্ট পদক্ষেপে আমার পাশে পাশে চলবে মূক জনারণ্য, নিঃসঙ্গ থাকব না আমি। আহ্! যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণা দিচ্ছে তারা আমাকে, মহৎ তাদের ক্রোধ, আর এই ক্রুশ-আকৃতির যুদ্ধাশ্রয়ে যেখানে আমাকে গচ্ছিত রেখেছে এখন তারা, হায়, হাসছি আমি, সেই আঘাতই ভালোবাসি আমাকে যা পেরেক দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে দেয়।

কী নিস্তব্ধ এই মরু-প্রান্তর! রাত হয়ে গেছে আর আমি একাকী। পিপাসার্ত আমি। তবুও অপেক্ষমাণ, কোথায় সেই শহর, দূরের সেই শব্দ-ঝংকার, আর সেই সৈন্যদল, হয়তো বা বিজয়ী, না, হতে পারে না, যদিও বিজয়ী হয়ে থাকে তারা, যথেষ্ট শয়তান নয় তারা, তারা শাসন করতে পারবে না, এখনও বলবে তারা মানুষকে আরও ভালো হতে হবে, আর ভালো আর মন্দের মধ্যবর্তী এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ, ছিন্ন-ভিন্ন, বিমূঢ়-বিহ্বল, হে কৌম দেবতা, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে? সব শেষ হয়ে গেছে, তৃষ্ণার্ত আমি, দেহ পড়ে যাচ্ছে আমার, গাঢ়তর রাত ঢেকে ফেলছে আমার দু চোখ।

দীর্ঘ, দীর্ঘ এই স্বপ্ন, জেগে উঠছি আমি, না, মৃত্যুপথেই চলেছি আমি, ভোর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হচ্ছে, প্রথম আলো, জীবিতদের জন্য দিনের আলো, আর আমার জন্য অপরিবর্তনীয় সূর্য, মাছি। কে কথা বলছে, কেউ না, আকাশ উন্মুক্ত হচ্ছে না, না, না, ঈশ্বর মরুপ্রান্তরে দৈববাণী করেন না, তবুও কোথা থেকে সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আছে 'ঘৃণা আর ক্ষমতার জন্য মৃত্যুকে সম্মতি যদি দাও তুমি, কে আমাদের ক্ষমা করবে?' আমার ভেতরেই কি অন্য কোনও জিহ্বা অথবা অন্য সেই লোকটিই মরতে অস্বীকার করছে, আমারই পদতলে, বলছে বারংবার 'সাহস আনো, সাহস! সাহস!' আহ্! আমি ভুল করছি ফের ভেবেই হয়তো! একসময়ের ভ্রাতৃপ্রতিম মানুষেরা, একমাত্র শরণ আমার, হে নির্জনতা, আমাকে পরিত্যাগ করো না! এখানে, কে এখানে তুমি, ছিন্ন-ভিন্ন, রক্তাক্ত মুখ, এ কি, তুমি গুনিন, সৈন্যদল পরাজিত করেছে তোমাকে, লবণ সব পুড়ে যাচ্ছে সেখানে, একি তুমি, আমার প্রিয়তম প্রভু! ঘৃণা-কুঞ্চিত ওই মুখভঙ্গি ঝেড়ে ফেলে দাও, ভালো হও এবারে, আমরা ভুল করেছিলাম, আবার প্রথম থেকেই শুরু করব আমরা, করুণার শহরখানি নতুন করে নির্মাণ করব, আমি, ঘরে ফিরে যেতে চাই আমি। হ্যাঁ, সাহায্য করো আমাকে, ঠিক ঠিক, তোমার হাতখানি দাও আমাকে...

এক মুঠো নুনে পূর্ণ হয়ে গেল বাক্যবাগীশ সেই ক্রীতদাসের মুখের অভ্যন্তর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৌন মানুষেরা

ভরা শীত এখন, তবুও ঘুম-ভাঙা শহরের মাথার ওপরে ঝকঝকে একটা সূর্য ততক্ষণে উদীয়মান। জেটির শেষ প্রান্তে সমুদ্র আর আকাশ মিলেমিশে যেন এক চোখ-ধাঁধানো রোশনাই। কিন্তু ইভারস সেসব দেখল না। বন্দরের ওপারে সারিবদ্ধ দোকানগুলোর পাশ দিয়ে ধীরগতিতে সাইকেল চালিয়ে এগোচ্ছিল সে। একটা দুবলা পা সাইকেলের একটা অনড় প্যাডেলের ওপর আড়ষ্টভাবে রাখা, অন্য পা রাত-শিশিরে পেছল হয়ে-থাকা পথে সামলে চলায় নিয়োজিত। সাইকেলের সিটের ওপরে ছোটখাটো দেহখানি তার। মাথা না তুলেই আগেকার ট্রাম-লাইন পাশ কাটাল সে, হঠাৎ-হঠাৎই হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে গাড়িগুলোকে পথ করে দিল। আর কখনও কখনও যে ব্যাগটাতে ফার্নান্দে দুপুরের খাবার দিয়ে দিয়েছিল তাকে, সেটাকে কনুই দিয়ে ঠেলে ঠিক জায়গায় সরিয়ে দিচ্ছিল। এই ঠেলে সরানোর মুহূর্তেই ব্যাগের ভেতরকার বস্তুগুলোর ওপরে খাপ্পা হয়ে উঠছিল সে। দুটো মোটা রুটির ভেতরে তার পছন্দসই স্প্যানিশ ওমলেট বা তেলে-ভাজা বিফ-স্টেক নয়, চিজ ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

কারখানায় যাবার পথ কোনোদিনই এত দীর্ঘ বলে মনে হয়নি তার। আসলে, বয়স বাড়ছিল। এই চল্লিশে, যদিও একটা আঙুরলতার মতোই নির্মেদ রেখেছিল চেহারাটাকে সে, কোনও পুরুষেরই পেশিগুলো এত চট করে সক্রিয় হয়ে ওঠে না। একটা তিরিশ বছরের খেলোয়াড়কে ভেটেরান বলে খেলার কাগজে মন্তব্য পড়েছিল। কখনও কখনও সেই কথা ভেবে কাঁধ দুটি ঝাঁকাত সে। 'ওই খেলোয়াড় যদি ভেটেরান', ফার্নান্দেকে বলত সে, 'বাস্তবিক আমি তো তাহলে হুইল চেয়ারে!' তবুও জানা ছিল তার রিপোর্টারটি একেবারে মিথ্যা বলেনি। তিরিশে অলক্ষ্যেই মানুষের পালে হাওয়া কমে আসতে থাকে। চল্লিশে হুইলচেয়ারে না হলেও নিশ্চিতভাবেই গতি তার সেদিকেই। চলতে চলতে শহরের অন্য প্রান্তে, যেদিকে কাঠপাত্র তৈরির কারখানা, সমুদ্রের দিকে চোখ তুলে তাকানোতে বীতস্পৃহ সে, সেই কারণেই কী? যখন সে কুড়ি ছিল, এই তাকানোতে তার কোনও ক্লান্তি ছিল না, কেননা এর ভেতরেই সমুদ্র-বেলায় একটি সুখী সপ্তাহান্তের সম্ভাবনা উদ্ভিন্ন হতো। এক পা খোঁড়া বলেই সাঁতার সবসময়ই প্রিয় ছিল তার কাছে। বছর গড়িয়ে গেছে তারপর, ফার্নান্দে এসেছে, জন্মেছে ছেলেটি, আর সেইসঙ্গে সংসার চালাতে গিয়ে দোকানে ফি শনিবার ওভারটাইম অথবা রবিবারগুলোতে অন্য কোথাও হরেকরকম কাজকর্ম। একটু একটু করেই সেই উদ্দাম দিনগুলো, যা তাকে তৃপ্তি এনে দিত, লুপ্ত হয়ে গেল জীবন থেকে

~ www.amarboi.com ~
তার। গহন, স্বচ্ছ জলরাশি, উত্তপ্ত সূর্য, যুবতীর দল, শারীরিক জীবন– দেশটাতে আনন্দের কোনও রকমফের নেই যেন আর। আর সেই আনন্দ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্বায়ী হয়ে যায়। সমুদ্রের প্রতি ইভারস-এর ভালোবাসা ফুরিয়ে যায়নি, তবে সেটা আসত দিনান্তে, উপসাগরের জলে অল্পস্বল্প অন্ধকার নেমে এলে। কাজের শেষে বাড়ির সামনে যখন সে এসে বসত, গায়ে ফার্নান্দের পরিপাটি ইস্ত্রি-করা পরিষ্কার শার্ট আর সামনে গেলাসে বরফ-ঠাণ্ডা পানীয়, মুহূর্তগুলো তখনই ভরে উঠত মাধুর্যে। সন্ধে নামত, আকাশটা নম্র আর মেদুর হতো, পড়শিরা তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎই যেন নামিয়ে আনত তাদের গলা। বুঝতে পারত না সে সেই ক্ষণগুলোতে সুখী বলে মনে হতো কি না নিজেকে তার, নাকি ইচ্ছে হতো কান্নার। সেই মুহূর্তগুলোতে যেন কোনও অন্তর্বিরোধ থাকত না, শান্তভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করত না সে তখন, না জেনেই– কেন এই অপেক্ষা।

সকালবেলায় যখন আবার সে কাজে বেরোত, সমুদ্রের দিকে তাকানোর একটুও ইচ্ছে হতো না তার। নিজের জায়গা থেকেই সমুদ্র যদিও তাকে ডাক দিয়ে যায়, সন্ধে নামার আগে সেদিকে সে তাকাবেই না। আজ সকালে মাথা নিচু করেই সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল সে, নিজেকে অস্বাভাবিক ভারী বলে বোধ হচ্ছিল তার, ভারাক্রান্ত ছিল হৃদয়। আগের রাতে মিটিং থেকে ফিরে এসে যখন সে জানিয়েছিল তারা কাজে যোগ দিতে চলেছে, উৎফুল্ল ফার্নান্দে বলেছিল, 'তাহলে বলো ওপরওয়ালা তোমাদের সকলেরই মাইনে বেশ বাড়িয়ে দিচ্ছে?' ওপরওয়ালা কিছুই মাইনে বাড়ায়নি, ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, ব্যাপারটা গুছিয়ে আনতে পারেনি তারা। একটা হঠকারী হুঁশিয়ারি, ইউনিয়নও পুরোপুরি মদদ দেয়নি ব্যাপারটাতে। আসলে, এই গোটা পনেরো শ্রমিক ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না; অন্য সমবায় কারখানাগুলো, যাদের শ্রমিকবৃন্দ এতে যোগ দেয়নি, তাদের কথা বিবেচনায় রাখতে হয়েছিল ইউনিয়নকে। ইউনিয়নকে সত্যি সত্যি দোষ দেওয়া যায় না। ট্যাঙ্কার এবং ট্রাক-বাহিত ট্যাঙ্ক নির্মাণের ধাক্কায় কাঠ-ব্যারেল কারখানাগুলো ধুঁকছিল। ব্যারেল এবং বড় কাঠপাত্র তৈরির কাজ ক্রমেই কমে আসছিল। কাঠের তৈরি মদের বিশাল পাত্রগুলোর মেরামতির কাজটুকুই ছিল প্রধান। মালিকরা বুঝে নিয়েছিল ব্যবসার হয়ে এসেছে, তবুও বেঁচে-বর্তে থাকবার খরচ ঊর্ধ্বমুখী হলেও বেতনকে স্থিতিশীল রাখার সহজ পন্থা অনুসরণ করে অল্প-স্বল্প মুনাফার ব্যবস্থাটাকেই চালিয়ে যেতে চেয়েছিল তারা। এই কাঠপাত্র তৈরির ব্যাপারটা খতম হয়ে গেলে শ্রমিকরা কী করতে পারে? কষ্ট করে যে বৃত্তিটা শেখা হয়, সেটা তো ছেড়ে দেবার জন্য নয়। আর এই বৃত্তিটা ছিল বেশ শক্তই, দীর্ঘ শিক্ষানবিশি-সাপেক্ষ। এই রকম ভালো কাঠমিস্ত্রি, বাঁকানো কাঠের টুকরোগুলো আগুনে ফেলে লোহার বেড় পরিয়ে কোনও রকম গাছের পাতা বা ছিবড়ে ছাড়াই প্রায় জল-নিরোধী করে তুলত যারা, সংখ্যায় তারা খুবই কম। ইভারস এটা পারত আর তাই গর্বও ছিল তার। বৃত্তি বদলে ফেলা তেমন কিছু না, কিন্তু যেটা তোমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জানা আছে, তোমার নিজস্ব কারিগরি দক্ষতা, সেটা বর্জন করা সহজ কর্ম নয়। একজন বেকার উঁচু দরের কারিগর তুমি কিন্তু বসে গেছ, তাহলে হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এই হাল ছেড়ে দেওয়া ব্যাপারটাও তেমন সহজ নয়। কোনও আলোচনা নয়, মুখ বন্ধ করে থাকা প্রতি সপ্তাহান্তে, ওরা তোমাকে যা দিতে চায়, একেবারেই যৎসামান্য যদিও, তা-ই গ্রহণ করার জন্য ফি-সকালে একই পথ ধরে ক্লান্ত শরীরটাকে এই টেনে নিয়ে যাওয়া বড় কষ্টকর।

এ কারণেই ক্ষিপ্ত হয়েছিল তারা। গোড়াতে দু-একজন কিন্তু কিন্তু করেছিল, ওপরওয়ালার সঙ্গে প্রথম আলোচনার পর ক্ষোভ তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। পরিষ্কার বলে দিয়েছিল সে, পোষালে থাক, না হলে রাস্তা দেখ। এভাবে কেউ কি বলতে পারে! 'কী চায় সে আমাদের কাছে?' এসপোজিটো বলেছিল, 'নতজানু হব আমরা আর পদাঘাতের জন্য প্রতীক্ষা করব?' ওপরওয়ালা মানুষটি অবশ্য খারাপ নয়। বাপের কাছ থেকেই সম্পত্তিটা পেয়েছে সে, এই কারখানাতেই বড় হয়ে উঠেছে এবং বছরের পর বছর ধরে প্রায় সব শ্রমিককেই সে দেখেছে। কারখানার কাঠপাত্র তৈরির চুল্লিতে সার্জিন কিংবা সসেজ তৈরি করত তারা, সে দিত মদ। ভালোই বটে মানুষটা। নববর্ষে তাদের প্রত্যেককেই পাঁচ বোতল পুরনো মদ প্রতিবারেই দিত সে, আর প্রায়ই যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ত কিংবা বিয়ে বা প্রথম দীক্ষার মতো উপলক্ষে টাকা উপহার দিত সে। যখন তার মেয়ের জন্ম হলো, বাড়ির সকলের জন্য চিনিতে রসানো অ্যালমন্ড পাঠিয়েছিল। সমুদ্রতীরে তার খামারবাড়িতে দু-তিনবার শিকারে নেমন্তন্ন করেছিল তাকে সে। শ্রমিকদের সে পছন্দ করত, সন্দেহ নেই এবং প্রায়ই বলত তার বাবা একদিন শিক্ষানবিশরূপেই শুরু করেছিল কাজ। কিন্তু তাদের বাড়িতে সে কখনও যায়নি, এই নিয়ে তার কোনও ভাবনাও ছিল না। নিজের কথাই সে ভাবত শুধু, কারণ নিজেকে ছাড়া আর কিছুই জানত না সে। আ, এখন, হয় মেনে নাও, না হলে বিদেয় হও। ঘুরিয়ে বললে, একগুঁয়েমিও এসে গিয়েছিল তার। এ রকম পরিস্থিতিতে এটা সে করলেও করতে পারে।

ইউনিয়নকে জোর করেই দাবিয়ে দিয়েছে সে, বন্ধ করে দিয়েছে কারখানার দরজা। 'পিকেটিং-এর ঝামেলায় যেও না', বলেছে সে, 'কারখানা বন্ধ থাকলে টাকা বাঁচে আমার।' কথাটা সত্যি নয়, অবশ্য তাতে কিছু এসে যায়নি, কেননা তাদের মুখের ওপরেই বলে দিয়েছিল সে, দয়া করেই তাদের কাজে বহাল করেছিল সে। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এসপোজিটো বলেছিল তাকে সে একটা মানুষই নয়, রগচটা লোক ছিল সে, থামাতে হয়েছিল দুজনকেই। আবার, সেইসঙ্গে শ্রমিকদের প্রভাবিতও করেছিল ব্যাপারটা। ধর্মঘটের কুড়ি দিন পার, বাড়িতে বউরা বিষণ্ন, শ্রমিকদের দু-তিনজন হাতোদ্যম, অবশেষে মধ্যস্থতা আর হারানো শ্রমদিবস ওভার-টাইমে পুরিয়ে দেবার আশ্বাসে ইউনিয়ন তাদের ঘাট স্বীকার করতে পরামর্শ দেয়। কাজে ফিরে যেতে রাজি হয় তারা। অবশ্য, ভাবখানা উদ্ধত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রেখে আর এই বলে যে ব্যাপারটা মীমাংসিত হয়নি, পুনর্বিবেচনা করতেই হবে। কিন্তু এই সকালে পরাজয়ের ক্লান্তি, মাংসের বদলে চিজ কল্পিত সেই সম্ভাবনাকে শেষ করে দিয়েছিল। সূর্য কেমন করে উঠছে, তাতে আর কিছু এসে যায় না, নতুন কোনও প্রতিশ্রুতিও নেই সমুদ্র-সান্নিধ্যে। ইভারস এবটা প্যাডেলেই চাপ দিচ্ছিল আর চাপটা একবার ঘুরলেই মনে হচ্ছিল একটুখানিক এগিয়ে যাচ্ছে সে বার্ধক্যের দিকে। কারখানার কথা ভাবতে পারছিল না সে, সহকর্মী কিংবা ওপরওয়ালা, যাদের আবার দেখতে পাবে সে, তাদের কথাও না। মনটা ভারী হয়ে যাচ্ছিল আপনা থেকেই।

চিন্তিত ফার্নান্দে বলেছিল, 'ওপরওয়ালাকে কী বলবে তোমরা?'

'কিচ্ছু না।' সাইকেলে উঠে বসেছিল ইভারস, মাথা নেড়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপেছিল সে, ছোট্ট, কালচে, কুঞ্চিত মুখখানি যাবতীয় দুর্বলতাসহ কঠিন হয়ে এসেছিল। 'কাজে ফিরে যাচ্ছি আমরা। সেইটেই যথেষ্ট।' সাইকেল চালিয়ে চলেছিল সে এখন। দাঁত তার তেমনি লেগে আছে দাঁতে; বিষণ্ন নির্জলা ক্রোধ তার– আকাশটাও আঁধার হয়ে ছিল তাতে।

গাছপালার ছায়ায় ঢাকা চওড়া সড়ক আর সমুদ্র ছেড়ে পুরনো স্প্যানিশ এলাকার স্যাঁতসেঁতে পথে এসে পড়ল সে এবারে। এই পথ সেদিকেই চলে গেছে যেখানে শুধু শেড, খারিজ যন্ত্রপাতির স্তূপ, গ্যারেজ এবং সেই কারখানা– নিচু একটা শেডেরই মতো যার দেয়ালগুলোর মাঝামাঝি পর্যন্ত পাথরের তৈরি, করুগেটের টিনের ছাদ পর্যন্ত কাচ দিয়ে ঢাকা। আগে যেখানে পিপে তৈরি হতো, একটা খোলা জায়গা চারপাশে যার সারি সারি শেড, কারখানার মুখটা সেদিকেই। ব্যবসা সড় হবার পরে যেদিকটা এখন পরিত্যক্ত এবং নষ্ট মেশিনপত্তর আর পিপে ডাঁই করে রাখার গুদাম। খোলা সেই চবুতরার পাশে পুরনো টালি দিয়ে বাঁধানো একটা সরু পথের ওপারে মালিকের বাগানের শুরু। বাগানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটি তাঁর। বাড়িটা বিশাল কিন্তু হতশ্রী, তবুও বাইরের সোপানগুলো ঘিরে ভার্জিনিয়ালতা আর হনিসাক্‌ল্-এর বাড়-বাড়ন্ত সম্ভ্রম জাগায়।

ইভারস তক্ষুনি দেখতে পেল কারখানার দরজাগুলো বন্ধ। শ্রমিকদের একটা দল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। যতদিন সে এখানে কাজ করছে, এই প্রথম, পৌঁছেই দরজাগুলো বন্ধ দেখল সে। শেষ কথা যে তারই, সেটাই বোঝাতে চায় মালিক। বাঁ-হাতি ঘুরল ইভারস, দুটো বিলম্বিত শেডের মাঝখানে সাইকেলটা রেখে দরজার দিকে এগোল। দূর থেকেই এসপোজিটোকে চিনতে পারল সে, লম্বা, কালো, রোমশ চেহারা– পাশাপাশি কাজ করত তার, ইউনিয়নের প্রতিনিধি মারকউকে দেখল– সেই কট্টর চেহারা, দেখল কারখানার একমাত্র আরব-কর্মী সাঈদকে, তারপর আর সকলকেই– তার এগিয়ে আসা নিঃশব্দে লক্ষ রাখছিল যারা। কিন্তু, তাদের সঙ্গে যোগ দেবার আগেই কারখানার দরজার দিকে সকলেই দৃষ্টি ফেরাল। দরজাগুলো সেইমাত্র খুলতে শুরু করেছে। দরজার মুখেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফোরম্যান বালেস্টারকে দেখা গেল। ভারী দরজাগুলোর একটাকে খুলল সে এবং শ্রমিকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে লোহার রেল-পথের ওপরে আস্তেই ঠেলে দিল সেটাকে।

বালেস্টার, যে নাকি সবচাইতে প্রবীণ, ধর্মঘটকে সমর্থন করেনি, কিন্তু মালিকের স্বার্থকেই দেখছে সে– এসপোজিটো এমন কথা বলার পর থেকে চুপ করেই ছিল। এখন দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সে, নেভি-ব্লু পোশাকে চওড়া আর খর্বকায়, খালি পা (সাঈদ ছাড়া একমাত্র সে-ই খালিপায়ে কাজ করত), এক এক করে ভেতরে ঢুকতে দেখল তাদের এমন নিষ্প্রভ চোখ মেলে, রোদ-পোড়া মুখের আদলে নিতান্ত বিবর্ণ দেখাল যা, পুরু এলানো গোঁফের নিচে ঝুলে আছে তার হাঁ-মুখ। চুপ করে ছিল তারা, পরাজিত এই প্রত্যাবর্তনে অপমানিত, নিজেদের নৈঃশব্দ্যের প্রতি বিক্ষুব্ধ, কিন্তু যতই দীর্ঘতর হচ্ছিল সেটা ততই তা লঙ্ঘনের শক্তি হ্রাস পাচ্ছিল যেন তাদের। বালেস্টারের দিকে দৃকপাত না করেই তারা ভেতরে ঢুকল, কারণ তারা জানত এভাবে প্রবেশ করতে দিয়ে সে একটা নির্দেশই পালন করছিল এবং তার তিক্ত এবং আনত চোখই বলে দিচ্ছিল সে চিন্তামগ্ন। ইভারসই তাদের মধ্যে তাকাল তার দিকে। বালেস্টার, যে তাকে পছন্দ করত, একটি কথাও না বলে মাথা নাড়ল।

এখন সবাই তারা প্রবেশপথের ডান পাশে লকার-রুমে। খোলা খুপরি-ঘরগুলো আ-রঙা বোর্ড দিয়ে বিভাজিত, যার দুপাশেই তাকগুলো তালা দেওয়া। কারখানার দেয়ালের গায়ে সবচেয়ে দূরের খুপরিটাতে মেঝের মাটি কেটে তৈরি নর্দমার ওপর একটা শাওয়ার বসানো। কারখানার মাঝখানে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিত্যক্ত কাজগুলো পরিদৃশ্যমান– বড় পিপেগুলো, আলগা লোহার বেড় পরানো, আগুনে আঁটো হবার অপেক্ষায়, ভেতরে চওড়া ছিদ্রসমেত পুরু পাটাগুলো (এবং তাদের কোনও কোনওটার ভেতরে প্রবিষ্ট করা আছে গোলাকার কাষ্ঠতল যাদের প্রান্তগুলো তীক্ষ্ণ করা হবে) এবং সবশেষে নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ডগুলো। প্রবেশপথের বাঁয়ে দেয়াল বরাবর পাটাগুলো একটা সারিতে সজ্জিত। তাদের সামনেই র‍্যাঁদার জন্য ডাঁই করা পিপের কাঠ। ডান-দেয়ালের গা-ঘেঁষে, পোশাক বদলের ঘরের কাছেই, মস্ত দুটো বৈদ্যুতিক করাত, পুরোপুরি তৈলাক্ত, শক্ত-পোক্ত এবং নিস্তব্ধ, ঝকঝক করছিল।

কিছুকাল আগেও হাতগুনতি যে কটা লোক কাজ করে সেখানে তাদের জন্যে কারখানাটা যেন ভালোরকমই বড় হয়ে উঠেছিল। গ্রীষ্মে এটা ছিল সুবিধাজনক, শীতে অসুবিধাজনক। কিন্তু আজ, এই বিশাল পরিসরে, কাজগুলো যেখানে অর্ধসমাপ্ত, প্রতিটি কোণে পরিত্যক্ত পিপেগুলো– একটিমাত্র লৌহ-বেড়ে বিধৃত যাদের তলগুলো ওপরের দিকে ছড়িয়ে গেছে অমসৃণ কাঠের ফুলেরই মতো, কাঠ-গুঁড়োয় আচ্ছন্ন পাটাগুলো, টুল-বক্স এবং যন্ত্রপাতি– সব কিছু মিলে একটা অবহেলার সুস্পষ্ট ছাপ। কারখানাটায় এবার তাকিয়ে দেখল তারা, তাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পুরনো সোয়েটার আর বিবর্ণ তালি-মারা পাজামা পরে এবং ইতস্তত করল। বালেস্টার তাদের দেখছিল। 'তাহলে', বলল সে, 'শুরু করলাম আমরা?' একে একে একটি কথাও না বলে তারা নিজেদের জায়গায় চলে গেল। এক এক করে বালেস্টার প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কোন কাজটা শুরু করতে হবে বা কোনটা শেষ করতে হবে সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিল তাদের। কেউ প্রত্যুত্তর করল না। একটা পিপের উত্তল অংশে লোহার বেড়ি পরাতে লৌহমুখী গোঁজের ওপরে হাতুড়ির প্রতিধ্বনি শুরু হয়ে গেল অনতিবিলম্বে, গাঁটের গায়ে ধাক্কা খেয়ে র‍্যাঁদার কঁকানি শোনা গেল এবং এসপোজিটোর চালু করা একটা করাত গুঞ্জন-শব্দে চেরাইয়ের কাজে লেগে গেল। সাঈদ-এর কাজ হলো দরকার মতো অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাঠের টুকরোগুলো নিয়ে আসা অথবা র‍্যাঁদা-পরিত্যক্ত কাঠের অংশগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া যার ওপরে কাঠের পিপেগুলো রেখে এমনভাবে তাদের ফোলানো হতো যাতে লোহার বেড়িতে তারা ভালোভাবে এঁটে যায়। যখন কেউ-ই ডাকত না তাকে, তখন একটা কাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মরচে পড়া মস্ত লৌহ-বেড়িগুলো হাতুড়ি পিটিয়ে জোড়-লাগানোর কাজ করত সে। কাঠ-পোড়ার গন্ধে ভরে উঠতে লাগল কারখানা। ইভারস এসপোজিটোর কাটা কাঠের অংশগুলো র‍্যাঁদা করে জোড়া লাগাচ্ছিল। পুরনো গন্ধটা নাকে যেতেই একটু যেন হাঁফ ছাড়ল সে। সকলেই নিঃশব্দে কাজ করছিল, কিন্তু একটা উষ্ণতা, প্রাণের সাড়া কারখানাটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে শুরু করেছিল যেন। চওড়া, জানালাগুলো দিয়ে বিশুদ্ধ টাটকা বাতাসে পরিপূর্ণ হচ্ছিল কারখানা-ঘর। সোনালি সূর্যালোকে নীলাভ ধোঁয়া উঠে যাচ্ছিল ঊর্ধ্বাকাশে। এমনকি ইভারস তার খুব কাছেই একটা পতঙ্গকে গুঞ্জিত হতে শুনতে পেল।

তখন পুরনো কারখানা-ঘরের দেয়ালের শেষ-প্রান্তের দরজাটা খুলে গেল এবং এম. লাসালে, মালিক চৌকাঠে দাঁড়ালেন। রোগাটে এবং কালো তিনি, বয়স ত্রিশের হয়তো সামান্য ওপরে। গাত্রচর্মের মতো রঙের একটা গ্যাবার্ডিন স্যুটের ওপরে প্রলম্বিত তাঁর সাদা আলখাল্লায় স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছিল তাঁকে। কুড়ুলের মতন আকৃতির একেবারে হাড়-সর্বস্ব মুখের গঠন তাঁর। প্রাণ-শক্তির প্রকাশ যাদের মধ্যে দেখা যায়, তাদের মতোই সাধারণভাবে প্রীতিকর ছিল তাঁর চেহারা। তবুও দরজা দিয়ে আসবার সময় কিছুটা যেন সংকুচিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। অন্য দিনের মতো তুলনায় তাঁর শুভকামনা কম সুরেলা ছিল আজ। কেউই অবশ্য প্রত্যুত্তর করল না তার। হাতুড়ির শব্দ অনিয়মিত হলো, ঠিক জায়গায় ঘা লাগল না এবং জোরালো শব্দে ফিরে এল পুনর্বার। এম. লাসালে কয়েক পা দ্বিধার পর ছোট ভালেরির দিকে এগোলেন। ভালোরি মাত্র এক বছরই কাজ করছে তাদের সঙ্গে। ইভারস-এর কয়েক ফুট দূরত্বেই বিদ্যুৎ- চালিত করাত-কলের কাছে মস্ত একটা পিপের তলাটা লাগাচ্ছিল সে। মালিক তাকে দেখলেন। কিছু না বলে ভালেরি কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। 'এই যে ছেলে', এম. লাসালে বললেন, 'কী রকম চলছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সব?' কম বয়সি সেই শ্রমিকটি হঠাৎই তার হাতে-পায়ে আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল যেন। এসপোজিটোর দিকে এক পলক তাকাল সে। কাছেই ছিল এসপোজিটো, তার বিশাল হাতে ইভারস-এর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পিপের টুকরো অংশগুলো তুলে নিচ্ছিল তখন। কাজ করে যেতে যেতেই এসপোজিটোও তাকাল তার দিকে আর ভালেরিও মালিককে কোনও কথা না বলেই পিপের কাজে নিবিষ্ট হলো। ভালেরির সামনে কিঞ্চিৎ বিমূঢ়ই লাসালে দাঁড়িয়ে রইলেন এক মুহূর্ত। তারপরেই কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি এবং ঘুরে দাঁড়ালেন মারকাউ-এর দিকে। বেঞ্চের দুদিকে দুপা ছড়িয়ে ধীর এবং সাবধানী হাতে একটা পিপের তলার ধারগুলোকে ধারালো করার অন্তিম প্রক্রিয়াটুকু সারছিল মারকাউ তখন। 'হ্যাল্লো, মারকাউ', পিঠ-চাপড়ানোর গলায় বললেন লাসালে। মারকাউ উত্তর দিল না, নিবিষ্ট হয়ে গেল কাঠ থেকে খুবই পাতলা বাড়তি অংশটুকু তুলে ফেলার কাজে। 'হলো কী তোমাদের?' অন্য শ্রমিকদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে উঁচু গলাতেই শুধোলেন লাসালে। 'আমরা একমত হইনি, ঠিক কথা। কিন্তু একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে আমাদের তা অন্তরায় হয়নি। এসব বলে আর কী-ই বা হবে তাই।' মারকাউ উঠে দাঁড়াল, পিপের তলার অংশটা তুলে ধরল, হাতের চেটো দিয়ে তার গোলাকার প্রান্তগুলো পরীক্ষা করে দেখল, ক্লান্ত চোখ দুটি তার ছুঁচলো করল প্রসন্ন তৃপ্তিতে এবং তখনও নির্বাক, অন্য একজন শ্রমিকের দিকে এগিয়ে গেল, যে তখন একটা পিপের অংশগুলো জোড়া লাগানোর কাজ করছিল। গোটা কারখানা জুড়ে হাতুড়ি আর বিদ্যুৎ-চালিত করাত-কলের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। 'ঠিক আছে', লাসালে বললেন। 'পর্বটা শেষ হলে বালেস্টারের মাধ্যমে জানিও আমাকে।' শান্তভাবে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কারখানার শব্দ ছাপিয়ে, দুবার বেজে উঠল একটা ঘণ্টা। একটা সিগারেট পাকানোর জন্য সবে বসেছিল বালেস্টার, ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, শেষ প্রান্তের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সে চলে যেতেই হাতুড়ির শব্দের প্রতিধ্বনি স্তিমিত হলো, একজন শ্রমিক তো বালেস্টার ফিরে এলেও হাতুড়ি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা থেকেই বালেস্টার বলল শুধু, 'মারকাউ এবং ইভরাস, মালিক তোমাদের ডাকছেন।' ইভারস-এর প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো যে যাবে এবং হাত ধুয়ে নেবে, কিন্তু যেতে যেতেই মারকাউ তার হাত ধরে ফেলল এবং ইভারস তার পেছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল।

বাইরের চত্বরে আলো এত পরিষ্কার ছিল, এত তরল যে মুখ এবং বাহুতে ইভারস তা অনুভব করতে পারল। বাইরের সিঁড়ির ওপরের ধাপে উঠে গেল তারা– হানিসাক্‌ল্‌ গাছের নিচে যেখানে কয়েকটা ফুল তখনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। যখন তারা বারান্দায় প্রবেশ করল, দেয়ালগুলো যার ঢাকা পড়ে গেছে সরকারি প্রশংসাপত্রে, একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পেল তারা আর এম, লাসালের কণ্ঠস্বর 'দুপুরের খাওয়া শেষ হলে বিছানায় শুইয়ে দাও মেয়েকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যদি সে ভালো না হয়ে ওঠে তাহলে ডাক্তার ডেকে আনব।' তারপর অকস্মাৎই বারান্দায় দেখা দিলেন তিনি এবং ছোট্ট অফিস-ঘরটার দিকে দেখালেন যেটা তারা আগে থাকতেই জানত। ঘরটা সাজানো ছিল নকল গ্রামীণ আসবাবে, দেয়ালগুলো সাজানো ছিল খেলা-ধুলোর ট্রফি দিয়ে। 'বসো', ডেস্কের পেছনে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন লাসালে। দাঁড়িয়েই রইল তারা। 'তোমাদের ভেতরে ডেকেছি কারণ, মারকাউ, তুমি হলে প্রতিনিধি, আর ইভারস, বালেস্টারের পরে তুমিই আমার সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী। আলোচনায় ফিরে যেতে আমার আর কোনও ইচ্ছেই নেই, ও-পর্ব শেষ। তোমরা যা দাবি করছ, আমি একেবারেই তা দিতে পারব না। বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, আর আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে কাজ শুরু করে দিতে হবে ফের। দেখতে পাচ্ছি, আমার ওপরে রেগে আছ তোমরা, এটা আমার লাগছে, যা মনে হচ্ছে ঠিক তাই বলছি তোমাদের। কেবল এইটুকুই আমার যোগ করার আছে যা আমি আজ বলতে অক্ষম, ব্যবসায় উন্নতি হলে হয়তো সেটাই আমি করতে পারব। আর, এটা যদি করা সম্ভব হয় তাহলে তোমরা বলার আগেই তা করব। ততদিন একসঙ্গে কাজে লাগার চেষ্টাই করি আমরা।' থামলেন তিনি, ভাবলেন হয়তো বা, তারপর ফিরে তাকালেন তাদের দিকে। 'তাহলে?' বললেন এবারে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল মারকাউ। দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলতে চাইল ইভারস, কিন্তু পারল না। 'শোনো' বললেন লাসালে, 'তোমরা সবাই মনে কুলুপ এঁটেছ। এটা কেটে যাবে। কিন্তু যখন সুবিবেচনা ফিরে আসবে তোমাদের, এই মুহূর্তে তোমাদের যা বলেছি ভুলে যেও না তা।' উঠলেন তিনি, মারকাউকে বিবর্ণ দেখাল, তার পরিচিত কট্টর মুখমণ্ডল কঠিন হলো, আর মুহূর্তের জন্যই বিশ্রী দেখাল তা। তারপর আচমকাই ঘুরে দাঁড়াল সে এবং বেরিয়ে গেল। লাসালে, সমান বিবর্ণ, হাত না বাড়িয়েই ইভারস-এর দিকে তাকালেন। ' গোল্লায় যাও', চেঁচিয়ে বললেন তিনি।

কারখানায় ফিরে গিয়ে তারা দেখল সবাই তখন দুপুরের খাবার খাচ্ছে। বালেস্টার বাইরে। মারকাউ বলল শুধু, 'শঠে শাঠ্যং' এবং নিজের বেঞ্চে ফিরে গেল। এসপোজিটো নিজের রুটি না কামড়ে জানতে চাইল কী তারা বলেছে। ইভারস বলল তারা কোনও জবাবই দেয়নি। তারপর নিজের হ্যাভারস্যাক আনতে উঠে গেল সে, ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল। খেতে শুরু করার মুখে কাছেই সাঈদকে দেখতে পেল সে। টুকরো কাঠের গাদার ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল সে, আনমনে তাকিয়ে ছিল জানালার দিকে, স্তিমিত-আলোর আকাশের রঙে নীলচে রং ধরে ছিল সেখানে। সাঈদকে সে জিজ্ঞেস করল তার খাওয়া হয়ে গেছে কি না। সাঈদ বলল সে তার ডুমুরগুলো খেয়েছে। ইভারস খাওয়া থামাল। লাসালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অস্বস্তিকর যে ভাবটা এতক্ষণ তাকে ছাড়ছিল না, হঠাৎই যেন হাওয়া হয়ে গেল সেটা, প্রসন্ন উষ্ণতায় ফিরে এল সে। সে তার রুটি দুটি ভাগ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
করে উঠল, সাঈদের কাছে গেলে সাঈদ নিল না দেখে বলল আগামী সপ্তাহ থেকে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। 'তখন আমাকেই তুমি খাওয়াবে', বলল সে। সাঈদ হাসল। এবারে ইভারস-এর খাবারে দাঁত বসাল সে, কিন্তু এমন পরিপাটিভাবে যেন মানুষটা আদৌ ক্ষুধার্ত নয়।

এসপোজিটো পুরনো একটা পাত্র নিয়ে কিছু কাঠের টুকরোয় আগুন ধরাল। বোতলে করে আনা কিছু কফি সে গরম করল। বলল ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে জেনে মুদিখানার মালিক তাদের কারখানাকে এটা দিয়েছে। সর্ষের একটা পাত্র হাত-ফেরতা হলো। সেই পাত্রে এসপোজিটো চিনি-মেশানো কফি ঢেলে দিল সকলকে। খাবারে যতখানি আগ্রহ ছিল, তার চাইতে বেশি আগ্রহে সাঈদ গলাঃধকরণ করল তা। তপ্ত পাত্র থেকেই অবশিষ্ট কফিটুকু খেয়ে ফেলল এসপোজিটো, ঠোঁট চাটল সে, গালাগালও করল। সেই মুহূর্তে বালেস্টার ভেতরে ঢুকে কাজে ফিরে যাবার সংকেত জানাল।

কাগজপত্র এবং বাসন-কোসন এক জায়গায় গুছিয়ে যখন তারা উঠছে, বালেস্টার এসে তাদের মধ্যে দাঁড়াল, হঠাৎ করেই বলল, সকলের পক্ষেই এটা কষ্টকর, তার নিজের পক্ষেও। কিন্তু তার জন্য শিশুর মতো আচরণ করা চলে না এবং এই মৌনও কাজের কথা নয়। হাতে পট-সমেত এসপোজিটো তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার লম্বাটে অমসৃণ মুখ সহসা লাল হয়ে গেল। ইভারস জানত সে কী বলতে যাচ্ছে– এবং সবাই একই সঙ্গে ভাবছে যা তখন। মৌনব্রত নেয়নি তারা, তাদের মুখগুলোই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, হয় মানো, না হলে যাও, আর ক্রোধ আর অসহায়তা এক এক সময় এতটাই আহত করে যে কাঁদতেও পারবে না তুমি। তারা পুরুষ মানুষ তো বটে, আর দেখন-হাসি মুখ করে শুরুও করতে পারেনি তারা। কিন্তু এসপোজিটো এসব কিছুই বলল না, শেষমেশ মুখের ভাব কোমল হলো তার। বালেস্টারের কাঁধে আলতো চাপড় মারল সে, অন্যরা যে যার কাজে ফিরে গেল। হাতুড়ির শব্দ উঠল আবার, মস্ত কারখানায় পরিচিত কোলাহল ফিরে এল, কাঠের টুকরোর গন্ধ, ঘামে ভেজা পুরনো পোশাকের গন্ধ পাওয়া গেল ফের। বড় করাত চালু হলো এবং এসপোজিটো ধীরে তার সামনে পিপের যে কাঠ ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছিল, তা কাটা হতে লাগল। যেখানে করাত বসে যাচ্ছিল কাঠে সেখানে রুটির কণার মতো ভেজা কাঠ-গুঁড়ো ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছিল। গুঞ্জিত করাতের দুদিকে রোমশ কঠিন কাঠ চেপে-ধরা হাত দুটিও ভরিয়ে দিচ্ছিল তার। কাঠ কাটা হয়ে গেলে মোটরের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

র‍্যাঁদার ওপর ঝুঁকে পড়তেই এখন ইভারস উঠে একটা ফিক বেদনা অনুভব করল। ক্লান্তিটা সাধারণভাবে আরও খানিক পরেই আসবার কথা। আসলে এই ক'সপ্তাহ নিষ্কর্মা কাটানোর ফলে অভ্যাসটাই নষ্ট হয়ে গেছে তার। কিন্তু বয়সের কথাটাও মনে এল, সূক্ষ্ম কাজ ছাড়া অন্য শারীরিক শ্রমকে যা কঠিনতর করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তোলে। ওই ফিক বেদনাটা যেন তার বয়সটাই জানান দিয়ে গেল। যেখানেই পেশির ব্যাপার, কাজটা সেখানেই ঘৃণ্য মনে হয়, মৃত্যুকেই ডাক দিয়ে আনে যেন তা। আর এ রকম বিকট শারীরিক শ্রমের পর পরেই রাতের ঘুমটাও যেন মৃত্যুরই দোসর। ছেলেটা একজন স্কুল-শিক্ষক হতে চেয়েছিল, ঠিকই করেছিল সে। শারীরিক শ্রম নিয়ে ধরতাই কথা যারা বলে তারা জানেই না যে কী নিয়ে কথা বলছে তারা।

পিঠ সোজা করে ইভারস যখন বড় করে বাতাস নিতে আর এইসব বাজে ভাবনা তাড়িয়ে দিতে উঠে দাঁড়াল, ঘণ্টি বেজে উঠল আবার। জরুরি যেন, থেমে থেমে এবং আচম্বিতে শুরু হয়ে এমন অদ্ভুতভাবে যে শ্রমিকরা কাজ থামিয়ে দিল। শুনল বালেস্টার, অবাক হলো, তারপর মনে মনে ঠিক করে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সে চলে যাবার কয়েক মুহূর্ত পরে শেষমেশ থামল সেই ঘণ্টি। তারা কাজ শুরু করল ফের। দরজাটা খুলে গেল আবার, আর বালেস্টার লকার-রুমের দিকে ছুটে গেল। ক্যানভাসের জুতো পরে বেরিয়ে এল সে, জ্যাকেটটা গায়ে গলিয়ে যেতে যেতে ইভারসকে বলল, 'বাচ্চাটার খুব অসুখ। আমি জারমেইনকে আনতে যাচ্ছি', বলতে বলতেই দরজার দিকে ছুটল সে। ড. জারমেইন কারখানার সকলের চিকিৎসক, কাছের কোয়ার্টারেই থাকেন তিনি। কোনও মন্তব্য না করে ইভারস খবরটার পুনরাবৃত্তি করল। তারা সবাই তার পাশে জড়ো হলো, পরস্পরকে তাকিয়ে দেখতে লাগল বিমূঢ়। বৈদ্যুতিক করাত কলের মোটর ছাড়া আর কোনও শব্দই শোনা গেল না। 'কিছুই না হয়তো', তাদের মধ্যে একজন বলল। নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল তারা, কারখানা আবার ভরে উঠল কাজের শব্দে, কিন্তু কাজ করছিল তারা শ্লথগতিতে, যেন প্রতীক্ষায় আছে কিছুর।

মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল বালেস্টার, জ্যাকেকটা ঝুলিয়ে রাখল, আর কোনও কথা না বলেই ছোট্ট দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানালার ওপরে আলো মরে আসছিল। একটু পরে, করাতে কাঠ কাটার শব্দ যখনই থামছিল, একটা অ্যাম্বুলেন্সের বিমর্ষ ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। প্রথমে দূরে, তারপর কাছে কোথাও, শেষমেশ একেবারে কারখানার গায়ে। তারপর নিস্তব্ধতা। মুহূর্ত পরে বালেস্টার ফিরে এলে সকলেই তার দিকে এগোল। এসপোজিটো মোটর বন্ধ করে দিয়েছে। বালেস্টার বলল, ঘরে পোশাক বদলানোর সময় মেয়েটি হঠাৎ পড়ে যায় যেন কেউ তাকে মেরে ফেলেছে। 'তুমি কি সে রকম কিছু শুনতে পেয়েছিলে!' মারকাউ বলল। বালেস্টার মাথা নাড়ল, কারখানার দিক করে সামান্য ঘুরল। মনে হলো পুরোটাই ঘুরে গেছে বুঝি সে। অ্যাম্বুলেন্সের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল আবার। সবাই ছিল তারা সেখানে, নিস্তব্ধ সেই কারখানা-ঘরে, জানালা দিয়ে হলুদ আলো চুঁইয়ে পড়ছিল, কঠিন আর নিষ্কর্মা হাতগুলো ঝুলছিল তাদের কাঠগুঁড়ো-পরিবৃত ট্রাউজারের গা ঘেঁষে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেষ-বিকেল তক এভাবেই গড়িয়ে গেল। অবসন্ন বোধ করল ইভারস, ভারী হয়ে রইল মন-মেজাজ। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু বলার মতো কোনও কথা ছিল না। ছিল না অন্য কারও। তাদের নির্বিকার মুখে কেবল দুঃখ আর এক ধরনের একগুঁয়েমি। 'বিপর্যয়' শব্দটা যেন দানা বাঁধতে লাগল তার মনে থেকে থেকেই, সামান্য ক্ষণের জন্যই, কারণ তৈরি হয়েই ফেটে যাওয়া বুদ্বুদের মতোই মুহূর্তেই অবলীন হচ্ছিল তা। বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল তার, ফার্নান্দের সঙ্গ ছেলের সঙ্গ পেতে ফের, বাড়ির চাতালে। যেমন ঘটে, বালেস্টার সেদিনের মতো কর্মসমাপ্তি ঘোষণা করল। যন্ত্রগুলো বন্ধ হলো। তাড়াহুড়ো না করে অগ্নিকুণ্ডগুলো নেভাতে শুরু করল তারা, নিজেদের বেঞ্চে সব কিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখল, তারপর একে একে সকলে লকার-রুমে গেল। সাঈদ থেকে গেল। কারখানা-ঘর পরিষ্কার করতে আর ধুলো-ভরা মেঝেয় জল মারতে হবে তাকে। ইভারস যখন লকার-রুমে পৌঁছল, বিশাল এবং রোমশ এসপোজিটো ততক্ষণে শাওয়ারের নিচে। সশব্দে সাবান মাখছিল সে তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। এমনিতে তার নগ্নতা নিয়ে পরিহাস করত তারা, মস্ত এক ভালুক যেন সে, গোঁয়ারের মতো লুকিয়ে রেখেছে তার যৌনাঙ্গ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কেউই তাকে লজ্জা করছে না এখন। শাওয়ার থেকে ফিরল এসপোজিটো, তোয়ালে দিয়ে নিম্নাঙ্গ আবৃত করে। অন্য সবাই একে একে স্নান সারল আর মারকাউ যখন ভীষণভাবে তার আদুল গায়ে চাড় মারছিল, লোহার হুইলের ওপরে মস্ত দরজাটা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হচ্ছিল তখন। ভেতরে প্রবেশ করলেন লাসালে।

প্রথম যখন প্রবেশ করেছিলেন এখানে সেই পোশাকই পরে আছেন তিনি, কিন্তু তাঁর চুলগুলো ছিল অবিন্যস্ত। চৌকাঠে থমকে দাঁড়ালেন তিনি, বিশাল জনহীন কারখানা-ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কয়েক পা এগোলেন, থামলেন আবার, লকার-রুমের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। নিম্নাঙ্গ-আবৃত এসপোজিটো তাঁর দিকে ফিরল। অনাবৃত শরীরে সসংকুচিত ইতস্তত পদক্ষেপ তার। ইভারস ভাবল মারকাউ-এর ওপরেই এখন নির্ভর করছে কিছু বলা। কিন্তু তার শরীরের চারপাশে জলের চিকের আড়ালে তাকে দেখাই গেল না। একটা শার্ট আঁকড়ে ধরে এসপোজিটো ক্ষিপ্র হাতে সেটা পরতেই লাসালে বললেন, 'শুভরাত্রি', নিষ্প্রভ গলায়, এবং ছোট দরজাটার দিকে হেঁটে যেতে লাগলেন। ইভারস-এর যখন মনে হলো তাঁকে ডাকা উচিত তাদের কারও, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে তখন।

স্নান না করেই পোশাক পরে নিল ইভারস, সকলকে শুভরাত্রি জানাল, সর্বান্তঃকরণে, আর তারাও একই উষ্ণতায় ফিরিয়ে দিল তা। দ্রুত বেরিয়ে গেল সে, সাইকেলটা নিল এবং চালাতে শুরু করতেই পিঠের সেই বেদনাটা অনুভব করল। শেষ-বিকেলে এখন সে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল যান-বহুল শহরের মধ্য দিয়ে। দ্রুতই যাচ্ছিল, কারণ পুরনো বাড়ি আর তার চাতালে ফিরে যেতে খুবই ব্যগ্র ছিল সে। সমুদ্র দেখার জন্য বসার আগে স্নান-ঘরে স্নান সেরে নেবে সে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সমুদ্র অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, তীরবর্তী দোকান-পসরার পাঁচিলের ওপাশে সকালের চেয়ে অনেকটাই আঁধার-ঘন। কিন্তু ছোট সেই মেয়েটিও যেন সঙ্গী হয়েছে তার এবং তার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সে।

বাড়িতে স্কুল থেকে ছেলে ফিরে এসেছে। ছবির কাগজ পড়ছিল সে। ফার্নান্দে ইভারসকে শুধোল সব ঠিকঠাক চলেছে কি না। কিছুই বলল না সে, গোসলখানায় পরিষ্কার হলো, তারপর চাতালের নিচু দেয়ালের গা-ঘেঁষা বেঞ্চে এসে বসল। মাথার ওপরে মেরামত করা কাচা কাপড়-চোপড় ঝুলছিল। স্বচ্ছ হয়ে আসছিল আকাশ। দেয়ালের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার শান্ত সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। সুগন্ধী পানীয় নিয়ে এল ফার্নান্দে, দুটি গ্লাস আর ঠাণ্ডা জলের একটা জগ। স্বামীর পাশেই বসল সে। ইভারস সব কিছুই খুলে বলল তাকে, হাতখানি হাতে নিয়ে তার। বিয়ের সেই প্রথম দিনগুলোর মতো। বলা শেষ হতেও নড়ল না সে, তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে, যেখানে দিগন্তের এপার থেকে ওপারে ত্রস্তে ঝরে পড়ছিল মেদুর জ্যোৎস্নালোক। 'হায়! এটা তার নিজেরই খুঁত!' বলল সে। যুবক হতো ফিরে যদি সে, ফার্নান্দে যুবতী, নিশ্চিত চলে যেত তারা, পাড়ি দিয়ে সমুদ্র ওই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতিথি

তারই দিকে উঠে-আসা মানুষ দুটিকে লক্ষ করছিল স্কুলশিক্ষকটি। একজন ঘোড়-সওয়ার, অন্যজন পদাতিক। পাহাড়ি স্কুল-ভবনটির পথে আচমকা খাড়াইটা তখনও তারা পার হতে পারেনি। ওপরে ওঠার জন্য কসরত করছিল তারা, বরফের ভেতরে শ্লথগতিতে, উঁচু নির্জন সেই মালভূমিতে, উপল-খণ্ডের মধ্য দিয়ে। ঘোড়াটা থেকে থেকেই হোঁচট খাচ্ছিল। এখনও কিছুই শ্রুতিগোচর না হলেও তার নাসারন্ধ্র থেকে নিঃসৃত প্রশ্বাস দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল তার। দুজনের মধ্যে একজন অন্তত এলাকাটা জানত। পায়ে-চলার পথটাই অনুসরণ করছিল তারা, যদিও বেশ কদিন আগে নোংরা শ্বেত-বরফে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তা। স্কুলশিক্ষকটি হিসাব করে দেখল পাহাড়-চুড়োয় পৌঁছতে তাদের আরও আধঘণ্টা লাগবে। খুব ঠাণ্ডা ছিল; একটা সোয়েটারের জন্য স্কুলের ভেতরে ফিরে গেল সে।

শূন্য, হিম ক্লাসঘর গুলো পার হয়ে গেল সে। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরে চারটে আলাদা রঙের চক দিয়ে আঁকা ফ্রান্সের চারটে নদী, গত তিন দিন ধরে মোহনার দিকেই প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল তারা। বর্ষা ছাড়াই আট মাস খরার পরে এই মধ্য-অক্টোবরে হঠাৎই বরফ পড়তে শুরু করেছিল আর মালভূমির ওপরে ছড়িয়ে-থাকা গ্রামগুলোর বাসিন্দা কম-বেশি কুড়িজন ছাত্র সে কারণেই আসছিল না আর। আবহাওয়া ভালো হলে তারা আবার আসবে। মালভূমির পুবে ক্লাসঘরের লাগোয়া তার থাকার ঘরটাতেই দারু উষ্ণ করে তুলেছিল। ক্লাসঘরের জানালার মতো, তার জানালাটাও ছিল দক্ষিণমুখী। দক্ষিণের দিকে মালভূমিটা যেখান থেকে ঢাল হয়ে নেমে গেছে, স্কুলঘরটা সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটারের পথ। পরিষ্কার আবহাওয়ায় গোলাপি পর্বতমালা পরিদৃশ্যমান হয়, পাহাড়ি ফাঁকের মধ্য দিয়ে ধরা দেয় মরু-অঞ্চল।

একটু গরম হয়ে সেই জানালাটার কাছেই ফিরে এল দারু, যেখান থেকে সেই মানুষ দুটিকে প্রথম দেখতে পেয়েছিল সে। তাদের আর দেখা যাচ্ছিল না। তাহলে খাড়াইটা নিশ্চয়ই পার হয়ে গেছে তারা। আকাশ তেমন অন্ধকার ছিল না, কারণ রাতেই তুষারপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মলিন আলোর ভেতরে ফুটে উঠেছিল সকাল। মেঘের আস্তরণ সরে যেতে সামান্যই পরিষ্কার দেখাল সেই আলো। দুপুর দুটোয় মনে হচ্ছিল এই বুঝি সকাল হলো। তবু সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে ভারী তুষারপাত আর সঙ্গে ক্লাসঘরের দরজায় করাঘাত করা সামন্য ঝোড়ো বাতাসের শব্দ তিনটে দিনের চাইতে ভালো ছিল এটা। নিজের ঘরেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দারু অনেকটা সময় কাটিয়ে দিয়েছিল তখন, ছাউনির ভেতরে মুরগিগুলোকে খাওয়ানো আর কিছু কয়লা নেবার সময়টুকু ছাড়া। ভাগ্যিস সেই তুষার-ঝঞ্ঝা শুরু হবার দুদিন আগেই উত্তরে সবচেয়ে কাছের গ্রাম তাদজিদ থেকে তার মালপত্তর নিয়ে এসেছিল ট্রাকটা। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এটা আবার ফিরে যাবে।

তাছাড়া ভাঁড়ারে রসদ তার ভালোই ছিল, ছোট্ট কুঠুরিটা ভর্তি ছিল গমের বস্তায়। যেসব ছাত্রের পরিবারবর্গ খরাপীড়িত, তাদের মধ্যেই বিতরণের জন্য প্রশাসন থেকে এই মজুত-ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছিল। এরা সকলেই প্রায় এই খরার শিকার, কেননা, এরা সকলেই গরিব। প্রতিদিনই দারু এদের রেশন বিলি করত। এই কদিনের দুর্যোগে কেউ আর রেশন নিতে আসতে পারেনি। হয়তো তাদের হাতেই দিয়ে দিতে পারবে গমের দানা। আগামী ফসলের মরসুম পর্যন্ত এভাবেই ব্যাপারটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর কি! ফ্রান্স থেকে জাহজভর্তি গম এসে পৌঁছচ্ছে এখন, দুঃসময়ের দিন শেষ। কিন্তু ভুলে যাওয়া শক্ত হবে সেই দারিদ্র্য, সূর্যালোকে ভ্রাম্যমাণ বিধ্বস্ত সেই অশরীরীগুলো, মাসের পর মাস ধরে পুড়ে ছাই হয়ে-যাওয়া মালভূমি, অগ্নি-দহনে একটু একটু করে কুঁকড়ে যাওয়া ধরিত্রী, পায়ের তলায় ধুলো হয়ে যাওয়া প্রতিটি পাথর টুকরো। হাজারে হাজারে ভেড়া মারা পড়েছে ততদিনে, কিছু মানুষও, এখানে-সেখানে, জানেই না কেউ তা।

এই দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতি-তুলনায়, সুদূর এই স্কুলবাড়িতে এক সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাত্রা তার। তবুও সামান্য যা কিছু আছে, কঠিন এই জীবনযাপন, চুনকাম করা দেয়াল, অপরিসর একটি খাট, বিবর্ণ তাক, কুয়ো, জল আর খাদ্যের সাপ্তাহিক বন্দোবস্তে নিজেকে একজন সামন্ত-প্রভুর মতোই মনে হতো তার। তারপরে হুট করেই এই তুষারপাত, একেবারে জানান না দিয়েই, বৃষ্টির কোনও আগাম বার্তা ছাড়াই। জায়গাটার হাল-হকিকত এ রকমই, নির্মম জীবনযাপন, এমনকি মানুষের সান্নিধ্য ছাড়াই– যদিও কিছুই এসে যায় না তাতে। কিন্তু দারুর জন্ম এখানেই। অন্যত্র মানেই যেন তার নির্বাসন।

স্কুলবাড়ির সামনে খোলা উঠোনে বেরিয়ে এল সে। সেই দুজন মানুষ চড়াইটার এখন প্রায় মধ্যপথে। ঘোড়-সওয়ারটিকে চিনতে পারল দারু, বালডুসি তার নাম, তার বহুদিনের পরিচিত পুরনো পুলিশ-কর্মী এক। বালডুসির হাতে ছিল একটা দড়ি, যার অন্যপ্রান্ত বাঁধা ছিল এক আরবের দেহে। পেছনে পেছনেই পাওদল আসছিল সে, দুহাত বাঁধা আর হেঁটমুণ্ড। সেই পুলিশ-কর্মী হাত তুলে নাড়াল তার দিকে, দারু সাড়া দিল না। নীল বিবর্ণ এক জোব্বা গায়ে, ভারী খসখসে মোজায়-ঢাকা পা দুটি স্যান্ডেলে, ছোটখাটো টুপিতে আবৃত-মস্তক সেই আরবের দিকে তাকিয়েই অন্যমনস্ক ছিল সে। ওরা এগিয়ে আসছিল। আরবটির যাতে আঘাত না লাগে, বালডুসি তাই ঘোড়াটিকে সামলে আসছিল। দলটা এগোচ্ছিল, কিন্তু শ্লথগতিতেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাছাকাছি পৌঁছে বালডুসি চেঁচাল, 'এল আমুর থেকে আসতেই এক ঘণ্টা কাবার!' দারু উত্তর করল না। পুরু সোয়েটারে বেঁটেখাটো চৌকোনা চেহারায় সে তাদের উঠে আসতে দেখল। সেই আরবটি একবারের জন্যও তার মাথাখানি তোলেনি। 'হ্যালো', তারা খোলা উঠোনে উঠে আসতেই দারু বলল, 'ভেতরে চলে এসো, একটু গরম হয়ে নাও।' দড়িটা হাতছাড়া না করেই ঘোড়া থেকে কসরত করে নেমে পড়ল বালডুসি। খোঁচাখোঁচা গোঁফের ফাঁকে স্কুলমাস্টারটির দিকে তাকিয়ে হাসল সে। তামাটে কপালের নিচে গভীরে প্রোথিত দুটি কালো ছোট চোখ, সারামুখে বলিরেখা, মানুষটিকে তৎপর আর জ্ঞানীর মতোই দেখতে লাগছিল। দারু বল্গাটি হাতে নিল, আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেল ঘোড়াটিকে, ফিরে এল আবার সেই দুজনের কাছে। স্কুলের ভেতরেই অপেক্ষায় ছিল তারা। নিজের ঘরে নিয়ে এল দারু তাদের। 'ক্লাসঘরটা গরম করে আসি', বলল সে। 'ওই ঘরেই ভালো করে বসা যাবে।' ফিরে আবার ঘরে ঢুকল যখন, বালডুসি তখন চেয়ারে বসা। আরবের দেহ থেকে দড়িটা ততক্ষণে খুলে নিয়েছে সে। স্টোভের গা ঘেঁষে বসে আছে আরবটি। হাত দুটি তার বাঁধাই ছিল, মাথার টুপিটা পেছন দিকে সরানো, তাকিয়ে ছিল সে জানালার দিকে। প্রথম দৃষ্টিতেই বিশাল দুটি ঠোঁট নজরে পড়ল তার, পুরু, মসৃণ, একেবারে নিগ্রো-সুলভ। তবু তার নাক ছিল খাড়া, চোখ দুটিও কালো আর জ্বরাক্রান্ত। টুপিটা সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একরোখা কপাল, ঠাণ্ডায় কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে-আসা রুক্ষ চামড়ার নিচে পুরো মুখটাতেই যেন অস্থিরতা আর বিদ্রোহ তার। মুখটা ঘুরিয়ে সরাসরি সে তাকাতেই বিস্মিত হলো দারু। 'অন্য ঘরটিতে চলে যাও', দারু বলল, 'আমি তোমাদের জন্য মিন্টের চা করে নিয়ে আসি।' 'ধন্যবাদ', বালডুসি বলল, 'কাণ্ড দেখ! আমি কি না অবসরের জন্য মুখিয়ে আছি।' আরবি ভাষাতেই বন্দিকে বলল সে, 'এই যে, চলে এসো।' আরবটি উঠে দাঁড়াল এবং বাঁধা হাত দুটি সামনে রেখে ধীরপায়ে ক্লাসঘরের ভেতরে চলে গেল।

চায়ের সঙ্গে একটা চেয়ারও এনেছিল দারু। কিন্তু বালডুসি সবচেয়ে কাছের ডেস্কটিতে ইতিমধ্যেই বসে পড়েছিল, আরবটি বসে পড়েছিল সেই ডেস্ক আর জানালার মধ্যবর্তী স্টোভটির দিকে মুখ করে শিক্ষকের পাটাতন ঘেঁষে। বন্দির দিকে চায়ের গ্লাস বাড়িয়ে ধরতেই তার শৃঙ্খলিত হাতের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল দারু। 'ওর হাত দুটো সম্ভবত খুলে দেওয়া যেতে পারে।' 'অবশ্যই', বালডুসি বলল। 'যাত্রাপথের জন্যই করা হয়েছিল ওটা।' পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু মেঝের ওপরে গ্লাসটা রেখে দারু তখন আরবটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। একটি কথাও না বলে আরবটি তার জ্বর-তপ্ত চোখ দুটি দিয়ে নিরীক্ষণ করল তাকে। হাত দুটি মুক্ত হতেই দুটি খোলা হাতই খানিকটা ঘষে নিয়ে চায়ের গ্লাসটা তুলে নিল সে। ছোট্ট ব্যগ্র চুমুকে তপ্ত তরল নিঃশেষিত হয়ে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বেশ', দারু বলল। 'কোথায় যাবার কথা তোমাদের?' চা থেকে গোঁফজোড়া তুলল বালডুসি, 'এখানেই, বাছা।'

'উটকো লোক! এখানেই রাত কাটাবে নাকি?'

'না, আমি এল আমুরে ফিরে যাচ্ছি। আর এই লোকটাকে তুমি দিয়ে আসবে টিংগুটে। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ওরই অপেক্ষা করা হচ্ছে।'

বন্ধুর মতো হাসি ফুটিয়ে বালডুসি দারুর দিকে তাকিয়ে ছিল। 'ব্যাপারটা কী?' স্কুলমাস্টারটি শুধাল, 'তুমি কি মশকরা করছ আমার সঙ্গে?' 'না, বাপু। সেই রকমই হুকুম।'

'হুকুম? আমি তো ' বৃদ্ধ কর্সিকানটিকে আহত করবে না বলেই ইতস্তত করল দারু। 'আমি বলতে চাইছি ওটা তো আমার কাজ নয়।'

'কী! এর মানে কী? যুদ্ধের সময় মানুষকে সব রকম কাজই করতে হয়।'

'তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

মাথা নাড়ল বালডুসি।

'ঠিক আছে। হুকুমটা কিন্তু আছে, আর তা তোমার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বোঝা যাচ্ছে, একটা কিছু ঘটতে চলেছে। একটা আসন্ন বিদ্রোহের কথা শোনা যাচ্ছে। আমরা তৈরিই আছি, বলতে গেলে।'

দারুর চোখে তবুও একগুঁয়ে দৃষ্টি।

'শোনো, বাপু', বালডুসি বলল। 'তোমাকে আমি পছন্দ করি আর তোমাকে এটা বুঝতেই হবে। এল আমুরে একটা ছোট্ট বিভাগরে তামাম এলাকাটাই নজরদারির জন্য আমরা মাত্র জনা বারো লোক আছি। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতেই হবে। এই লোকটাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে অবিলম্বে ফিরে আসতে বলা হয়েছে আমাকে। একে সেখানে রাখা যাবে না। ওর গ্রামে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ওরা একে ফিরিয়ে নিতে চায়। দিন ফুরনোর আগে কাল অবশ্যই একে টিংগুটে নিয়ে যাবে তুমি। তোমার মতো একজন শক্তপোক্ত মানুষের পক্ষে কুড়ি কিলোমিটার পথ কিছুই না। তারপর, ব্যাপারটা সেখানেই শেষ। তুমি তোমার ছাত্রদের কাছে ফিরে আসবে আবার। তোমার স্বচ্ছন্দ জীবনে।'

দেয়ালের পেছনে ঘোড়াটার ঘোঁত ঘোঁত আর মাটিতে পা ঘষার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। জানালা দিয়ে দারু তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। নিশ্চিতভাবেই দুর্যোগ কেটে যাচ্ছিল আর বরফাচ্ছন্ন মালভূমির ওপরে আলোর তীব্রতা বাড়ছিল। সব বরফ যখন গলে যাবে, সূর্য খরতর হয়ে উঠবে আবার, ফিরে-ফিরতি পুড়িয়ে দেবে পাথরের বিস্তীর্ণ ভূমিতল তখন। তবুও, বেশ কিছুদিন ধরে, নির্জন এই বিস্তারে, যেখানে সব কিছুই মানুষের সঙ্গে সংস্রববিহীন, এককাট্টা আকাশ থেকে ঝরে যাবে বিশুদ্ধ আলোক শুধু।

'যাই হোক', [illegible] দারু বলল, 'কী করেছিল লোকটা?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পুলিশ-কর্মীটি মুখ খোলার আগেই আবার তার প্রশ্ন, 'লোকটা কী ফরাসিতে কথা বলে?'

'না। একটি শব্দও না। আমরা প্রায় এক মাস ধরে একে খুঁজছিলাম, কিন্তু ওরা ওকে লুকিয়ে রেখেছিল। লোকটা তার খুড়তুতো ভাইকে হত্যা করেছে।'

' লোকটা কী আমাদের বিরুদ্ধে?'

'আমার মনে হয় না। কিন্তু নিশ্চিন্তি কোথায়?'

'হত্যা করার কারণ?'

'মনে হয়, পারিবারিক বিবাদ। একজনের কাছে আর একজনের কিছু খাদ্যশস্য পাওনা ছিল, এই আর কি। কিছুই পরিষ্কার নয়। মোদ্দাকথা, একটা ধারালো কাস্তে দিয়ে লোকটা তার খুড়তুতো ভাইকে খুন করে। বুঝলে কিনা, একেবারে একটা ভেড়ার মতোই।'

গলার ওপরে একটা ব্লেড চালিয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করল বালডুসি। সেদিকে নজর পড়তেই আরবটি উদ্বেগের চোখে তাকাল। হঠাৎই লোকটির প্রতি ক্রোধ অনুভব করল দারু, সব মানুষের প্রতিই, যারা অসূয়াপরায়ণ, ঘৃণায় নিরলস আর রক্তপিপাসু।

স্টোভের ওপর কেটলিটা যেন গান গাইছিল। বালডুসিকে সে আরও চা দিল, ইতস্তত করে, আরবটিকেও। এই দ্বিতীয় বারেও ব্যগ্র চুমুকে শেষ করল সে তা। হাত ওপরে তুলতেই তার মোজা খুলে পড়ে গেল নিচে আর স্কুলমাস্টারটি তার পাতলা পেশল বক্ষপট দেখতে পেল।

বালডুসি বলল, 'ধন্যবাদ, বাছা। এইবার আমি উঠে পড়ছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে আরবটির কাছে গেল সে, পকেট থেকে ছোট একটা দড়ি হাতে করে।

শুকনো গলায় শুধলো দারু, 'কী করছ ওটা?'

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বালডুসি দড়িটা দেখাল তাকে।

'চিন্তার কিছু নেই।'

বৃদ্ধ পুলিশটি দোলাচল। 'এটা তোমার ব্যাপার। তুমি কি সশস্ত্র?'

'শটগান আছে আমার।'

'কোথায়?'

'ট্রাঙ্কের ভেতরে।'

'বিছানার কাছেই সেটা রাখা উচিত ছিল তোমার।'

'কেন? আমার কোনও ভয় নেই।'

'পাগল! বিদ্রোহ হলে কেউই নিরাপদ নয়, সবাই আমরা এক নৌকোয়।'

'নিজেকে সামলাব আমি। ওরা আসছে, সেটা দেখার সময় পাব আমি।'

হাসতে শুরু করল বালডুসি, তারপর হঠাৎই সাদা দাঁতগুলো ঢাকা পড়ে গেল গোঁফে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সময় পাবে তুমি? ঠিক আছে। আমি ঠিক তাই বলছি। সবসময়ই তোমার নাটবল্টুগুলো একটু ঢিলে। সেজন্যই তোমাকে পছন্দ করি আমি। আমার ছেলেটাও এ রকম ছিল।'

বলতে বলতেই নিজের রিভলবারটি বের করে ডেস্কের ওপরে রাখল সে।

'এটা রেখে দাও। এখান থেকে এল আমুর যেতে দুটো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই আমার।'

টেবিলের কালো রঙের পটভূমিকায় রিভলবারটা ঝিকিয়ে উঠল। পুলিশটি তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালে স্কুলমাস্টার চামড়া আর ঘোড়া-মাংসের গন্ধ পেল।

'শোনো, বালডুসি', হঠাৎই বলল দারু, 'এ রকম সব কিছুতেই আমার বিরক্তি, এখানে যারা থাকে তাদের সকলেরই। কিন্তু একে আমি তুলে দেব না। যদি লড়তে হয়, হ্যাঁ, তাই করব। কিন্তু তুলে দেব না।'

বৃদ্ধ পুলিশটি তার সামনে এসে দাঁড়াল এবং তার দিকে খর চোখে তাকাল।

'তুমি একটি বুদ্ধু', ধীরে ধীরে বলল সে। 'এটা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। বছরের পর বছর করলেও একটা মানুষকে দড়ি দিয়ে বাঁধার ব্যাপারটা রপ্ত হয় না তোমার, এমনকি লজ্জিত বোধ করো তুমি– হ্যাঁ, লজ্জিত। কিন্তু ওরা যা চায় তা তুমি হতে দিতে পারো না।'

'আমি ওকে তুলে দেব না,' ফের বলল দারু।

'এটা একটা নির্দেশ, ওহে বাপু, আবারও বলছি আমি।'

'ঠিক আছে। তোমাকে যা বলেছি ওদের কাছে তাই বলবে তুমি : আমি ওকে তুলে দেব না।'

চিন্তিত দেখাল বালডুসিকে। আরব আর দারুর দিকে তাকাল সে। তারপর সিদ্ধান্ত নিল।

'না, আমি কিছুই বলব না তাদের। তুমি যদি আমাদের পরিত্যাগ করতে চাও, আমি তোমাকে দোষ দেব না। এই বন্দিটিকে তুলে দেবার নির্দেশ আছে আমার ওপরে, আর সেটাই করছি আমি। এখন এই কাগজটা আমাকে শুধু সই করে দেবে তুমি।'

'দরকার নেই। একে যে আমার কাছে রেখে গেছ তুমি আমি তা অস্বীকার করব না।'

'এ রকম কোরো না। আমি জানি তুমি সত্যি কথাই বলবে। তুমি স্থানীয় লোক এবং একজন মানুষ। কিন্তু সই তো তোমাকে করতেই হবে, সেইটেই নিয়ম।'

দারু দেরাজ খুলে বেগুনি রঙের কালির ছোট্ট চৌকো একটা বোতল বের করল, সেইসঙ্গে তার লাল কাঠের কলমদানি ও লেখার জন্য নিজস্ব 'সার্জেন্টমেজর' কলমটি। সই করল দারু। পুলিশ কর্মীটি কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করে টাকার ব্যাগে রাখল। দরজার দিকে অতঃপর এগিয়ে গেল সে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই', দারু বলল।

'না।' বালডুসি বলল, 'বিনয় দেখিয়ে কাজ নেই আর। আমাকে অপমান করেছ তুমি।'

আরবটির দিকে তাকাল সে। এক জায়গাতেই স্থির হয়ে বসে ছিল লোকটি। নাক দিয়ে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। 'এগোলাম বাপু', বলল সে। দরজাটা পেছন দিকে বন্ধ হলো। জানালার ধারে হঠাৎই দেখা গেল তাকে, তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল। বরফে তার পদশব্দ চাপা পড়ে গেল। দেয়ালের ওপারে ঘোড়াটা চঞ্চল হলো, অনেকগুলো মুরগি ডানা ঝাপটে উঠল ভয়ে। ঘোড়াটার লাগাম ধরে পরক্ষণেই জানালার ধারে আবার দেখা গেল বালডুসিকে। ঘাড় না ফিরিয়েই সামান্য চড়াইয়ের দিকে হেঁটে গেল সে, ঘোড়াসমেত মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। মস্ত একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা গেল। বন্দির দিকে ফিরে গেল দারু। নিশ্চল অবস্থায় বন্দি তার দিক থেকে কখনোই চোখ ফিরিয়ে নেয়নি। 'অপেক্ষা করো', আরবিতেই বলল স্কুলমাস্টার এবং তার শোবার ঘরের দিকে গেল। দরজা পেরোতে গিয়ে কী ভেবে দেরাজের ভেতর থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখল। আর পেছনে তাকাল না সে, নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ শয্যায় শুয়ে ধীরে এগিয়ে-আসা আকাশ দেখল সে, কান পেতে নৈঃশব্দ্যকে শুনল। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এইখানে প্রথম কিছুদিন এই নৈঃশব্দ্যই আতুর করে তুলেছিল তাকে। মরুভূমি থেকে উঁচু মালভূমি অঞ্চলকে পৃথক করেছে যে পাহাড়গুলো, সেইখানে ছোট্ট একটা শহরেই নিয়োগের জন্য আর্জি জানিয়েছিল সে। সেইখানে, পাথুরে দেয়ালগুলো, উত্তরে সবুজ এবং কৃষ্ণবর্ণ, দক্ষিণে গোলাপি এবং নীলচে-ধূসর, চির-গ্রীষ্মের সীমা-নির্ধারক হয়ে ছিল। মালভূমি অঞ্চলেই আরও উত্তরে একটি পদের জন্য ঠিক হয়েছিল তার নাম। এই ধূসর অঞ্চলে, যেখানে পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই, প্রথমদিকে নির্জনতা আর নৈঃশব্দ্য তার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। কোথাও কোথাও কাঁদর দেখে কৃষির কথা মনে এলেও আসলে বাড়ি তৈরির উপযুক্ত এক বিশেষ ধরনের পাথরের জন্যই সেগুলো খনিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে একটি উদ্দেশ্যেই লাঙলের ব্যবহার, তা হলো প্রস্তর সংগ্রহ। অন্যত্র গর্তগুলোয় মৃত্তিকার যে পাতলা আস্তরণ, তুচ্ছ গ্রাম্য উদ্যানের সমৃদ্ধির জন্যই সেগুলো সংগৃহীত হতো। জায়গাটাই এ রকম তিন-চতুর্থাংশই ন্যাড়া পাথরে আবৃত। শহর গজিয়ে উঠেছিল, জমে উঠেছিল আবার হারিয়েও গেছে। মানুষ এসেছিল, ভালোবেসেছিল অথবা বিশ্রী লড়াই করেছিল, শেষমেশ মারাও গিয়েছিল। এই মরুভূমিতে সে কিংবা তার এই অতিথি, কারোরই গুরুত্ব নেই। তবুও, এই মরুভূমির বাইরে, দারু জানত, তাদের কেউই বাঁচতে পারত না।

যখন সে উঠল, ক্লাসঘরের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আরবটি নির্ঘাত পালিয়েছে, আর, একলা কোনও সিদ্ধান্তই তাকে নিতে হবে না ভেবে নির্ভেজাল আনন্দে বিহ্বল হলো সে। কিন্তু বন্দি সেখানেই ছিল। স্টোভ আর ডেস্কের মাঝখানে ছড়িয়ে শুয়ে ছিল সে। খোলা চোখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই অবস্থায় তার পুরু ঠোঁট দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল, কেননা, একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছিল সেখানে। দারু বলল, 'এসো।' আরবটি উঠে দাঁড়াল এবং তাকে অনুসরণ করল। শোবার ঘরে জানালার নিচে টেবিলের কাছেই একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল দারু। তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে না নিয়েই আরবটি সেই চেয়ারে বসল।

'খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ', বন্দিটি বলল।

দুজনের জন্য টেবিল সাজালো দারু। ময়দা আর তেল মিশিয়ে একটা পাত্রে কেকের মতো বানাল, গ্যাস-স্টোভটাকে জ্বালিয়ে দিল। কেকটা যখন তৈরি হচ্ছে, বাইরে গুদাম-ঘরে চিজ, ডিম, খেজুর আর জমানো দুধ আনতে গেল সে। কেকটা হয়ে গেলে জানালার ধারে ঠাণ্ডা করার জন্য রাখল সে, জল মিশিয়ে জমানো খানিকটা দুধ গরম করল, আর কয়েকটা ডিম ভেঙে ওমলেট। এইসব করতে করতেই ডান পকেটে রাখা রিভলবারটার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হলো তার। পাত্রটি নামিয়ে রেখে ক্লাসঘরে গেল সে, ডেস্কের ভেতরে রিভলবারটা রেখে দিল। ঘরের ভেতরে আবার যখন ফিরে এল, নিশিপতন ঘটছে তখন। আলোটা জ্বালাল সে, আরবটিকে খেতে দিল। ' খেয়ে নাও', বলল সে। আরবটি কেকের একটি টুকরো নিল, ব্যগ্রহাতে মুখের সামনে তুলে ধরেই থেমে গেল।

'আর তোমার?' সে শুধাল।

'তোমার হয়ে যাক। হয়ে গেলে খাব।'

পুরু ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হলো। একটু ইতস্তত করে কেকে দাঁত বসাল আরবটি।

খাওয়া হয়ে গেলে আরবটি স্কুলমাস্টারের দিকে তাকাল।

'তুমিই কি বিচারক?'

'না, কাল পর্যন্ত তোমাকে রাখার দায় শুধু আমার।'

'আমার সঙ্গে খেলে কেন?'

'আমার খিদে পেয়েছে।'

আরবটি চুপ হয়ে গেল। দারু উঠে বাইরে গেল। গুদামঘর থেকে সে ভাঁজ-করা একটা বিছানা নিয়ে এল, টেবিল আর স্টোভের মাঝখানে রাখল সেটা, তার নিজের বিছানার সঙ্গে সমকোণে। এক কোণে বড় একটা সুটকেস দাঁড় করানো ছিল কাগজ-পত্র রাখার সেলফ্-এর মতো। সেখান থেকে দুটো কম্বল বের করে ক্যাম্প-খাটটায় রাখল সে। থামল, আর কিছু করার নেই মনে হলো এবং তারপরেই বিছানায় এসে বসল। কিছুই করার নেই আর, কিছুই তৈরি করার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নেই। এই লোকটির দিকে নজর রাখতেই হচ্ছিল তাকে। সে কারণে লোকটির দিকে তাকাল সে, তার রাগী ফেটে-পড়া মুখটাকে কল্পনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু পারল না। অন্ধকার অথচ চকচকে চোখ আর পাশবিক মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে।

'কেন তাকে খুন করলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে। তার গলার কর্কশ স্বর লোকটাকে বিস্মিত করল।

অন্যদিকে তাকাল আরবটি।

'দৌড়ে পালাচ্ছিল সে। আমিও তাকে তাড়া করেছিলাম।'

দারুর দিকে চোখ তুলে ফিরে তাকাল সে। একটা বিমর্ষ চাপান-উতোরে জড়িয়ে গেছে যেন দুজনে।

'এখন কী করবে আমাকে নিয়ে এরা?'

'ভয় করছে?'

চোখ ঘুরিয়ে নিল সে, আড়ষ্ট হলো।

'তোমার কি দুঃখ হচ্ছে?'

মুখ হাঁ করে আরবটি তার দিকে তাকাল। বোঝাই যাচ্ছিল, সে কিছু বুঝতে পারেনি। বিরক্তি বাড়ছিল দারুর। সেইসঙ্গে দুটি বিছানার প্রান্তবর্তী বিশাল তার শরীরটার জন্য অস্বস্তি আর আত্মসচেতনতা অনুভব করছিল সে।

'শুয়ে পড় ওখানে', অধৈর্য গলায় বলল সে। 'ওটাই তোমার বিছানা।'

আরবটি নড়ল না। দারুকে প্রশ্ন করল, 'বলবে কি আমাকে?'

স্কুলমাস্টার তার দিকে তাকাল।

'পুলিশের লোকটা কি কাল আবার ফিরে আসছে?'

'জানি না।'

'আমাদের সঙ্গে কি তুমি আসবে?'

'জানি না। কেন?'

উঠে দাঁড়াল বন্দি, কম্বল দুটির ওপরে লম্বা হলো, তার পা জানালার দিকে। বিদ্যুতের বাল্ব থেকে আলো সরাসরি তার চোখের ওপর পড়ল। তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

'কেন?' বিছানার প্রান্তে দাঁড়িয়ে দারু আবার জিজ্ঞেস করল।

চোখ-ঝলসানো আলোতেই চোখ খুলে তার দিকে নিষ্পলক তাকাল আরবটি।

'আমাদের সঙ্গেই এসো', বলল এবারে।

মাঝরাত, দারুর তবু ঘুম নেই। জামাকাপড় সব খুলে রেখেই সে শুতে গিয়েছিল। নগ্ন ঘুমোনোই তার অভ্যাস। কিন্তু যেই তার মনে হলো কিচ্ছু নেই তার হাতে, দ্বিধান্বিত হলো সে। নিজেকে বিপন্ন বলে মনে হলো তার, পোশাক পরে নেবার ইচ্ছে হলো। তারপরেই কাঁধ ঝাঁকাল সে: তা আর শিশু নয়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আর প্রয়োজন হলে প্রতিপক্ষকে সে দু টুকরো করে ফেলতে পারে। বিছানা থেকেই তাকে নজরে রাখতে পারে সে। তীক্ষ্ম আলোয় মুদ্রিত চক্ষে চিৎ হয়ে নিশ্চল শুয়ে আছে লোকটি। দারু আলো নিভিয়ে দিতে অন্ধকার যেন আচমকাই জমাট বেঁধে গেল। একটু একটু করে জানালায় ফিরে এল জীবন্ত রাত, মৃদু গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছিল নক্ষত্রবিহীন অন্তরীক্ষ। পায়ের কাছে আরবের দেহটা টের পেল সে মুহূর্তেই। আরবটি তখনো স্থবির, কিন্তু তার চোখ দুটি খোলাই মনে হলো। স্কুলবাড়ির চারপাশে একটা অস্ফুট বাতাস শিকারির মতো ঘোরাঘুরি করছিল। মেঘ কেটে হয়তো সূর্য উঠবে, তাই।

রাতে তীব্রতর হলো বাতাস। মুরগিগুলো সামান্য ডানা ঝাপটাল, চুপচাপ হয়ে গেল তারপর। দারুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে কাত হয়ে শুল আরবটি। দারুর মনে হলো গোঙাচ্ছে বুঝি সে। আগন্তুকের নিঃশ্বাস কান পেতে শুনল সে। সেই নিঃশ্বাস ক্রমেই ভারী আর সমান তালের হলো। খুব কাছ থেকেই সেই নিঃশ্বাসের শব্দ শুনল সে আর মুচকি হাসল। ঘুম এল না তার চোখে। এই ঘরে গোটা বছর ধরে একাই ঘুমোয় সে। এখন আর একজনের উপস্থিতি চিন্তিত করল তাকে। একটা চাপানো ভ্রাতৃত্ববোধ, খুব ভালোই যা জানা আছে তার, বিব্রত করল তাকে। এই মুহূর্তে এটাকে সে মেনে নিতে পারল না। একই ঘরে থাকে যারা, সৈনিক বা বন্দি, অস্ত্র-শস্ত্রসমেত পোশাক-পরিচ্ছদ ঝেড়ে ফেলে একটা অদ্ভুত সখ্য জন্মায় তাদের ভেতরে, স্বপ্ন আর শ্রান্তির প্রাগৈতিহাসিক মানরসমাজে নিজেদের যাবতীয় পার্থক্য ভুলে গিয়ে প্রতি সন্ধ্যেয় বন্ধুত্ব নিবিড়তর হবার মতো। কিন্তু দারু নিজেই চমকাল যেন। ভাবনাটা একেবারেই ভালো লাগল না তার। ঘুমটাই তখন সবচেয়ে জরুরি।

একটু বাদে, আরবটি যখন সামান্য নড়াচড়া করল, স্কুলমাস্টারটি তখনও বিনিদ্র। বন্দি যখন দ্বিতীয়বার নড়েচড়ে উঠল, সতর্কতায় শক্ত হলো সে। আরবটি হাতের ওপরে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুমন্ত মানুষের হেঁটে যাবার মতোই তুলে ধরছিল নিজেকে। দারুর দিকে না ফিরেই বিছানায় সোজা হয়ে বসে স্থিরদেহে অপেক্ষা করছিল সে। কিছু একটা শুনছিল যেন মন দিয়ে। দারু নড়ল না; মুহূর্তে মনে পড়ল তার রিভলবারটা ডেস্কের ড্রয়ারেই থেকে গেছে। এক্ষুনি কিছু করা দরকার। তবুও বন্দিকে নজরবন্দি করল সে। বন্দি আগের মতোই চুপিসারে মেঝেয় তার পা রাখল, অপেক্ষা করল এবং ধীরে উঠে দাঁড়াতে লাগল। দারু প্রায় তাকে ডাকতে যাচ্ছিল। আরবটি নিতান্ত স্বাভাবিক কিন্তু অসাধারণ নৈঃশব্দ্যে হাঁটতে শুরু করেছে। ঘরের শেষে যে দরজাটা গুদামঘরের দিকে খোলে সেদিকেই এগোচ্ছিল সে। সাবধানে খিলটা খুলে বন্ধ না করেই দরজাটা পেছন দিকে ঠেলে বেরোল সে। দারু নড়েনি। 'পালাচ্ছে লোকটা', এ রকমই মনে হলো তার। আপদ গেছে।' তবুও কান পেতে শুনতে লাগল সে। মুরগিগুলো ডানা ঝাপটাচ্ছে না। আগন্তুক নিশ্চয়ই মালভূমিতে এখন। জলের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল সে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফিরে এসে দরজার ফ্রেমে আরবটি দাঁড়ানো পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি সে। সাবধানে দরজা বন্ধ করে কোনও শব্দ না করে বিছানায় ফিরে এল আরবটি। এবার দারু তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের গভীরেই মনে হলো তার স্কুলবাড়ির চারপাশে কোনও পলাতকের নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনতে পাচ্ছে যেন। 'স্বপ্ন দেখছি আমি! স্বপ্ন দেখছি!' স্বগতোক্তি করল সে। আর, ঘুমোতেই লাগল।

ঘুম ভাঙতেই দেখল আকাশ পরিষ্কার। খোলা জানালা দিয়ে হিম আর শুদ্ধ হাওয়ার স্পর্শ। আরবটি ঘুমোচ্ছিল, কম্বলের নিচে গুটিসুটি মেরে। মুখ তার হাঁ, ঝুলে আছে একেবারে। কিন্তু দারু যেই তাকে ঝাঁকুনি দিল ভয়ার্তের মতো বন্য চোখে এমনভাবে দারুর দিকে তাকাল সে যেন তাকে কক্ষনো দেখেনি আগে। ত্রস্ত সেই অভিব্যক্তির মুখে পিছিয়ে এল স্কুলমাস্টার। 'ভয় পেয়ো না। আমি। তোমাকে খেতে হবে কিছু।' আরবটি মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।' প্রশান্তি ফিরে এসেছে তার মুখমণ্ডলে, কিন্তু চাউনি শূন্য আর নিরাসক্ত।

কফি তৈরি ছিল। ভাঁজ-খোলা খাটে একসঙ্গে বসে কেক চিবুতে চিবুতে কফি খেল তারা। তারপর দারু তাকে গুদামঘরের দিকে নিয়ে গিয়ে স্নানের কল দেখিয়ে দিল। ঘরে ফিরে গেল সে, কম্বল আর বিছানাটা ভাঁজ করে রাখল, নিজের বিছানা ঠিকঠাক করে ঘরটাকে গুছিয়ে ফেলল। তারপর ক্লাসঘরের ভেতরে দিয়ে বাইরের চবুতরায় এসে পৌঁছল। নীল আকাশে সূর্য দেখা দিতে শুরু করেছে ততক্ষণে; নরম উজ্জ্বল আলোয় স্নাত হচ্ছিল মরু-মালভূমি। পাহাড়ের ঢালে এখানে-সেখানে বরফ গলতে শুরু করেছে। পাথরগুলো উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল। মালভূমির প্রান্তে সামান্য ঝুঁকে মরু-বিস্তার দেখছিল স্কুলমাস্টারটি। বালডুসির কথা মনে হলো তার। তাকে সে আঘাত দিয়েছে, কেননা এমনভাবে তাকে বিদায় জানিয়েছে যেন কোনোভাবেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়নি সে। পুলিশকর্মীটির বিদায়-সম্ভাষণ তখনও যেন শুনতে পাচ্ছিল সে। কেন, তা না জেনেও অদ্ভুত এক শূন্যতা আর বিপন্নতা বোধ করছিল। সেই মুহূর্তে স্কুলবাড়ির ওপাশ থেকে বন্দিটি কাশল। নিজেকে বিস্মৃত হয়েই দারু যেন শুনল সেই শব্দ, আর পরক্ষণেই, ক্ষিপ্ত সে ছুড়ে দিল একটা পাথর, বরফে ডুবে যাবার আগে বাতাসে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে ছুটে গেল সেটা। লোকটার নির্বোধ দুষ্কর্ম উত্তেজিত করল তাকে, কিন্তু কারও হাতে তাকে তুলে দেওয়াটাও অসম্মানজনক। এ ভাবনাটাই বিনীত এবং সপ্রতিভ করল তাকে এবং এই সঙ্গে, তার নিজের যে লোকজন এই আরবটিকে পাঠিয়েছে, তাদের সকলকে এবং খুন করেও পালিয়ে যেতে অক্ষম এই লোকটিকে শাপান্ত করল। উঠে পড়ল দারু, চবুতরায় পাক খেল, স্থির হয়ে দাঁড়াল এবং তারপর স্কুলবাড়িতে ফিরে গেল।

গুদামঘরের পাকা মেঝের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু আঙুলে দাঁত পরিষ্কার করছিল আরবটি। দারু তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো।' বন্দির আগে আগেই ঘরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফিরে গেল সে। সোয়েটারের ওপরে একটা শিকারে যাবার জ্যাকেট চাপাল সে, পায়ে জুতো পরল। যতক্ষণ না আরবটি তার পাগড়ি আর স্যান্ডেল পরল, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। ক্লাসঘরে গেল তারা। স্কুলমাস্টার বেরোনোর রাস্তাটি দেখিয়ে বলল, 'এগিয়ে যাও।' লোকটা নড়ল না। 'আসছি আমি', বলল দারু। আরবটি বেরিয়ে গেল। ঘরের ভেতরে ফিরে গেল দারু, খাস্তা রুটির টুকরো, খেজুর আর চিনির একটা প্যাকেট তৈরি করল। বেরিয়ে যাবার আগে ক্লাসঘরে ডেস্কের সামনে মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত দেখাল তাকে, তারপরেই চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়ে দরজায় তালা দিল। 'এই রাস্তায়', বলল সে। পুবদিকে চলতে শুরু করল সে, বন্দি পেছনে পেছনে। কিন্তু স্কুলবাড়ির অদূরেই পেছন দিকে সামান্য একটা শব্দের মতো শুনল যেন সে। ফিরে গিয়ে বাড়ির চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল একবার– কেউ নেই এখানে। বেকুবের মতো তাকে দেখল আরবটি। দারু বলল, 'চলো, চলো।'

ঘণ্টাখানেকের মতো হাঁটল তারা, চুনো-পাথরের খাড়াই একটা চুড়োর পাশে একটু বিশ্রাম নিল। খুবই তাড়াতাড়ি গলছিল বরফ আর তারই বাষ্প নিঃশেষে পান করছিল সূর্য, দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল মালভূমি, ক্রমেই শুষ্ক হতে হতে বাতাসের মতোই কাঁপছিল যেন তা শেষমেশ। ফের যখন চলতে শুরু করল তারা, পায়ের তলায় বেজে উঠছিল শক্ত জমিন। থেকে থেকে উড়ন্ত উল্লসিত চিৎকারে একটা পাখি তাদের সামনেই ফালা ফালা করে দিচ্ছিল আকাশটাকে। ভোরের টাটকা আলো বুক-ভরা নিঃশ্বাসে যেন টেনে নিল দারু। পরিচিত বিশাল এই ভূ-খণ্ডে কীরকম একটা তুরীয় আনন্দের আস্বাদ পেল সে। এই ভূমি-বিস্তার নীল আকাশ-গম্বুজের তলায় পুরোপুরি হলুদ এখন। আরও একটি ঘণ্টা হাঁটল তারা, দক্ষিণের দিকে নামতে নামতে। ভঙ্গুর পাথরের একটা স্তূপের ওপরে পৌঁছল তারা। সেখান থেকেই উতরাই শুরু মালভূমির, পুব বরাবর, নিচু একটা সমতলের দিকে, যেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু দীর্ঘ ক্ষয়াটে গাছ, আর দক্ষিণ বরাবর জেগে-ওঠা পাথরের স্তর, পুরো নিসর্গচিত্রটিকে যা একটা বিশৃঙ্খল অবয়ব দিয়েছে।

দুটি দিকই ভালো করে দেখে নিল দারু। দিগন্তে আকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা মানুষও চোখে পড়ে না। আরবটির দিকে ফিরে তাকাল সে, শূন্যদৃষ্টিতে তাকেই দেখছিল আরবটি। হাতের প্যাকেটটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরল দারু, বলল, 'ধরো এটা। এর মধ্যে খেজুর, রুটি, আর চিনি আছে। দুদিন চলে যাবে তোমার। আর, এই নাও এক হাজার ফ্রাঁ।' আরব প্যাকেটটি নিল, টাকাটাও এবং এই যে তাকে দেওয়া হলো তা নিয়ে কী করবে সে বুঝে উঠতে না পেরেই যেন বুকের কাছে হাত দুটি জড়ো করে রাখল তার। পুবদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্কুলমাস্টার বলল, 'দেখ, টিংগুইটে যাবার রাস্তা হলো ওই। ঘণ্টা দুয়েকের হাঁটা পথ। ওখানেই প্রশাসন আর পুলিশের দেখা পাবে তুমি। তারা তোমার অপেক্ষাতেই আছেন।' পূর্ব দিগন্তে চোখ মেলে তাকাল আরবটি, বুকের কাছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জড়ো-করা হাতে তখনও সেই প্যাকেট আর অর্থ। কনুইটা ধরে বেমক্কা ধাক্কা মেরে দক্ষিণ-মুখেই তাকে ঘুরিয়ে দিল দারু। যে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়েছিল তারা, সেখানে পায়ের কাছে অস্পষ্ট একটা পথ-রেখা। 'মালভূমি পেরোনো ওই হলো পায়ে-চলার পথ। একদিন হাঁটলে চারণভূমি দেখতে পাবে তুমি আর পাবে প্রথম যাযাবরদের। ওরাই তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে আর নিজেদের কানুন অনুযায়ী আশ্রয় দেবে তোমাকে।' আরবটি এইবার দারুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখেমুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন। 'শোনো', বলল লোকটা। দারু মাথা ঝাঁকাল 'না, চুপ। এবারে তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি।' লোকটার দিকে পেছন ফিরল দারু, স্কুলের দিকে লম্বা দুটি পা ফেলল, নিশ্চল আরবটির দিকে দ্বিধার চোখে তাকাল, আর তারপরেই এগোতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত ধরে হিম সেই ভূখণ্ড জুড়ে নিজের পদশব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না সে। একবারও ফেরাল না মাথা। তার পরেই ঘুরে দাঁড়াল সে। সেই পাহাড়-প্রান্তে তখনও দাঁড়িয়ে আছে আরবটি, তার হাত দুটি ঝুলছে এখন, স্কুলমাস্টারের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ তার। দারুর মনে হলো তার গলার কাছে উঠে আসছে কিছু একটা। কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে কিছু একটা বলল সে, অস্পষ্ট হাত নাড়ল, হাঁটতে শুরু করল আবার। অনেকটা যাবার পর আবার সে দাঁড়াল, দেখল তাকিয়ে। পাহাড়-প্রান্তে কেউ আর নেই তখন।

একটু ইতস্তত করল দারু। সূর্য এখন আকাশের বেশ উঁচু তলায়। মাথার ওপরে তীব্র রশ্মির আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। স্কুলমাস্টারটি কিছুটা পিছিয়ে এল, গোড়াতে কিছুটা অনিশ্চিতভাবে, তারপর নিশ্চিতভাবেই। ছোট্ট পাহাড়টিতে যখন সে পৌঁছল, ঘামে তার সর্বশরীর জবজবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাহাড়-চূড়োয় উঠে পড়ল সে এবং থমকে দাঁড়াল– একেবারে দম-ফুরোনো। দক্ষিণে নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে পাথুরে-ডাঙার খরশান ছবি, কিন্তু পুবে সমতল ক্ষেত্র থেকে একটা বাষ্পীয় উত্তাপ ততক্ষণে উঠে আসতে শুরু করেছে। আর সেই হিবিজিবির ভেতরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুব-মুখী কয়েদখানার দিকের রাস্তাটা ধরেই ধীর পায়ে আরবটিকে এগিয়ে যেতে দেখল দারু।

কিছুক্ষণ বাদে, ক্লাসঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, গোটা মালভূমির নিসর্গকে সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হতে দেখল দারু, কিংবা যেন দেখতেই পেল না। পেছনে ব্ল্যাকবোর্ডে ফরাসি নদী-নালার বাঁকের মাঝখানে চক দিয়ে লেখা বিশ্রী হাতের ছিটানো শব্দগুলো এবার পড়তে পারল সে 'আমাদের ভাইকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছ। এর মাশুল গুনতে হবে তোমাকে।' আকাশের দিকে তাকাল দারু, মালভূমির দিকে, তারও সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে অদৃশ্য স্থলভূমি শেষমেশ সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। অন্তহীন এই নিসর্গলোকে কত নিবিড়ভাবেই না নিজস্ব নৈঃসঙ্গে বিহ্বল হয়ে ছিল সে এতকাল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারুমগ্ন শিল্পী

চিত্রশিল্পী গিলবার্ট জোনাস ভাগ্য বিশ্বাসী ছিলেন। বলতে গেলে, এতেই তাঁর একমাত্র বিশ্বাস ছিল, যদিও অন্য মানুষের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এমনকি এক ধরনের সপ্রশংস দৃষ্টিভঙ্গিরও অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর নিজের বিশ্বাসও অবশ্য নির্গুণ ছিল না, কেননা এর ভেতরে ছিল অস্পষ্ট এক স্বীকৃতি, যেমন, প্রাপ্য কিছু না হলেও প্রাপ্তি তাঁর ভালোরকমই হবে। ফলত তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এক ডজন সমালোচক যখন কে সর্বপ্রথম তাঁর প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন, এই বিতর্কে মশগুল, তখন একটুও বিস্মিত হননি তিনি। তাঁর এই প্রশান্তি, কেউ কেউ যাকে তাঁর পরিছন্নতাই বলেন, একটা বিশ্বাসী নম্রতারই ফলশ্রুতি বরং। নিজস্ব প্রতিভা নয়, জোনাস সব কিছুর জন্য তাঁর ভাগ্যকেই নিয়ামক মনে করতেন।

আরও বিস্ময়ের কারণ ঘটল যখন একজন চিত্র-ব্যবসায়ী একটি মাসোহারার প্রস্তাব পাঠালেন তাঁকে যা তাঁর সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাবে। স্থপতি রাতু স্কুলজীবন থেকেই যে জোনাস আর তাঁর ভাগ্য ভালোবেসে এসেছে, স্পষ্ট করে না বললেও এই মাসোহারায় যে নিতান্ত দিন-গুজরান ছাড়া বেশি কিছু হবে না, সেটা এবং ব্যবসায়ীটি যে কোনোই ঝুঁকি নেয়নি, তা বলার চেষ্টা করেছিল। 'একই কথা', বলেছিলেন জোনাস। রাতু, কঠিন পরিশ্রমই যাকে সব কাজে সাফল্য এনে দিয়েছিল, ভর্ৎসনা করল বন্ধুকে। 'একই কথা বলতে কী বলতে চাইছ তুমি? তোমাকে দর কষাকষি করতে হবে।' কিছু হলো না তাতে। মনে মনে ভাগ্যকেই ধন্যবাদ জানালেন জোনাস। 'যেমন বলেছেন আপনি', ব্যবসায়ীটিকে জানালেন তিনি। ছবি আঁকাতেই সম্পূর্ণ সঁপে দিতে নিজেকে পৈতৃক প্রকাশনী-সংস্থার চাকরিতেও ইস্তফা দিলেন। বললেন, 'কী সৌভাগ্য!'

আসলে তাঁর মনে হলো 'এটা সেই পুরনো সৌভাগ্য।' যতদূর মনে করতে পারেন, সেই একই সৌভাগ্যকে সক্রিয় দেখতে পেলেন তিনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিতা-মাতার প্রতি একটি আসক্ত কৃতজ্ঞতাবোধ অনুভব করলেন তিনি, কারণ যত্ন-আত্তি ছাড়াই তাঁরা মানুষ করেছেন তাঁকে, যা তাঁকে দিবাস্বপ্নের মুক্ত-সাম্রাজ্য তুলে দিয়েছিল, দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের অভিযোগেই তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। অন্তত সে রকমই ছল ছিল তাঁর বাবার। এটা যে একটা অদ্ভুত রকমের ব্যভিচার বরং, সেটা তিনি নির্দিষ্ট করে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। স্ত্রী যেসব সৎকর্মে আত্মনিবেদন করতেন, সেগুলো তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বাস্তবিকই তাঁর স্ত্রী ছিলেন একজন সাধারণ সন্ন্যাসিনীবিশেষ, দুঃখী মানুষের জন্য দেহ-মন সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন তিনি। তিনি জানতেন কোনও দোষ নেই এতে। কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

স্বামীটি তাঁর স্ত্রীর সদগুণের স্বত্বাধিকার দাবি করে বসলেন। 'আমি অসুস্থ আর ক্লান্ত', সেই ওথেলো বলতেন, 'দুঃখী মানুষের সঙ্গে মিলিত তাঁর সাহচর্যে।'

এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে জোনাসই লাভবান হয়েছিলেন। বিচ্ছিন্ন পিতা-মাতার বেশ কিছু মর্ষকামী হত্যাকারী সন্তানের সংবাদ পড়েছিলেন বা শুনেছিলেন বলেই তাঁর পিতা-মাতা এ রকম দুর্ভাগ্যজনক পরিণামের অঙ্কুরেই বিনাশের উদ্দেশ্যে তাঁকে আসকারা দেবার ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিলেন। শিশুর মনোরাজ্যে অভিঘাতের এই অভিজ্ঞতা তেমন স্পষ্টতর নয় বলেই অধিকতর দুশ্চিন্তায় ছিলেন তাঁরা, যেহেতু অপ্রতীয়মান সেই বিনাশ গভীরতমই হয়ে থাকে। পিতা-মাতার সাধারণ এই উদ্বেগ যাতে আতঙ্কে পরিণত হয় সেজন্য জোনাসকে শুধু ঘোষণা করতে হয়েছিল যে নিজেকে বা তাঁর দিনগুলোকে নিয়ে সন্তুষ্টই ছিলেন তিনি। তাঁদের মনোযোগ এতে বহুগুণিত হলো, আর শিশুটির চাইবার কিছু অবশিষ্ট থাকল না।

তথাকথিত এই দুর্ভাগ্য পরিশেষে বন্ধু রাতুকেই তাঁর অনুরক্ত ভাই করে তুলল। রাতুর পিতা-মাতা তাঁর ছোট্ট এই সহপাঠীটিকে প্রায়ই যত্ন-আত্তি করতেন কেননা তাঁর দুর্দশা দেখে করুণাই হতো তাঁদের। তাঁদের সহানুভূতিশীল মন্তব্যগুলো তাঁদের বলবান আর ক্রীড়ামোদী সন্তানকে উদ্বোধিত করেছিল শিশুটিকে তাঁর সুরক্ষায় নিয়ে আসতে। শিশুটির উদাসীন সাফল্যের ইতিমধ্যেই ভক্ত হয়ে গিয়েছিল সে। অনুরাগ আর অনুকম্পার সংমিশ্রণে এই যে বন্ধুত্ব, জোনাস অপরাপর বস্তুর মতো এটাকেও তাঁর উদ্দীপক সারল্যের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই জোনাস যখন তাঁর পড়াশোনার পাট শেষ করলেন, ফের সেই সৌভাগ্যলাভ। পিতার প্রকাশনী সংস্থায় ঢুকলেন তিনি, যে চাকরিটা পেলেন পরোক্ষে, তা হলো চিত্রশিল্পীর। ফ্রান্সের একজন অগ্রগণ্য প্রকাশক হিসেবে জোনাসের পিতার অভিমত ছিল, সংস্কৃতির মন্দার কারণে গ্রন্থই ভবিষ্যতের প্রতিভূ। 'ইতিহাস বলে', বলতেন তিনি, 'মানুষ বই পড়ে যত কম, বই কেনে তত বেশি।' ফলত, তাঁর কাছে যেসব পাণ্ডুলিপি জমা পড়ত, কদাচিৎ তিনি পড়তেন তা এবং একমাত্র লেখকের ব্যক্তিত্ব আর বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতেই তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন (এই দৃষ্টিকোণ থেকে, যৌনতা যেহেতু চিরকালই প্রাসঙ্গিক, প্রকাশক শেষমেশ এতেই বিশেষজ্ঞ বনে গিয়েছিলেন)। অস্বাভাবিক আকার আর মুক্ত বিজ্ঞাপনেই তাঁর সময় অতিক্রান্ত হতো। একই সময়ে জোনাস যখন পাণ্ডুলিপি পাঠের বিভাগ হাতে তুলে নিলেন, যথেষ্ট অবসর সময়ও হাতে তুলে নিতে পারলেন তিনি সেই কারণেই, যা পূর্ণ করাও জরুরি হলো। এভাবেই চিত্রশিল্পের অঙ্গনে পদার্পণ তাঁর।

এই প্রথম নিজের অভ্যন্তরে সংশয়বিহীন দুর্মর এবং উৎসাহ আবিষ্কার করলেন

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

তিনি, দিনগুলো তাঁর অচিরেই সঁপে দিলেন চিত্রশিল্পে, আর বিশেষ পরিশ্রম ছাড়াই, সেই অনুশীলনেও সর্বসফল হলেন। আর কিছুতেই আকৃষ্ট হলেন না তিনি, ঠিক সময়ে কোনও রকমে বিয়েটা সেরে ফেললেন, অঙ্কনেই পূর্ণগ্রাস হলো তাঁর। সাধারণ জনগণ আর জীবনের সাধারণ ঘটনাবলির প্রতি নিতান্তই সহৃদয় একটি হাসিই মজুদ থাকত তাঁর। এর ফলে সেদিকে দৃকপাতের কোনও দায়ও ছিল না তাঁর। রাতু জোনাসকে তার মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে গিয়ে যে দুর্ঘটনাটি ঘটাল, তার একঘেয়েমি আর ডান হাতখানি অসাড় আর ব্যান্ডেজ-বাঁধা হওয়ায় জোনাস ভালোবাসার আকর্ষণে পড়ে গেলেন। সেই দুর্ঘটনার অভ্যন্তরেই ভাগ্যের মাঙ্গলিক প্রভাব পুনরায় খুঁজে পেলেন তিনি, কারণ এটা না হলে লুইজি পাউলিনের দিকে চোখ তুলে তাকানোর ফুরসতই হতো না তাঁর। পাউলিন এর যোগ্যই ছিল।

রাতুর মতে, বলতেই হয়, লুইজির মধ্যে দেখার মতো কিছু নেই। নিজে বেঁটেখাটো, শক্ত-পোক্ত বলে দীর্ঘাঙ্গী নারী ছাড়া অন্য কিছুই তার পছন্দ ছিল না। 'আমি বুঝি না, ওই পতঙ্গের মধ্যে কী খুঁজে পাও তুমি', বলত সে। আসলে লুইজি ছিল ছোটখাটো, ত্বক, চুল আর চোখ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু গড়ন ভালো আর মুখশ্রী সুন্দর। জোনাস ছিলেন দীর্ঘকায় আর মজবুত চেহারার। পতঙ্গটিকে দেখে বিশেষ করে এ কারণেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে এটি ছিল অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ। লুইজির বৃত্তিই ছিল কর্ম-কেন্দ্রিক। জোনাসের স্থবিরতা এবং তজ্জনিত সুবিধার সঙ্গে এই বৃত্তি রীতিমতো খাপ খেয়ে গিয়েছিল। লুইজি প্রথমে সাহিত্য-নিবেদিত-প্রাণ ছিল, প্রকাশনাই জোনাসের আগ্রহের বিষয়– এই ভেবে। তাকে না বললেও সব সে পড়ে ফেলত এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সব বিষয়ে কথা বলতে সফলতা অর্জন করল। জোনাস প্রশংসা করতেন তার এবং পড়ার দায় থেকে নিশ্চিতভাবে মুক্ত বলে মনে করতেন নিজেকে। লুইজি সবই তাঁকে জানাত এবং এর ফলে সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলোর মূল বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হতে পারতেন তিনি। 'নিশ্চয়ই তুমি বলবে না', লুইজি জোর দিয়েই বলত, 'অমুক কিংবা তমুক দুষ্টু-চরিত্রের অথবা কুৎসিত, বরং বলবে দুষ্টু-চরিত্রের কিংবা কুৎসিত বলেই নিজেদের প্রদর্শন করে তারা।' এই পৃথকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ এবং রাতু যেমন বলত, মানব-প্রজাতির সমূহ সর্বনাশেরই নকিব ছিল তা। কিন্তু লুইজি চিরকালের জন্য এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঘটিয়েছিল এই বলে যে এ সত্য আবেগপ্রবণ সংবাদ-মাধ্যম এবং দার্শনিক পর্যালোচনা উভয় কর্তৃকই সমর্থিত অতএব তা বিশ্বজনীন এবং তর্কাতীত। 'ঠিকই বলেছ তুমি', জোনাস বললেন, ভাগ্য নিয়ে স্বপ্ন দেখার নিষ্ঠুর সেই আবিষ্কারটি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে।

লুইজি যেদিনই উপলব্ধি করল যে জোনাস কেবলি চিত্রশিল্পেই আগ্রহী, সেদিন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকেই সাহিত্য তার কাছে বর্জ্য হলো। দৃশ্য-শিল্পে অবিলম্বে ন্যস্ত-হৃদয় হলো সে, মিউজিয়াম এবং প্রদর্শনীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল, টেনে নিয়ে গেল সেসব জায়গায় জোনাসকে যদিও তাঁর সমসাময়িকরা কী আঁকছেন সেটা সঠিক বুঝতে পারতেন না তিনি আর নিজের শিল্প-সারল্যে উদবেজিত বোধ করতেন। তথাপি তাঁর শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে জেনে গেছেন তিনি এই ভেবে উৎফুল্ল হতেন। সত্যি বলতে কী, সদ্য দেখা চিত্রাবলির শিল্পীর নামখানিও পরের দিন ভুলে মেরে দিতেন তিনি। কিন্তু লুইজহি সঠিক যখন সে তার সাহিত্যচর্চার পর্ব থেকে সমাহৃত একটি আপ্তবাক্য শেষমেশ স্মরণ করিয়ে দিত তাঁকে যে বাস্তবে কেউই কিছুই ভুলে যায় না। জোনাসের ভাগ্য নিশ্চিতভাবেই সুরক্ষা দিতে তাঁকে। এভাবেই বিবেকের কাছে অপরাধী না হয়েও স্মরণের নিশ্চিতি আর বিস্মরণের স্বাচ্ছন্দ্যকে একীভূত করে ফেলতে পারতেন তিনি।

কিন্তু তাঁর প্রতি নিবেদিত লুইজির আত্মবিসর্জন জোনাসের প্রাত্যহিক জীবনে একটি উজ্জ্বলতম অভিপ্রকাশ। জুতো কেনা, কিংবা স্যুট, শার্ট, সাধারণ মানুষের যা দরকার, ছোট্ট জীবনের দিনগুলোকেও যা হ্রস্বতর করে দেয়, তা থেকে সেই দেবী তাঁকে রেহাই দিয়েছিল। সময় কাটানোর হাজার ফিকিরের উদ্ভাবন, সামাজিক নিরাপত্তার গোপ্য পুস্তিকা থেকে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব অফিসের নিরন্তর পরিবর্তনশীল মেজাজ, সবই সে দশ হাতে নিজের ওপরে তুলে নিয়েছিল। 'ঠিক হ্যায়', রাতু বলেছিল, ' তোমার বদলে ডেন্টিস্টের কাছে সে তো আর যেতে পারে না।' যেতে সে না পারে, কিন্তু টেলিফোন করে সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়ের আপয়েন্টমেন্টটা সে-ই করে। খুদে গাড়িটাতে তেল বদলানোর দেখভাল সে করে, ছুটির দিনে হোটেলে ঘর বুক করে, আগুন-পোহানোর কয়লার সংস্থান করে, জোনাস যে উপহারগুলো দিতে চান সেগুলো নিজেই সে কিনে আনে, পছন্দ করে তাঁর ফুল পাঠায়, এমনকি কোনও কোনও সন্ধ্যায় যখন তিনি অনুপস্থিত তাঁর ঘরে এসে তাঁর বিছানা পেতে রাখার সময়ও সে বের করে নয়, যাতে ঘরে ফিরে জোনাসের কোনও অসুবিধা না হয়।

সেই একই উৎসাহ নিয়ে সেই বিছানায় সে শুত, আবার মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঠিক রাখত, অবশেষে প্রতিভা স্বীকৃতির দু বছর আগেই জোনাসকে টাউন-হলে নিয়ে যেত এবং মধুচন্দ্রিমার ব্যবস্থা করত, যাতে একটা মিউজিয়ামও তাদের অদেখা না থাকে। আবাসন-স্বল্পতার মধ্যেও ক্রয় না করেই একটি তিন-কামরার ফ্ল্যাট খুঁজে বের করে সে, যেখানে ফিরে এসেই বসবাস শুরু করে দেয়। এরপর দ্রুততার সঙ্গেই দুটি সন্তানের জননী হয় সে, একটি পুত্র, একটি কন্যা। প্রকাশনী-সংস্থা ছেড়ে; জোনাস যখন ছবি আঁকতেই মনোনিবেশ করলেন, তখনই দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় সন্তানের জননী হবার সুগোপন ইচ্ছাটি পূর্ণ হলো তার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জননী হবার অব্যবহিত পর থেকেই, এটা অবশ্যই বলা দরকার, লুইজি তার একমাত্র সন্তান, পরবর্তীকালে, সন্তানদের ব্যাপারেই আত্মনিয়োগ করল। তারপরও স্বামীকে সাহায্য করার চেষ্টা করত সে, কিন্তু সময় পেত না। সত্যি বলতে কী, জোনাসকে তার অবহেলার জন্য অনুশোচনা হতো তার, কিন্তু তার চারিত্রিক দার্ঢ্যই এ রকম অনুশোচনায় সময়ের অপচয় থেকে দূরে রাখত তাকে। 'কিছু করার নেই', বলত সে, 'আমাদের প্রত্যেকেরই কাজের নিজস্ব ক্ষেত্র আছে।' যেকোনও কারণেই হোক না কেন এই অভিব্যক্তি উৎফুল্লই করত তাঁকে, কারণ সে যুগের সব শিল্পীর মতোই নিজেকে তিনি একজন শ্রমশিল্পী বলেই দেখতে চাইতেন। সে কারণে সেই শ্রমশিল্পী কিঞ্চিৎ অবহেলার শিকার হলেন এবং নিজের জুতো তাঁকে নিজেই কিনতে হতো। তবুও, এরকম ঘটাটা স্বাভাবিক হলেও, জোনাস আবার লুব্ধ হলেন উল্লসিত হতে। অবশ্য, দোকানে যাবার জন্য বিশেষ এক উদ্যোগ নিতে হতো তাকে, কিন্তু দাম্পত্য প্রশান্তিদায়ী নিভৃতির অনন্য এক অবসরে পুরস্কৃত হতো তা।

থাকার মতো পরিবারের সমস্যাটাই সব সমস্যার বাড়া ছিল তাদের, কারণ সময় এবং পরিসর একই সঙ্গে সংকুচিত হয়ে আসছিল তাদের চারপাশে। ছেলেমেয়েদের জন্ম, জোনাসের নতুন বৃত্তি, তাদের সীমিত বাসস্থান, অপ্রতুল মাসোহারা অপেক্ষাকৃত বড় কোনও বাসস্থান সংগ্রহের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্মিলিতভাবে এগুলো লুইজি এবং জোনাসের অধিকতর ব্যস্ততার কোনও সুযোগই রাখেনি। তিনতলার এই বাসগৃহটি ছিল অষ্টাদশ শতকের একটি ব্যক্তি-মালিকানার বাড়ি। রাজধানীর পুরনো পাড়াতেই এর অবস্থান। সেই অট্টালিকায় অনেক শিল্পীই বাস করত, নীতিগতভাবে যাদের বিশ্বাস ছিল শিল্পে নব্যতার অনুসন্ধান কেবল পুরাতন প্রেক্ষিতেই সম্ভব। এ বিশ্বাসেরই শরিক জোনাস তাই এখানেই বসবাসে আহ্লাদিত ছিলেন।

অ্যাপার্টমেন্টগুলো পুরনো বলে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু অত্যাধুনিক কয়েকটি ব্যবস্থা এগুলোকে একটা মৌলিক অবয়ব দিয়েছিল। স্বল্প পরিসরে প্রচুর খোলামেলা হাওয়ার সংস্থানেই এর মুখ্য কারণ নিহিত। ঘরগুলো বিশেষভাবেই উঁচু আর জমকালো দীর্ঘ জানালায় শোভিত। রাজকীয় আয়তনের বিচারে আপ্যায়ন আর উৎসবের জন্যই এগুলো যে নিশ্চিতভাবে নির্মিত তা বোঝা যায়। কিন্তু শহরের জনবাহুল্য এবং গৃহ-সম্পদ থেকে রোজগারের প্রয়োজনে এগুলোর মালিকেরা পরম্পরায় পার্টিশানের সাহায্যে বিশালাকায় ঘরগুলোকে ছোট আকার দিতে বাধ্য হয়, আর ভাড়াটের দলকে উচ্চহারে ভাড়া দিতে ঘরের সংখ্যা এভাবেই বৃদ্ধি পায়। 'যথেষ্ট ঘন-ক্ষেত্র-পরিসর' বলে তবুও এদের গুণগান করত তারা। এর অনিবার্যতা কেউই অস্বীকার করতে পারত না। এর সহজ কারণ হলো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঘরগুলোকে লম্বালম্বি পার্টিশান দেওয়া অসম্ভব। তা না হলে উঠতি প্রজন্ম, বিশেষ করে যারা সেই মুহূর্তে বিবাহ এবং সন্তান কামনায় উন্মুখ, গৃহমালিকেরা তাদের জন্য আরও বেশ কিছু আশ্রয়ের নির্মাণে নিশ্চিতভাবেই দ্বিধান্বিত হতো না। এছাড়া, বাতাস চলাচলের ঘন-ক্ষেত্র-পরিসরগুলো আদপেই সর্বার্থে ভালো ছিল না। এগুলোর জন্যই শীতে ঘরগুলো উষ্ণ করা দুঃসাধ্য ছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত এটাই ঘর উষ্ণ রাখার কারণে ভাড়া-বৃদ্ধিতে বাধ্য করত বাড়িঅলাদের। গ্রীষ্মে দীর্ঘ-প্রসর জানালার জন্য ঘরগুলো আক্ষরিক অর্থেই আলোয় প্লাবিত হয়ে যেত, কারণ কোনও আলো-নিরোধকের ব্যবস্থাই ছিল না। বাড়িঅলারা নিঃসন্দেহে বাড়িগুলোর উচ্চতা আর ছুতোরের খরচ বিবেচনায় ভগ্নোৎসাহ হয়ে সেগুলো লাগানোর ব্যাপারে অনীহ ছিল। শেষমেশ, পুরু পর্দাতেই সেই একই প্রয়োজন সাধিত হতো এবং খরচটাও কোনও সমস্যা ছিল না। যেহেতু সেটা ছিল ভাড়াটেদেরই নিজস্ব দায়িত্ব। অধিকন্তু, নিজেদের সংগ্রহ থেকে কেনা দামে পর্দা দিয়ে তাদের সহায়তা করতে অনিচ্ছুক ছিল না তারা। ভূ-সম্পত্তিঘটিত মানবপ্রীতি আসলে তাদের কাছে ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নিয়মিত দৈনন্দিন জীবনে নব্য সেই রাজপুত্রগণ সুতোর কাপড় আর ভেলভেট বিক্রয় করত।

এই অ্যাপার্টমেন্টের সুযোগ-সুবিধাগুলো দেখে জোনাস আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিলেন। এর দোষ-ত্রুটিগুলো মেনে নিতে কোনও তকলিফই হলো না তাঁর। তাপ-নিরোধকের ব্যাপারে বাড়িঅলাকে জানালেন তিনি, 'যেমন বলবেন আপনি।' পর্দা নিয়ে লুইজির সঙ্গে সহমত হলেন তিনি– একমাত্র শয়ন-ঘরে এটা দিলেই যথেষ্ট, অন্য জানালাগুলো যে রকম আদুল আছে থাক। 'আমাদের লুকোবার কিছুই নেই', নিষ্পাপ মনের কথা তাঁর। বিশাল সেই ঘরখানিই জোনাসকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল। এর সিলিং ছিল এতটাই উঁচু যে সেখানে আলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। প্রবেশপথটির পাল্লা দুটি সেই ঘরের ভেতরের দিকে সরাসরি খোলে। একটি সংকীর্ণ হলের সাহায্যে পাশাপাশি বিন্যস্ত অন্য দুটি ছোট ঘরের সঙ্গে যুক্ত ছিল এটি। এই হলের প্রান্তসীমায় ছিল রান্নাঘর, বাথরুম এবং স্নানঘর নামবিশিষ্ট ঘুপচি একটি জায়গা। এটাকে স্নানঘর বলা অবশ্য তখনই সংগত হতো যখন এর প্রয়োজনীয় ফিটিংগুলো লম্বালম্বি লাগানো হতো আর জলের নিচে একেবারে নট-নড়ন-চড়ন দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি থাকত কেউ।

সিলিং-এর বাস্তবিক অসামান্য এই উচ্চতা আর ঘরগুলোর সংকীর্ণতা কাচ-ঢাকা জানালা-দরজাসমেত অ্যাপার্টমেন্টটাকে সামন্তরিকের বিদঘুটে এক জগা-খিচুড়িতে পরিণত করেছিল। আসবাবপত্র রাখার মতো কোনও দেয়াল ছিল না। আর মানুষগুলো খাড়াই একটা অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরে দুষ্ট বোতল-বালকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মতো ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। অধিকন্তু, জানাগুলোই আর একটি অট্টালিকার দিকে মুখ-ফেরানো, বলা যায়, রাস্তা পার হয়েই একই ধরনের জানালার অভিমুখে, যার ও-পাশে তৃতীয় অট্টালিকার দিকে মুখ-করা জানালাগুলোর গম্ভীর রূপরেখা সহজেই নজর কাড়ে। 'এটা একটা আরশির হল', আনন্দে জোনাস বলে। রাতুর পরামর্শে ছোট ঘর দুটির একটাকেই মুখ্য শয়নঘর করা ঠিক হলো, অন্য ছোট ঘরটি প্রত্যাশিত শিশুটির জন্য। বড় ঘরটি দিনের বেলায় জোনাসের স্টুডিও, সন্ধেবেলায় বসার ঘর আর খাবার সময় খাবার ঘর। জরুরি হলে রান্নাঘরেও খেতে পারত তারা, অবশ্য জোনাস এবং লুইজি যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে রাজি থাকে। নিজের দিক থেকে সুচতুর উদ্ভাবনায় রাতু নিজেকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্লাইডিং দরজা, প্রচ্ছন্ন তাক আর ভাঁজ-করা টেবল-এর সাহায্যে আসবাবের ঘাটতি পূরণ করে ফেলেছিল সে, অদ্ভুত সেই অ্যাপার্টমেন্টের বাক্স-প্রতিম চেহারাটা অক্ষুণ্ন রেখেই অবশ্য।

কিন্তু ঘরগুলো যখন ছবি আর শিশুতে ভরে গেল, একটা নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবতে হলো তাদের। আসলে তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে জোনাস বড় ঘরটিতে বসেই কাজ করতেন, লুইজি শোবার ঘরে বসে বোনার কাজ করত, শেষ ঘরটা দখল করে থাকত বাচ্চা দুটি, শোরগোল করত তারা, ফ্ল্যাটের সর্বত্র ডিগবাজি খেত ইচ্ছে-খুশি মতো। তারা ঠিক করল সদ্যোজাতকে স্টুডিওর একটা কোণে রাখব। ক্যানভাসগুলোকে লম্বালম্বি দাঁড় করিয়ে সেখানে একটা দেয়ালের মতো করে দিলেন জোনাস। এর ফলে বাচ্চাটা যেমন কানের কাছেই থাকবে, তেমনি সাড়া-শব্দ পেলে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যাওয়া যাবে। নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করার কোনও প্রয়োজনই ছিল না জোনাসের, লুইজিই সে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। সব রকমের সতর্কতা মেনে নিঃশব্দ পায়ে বাচ্চাটি কেঁদে উঠবার আগেই স্টুডিওতে চলে যেত সে। লুইজির ওই সুবিবেচনায় অভিভূত জোনাস একদিন তাকে জানালেন যে তিনি তেমন কিছু শব্দ-কাতর নন, লুইজি শব্দ করে হাঁটলেও স্বচ্ছন্দেই নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তিনি। লুইজি বলল যে বাচ্চাটার ঘুম যাতে না ভেঙে যায়, সেটাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য। মাতৃহৃদয়ের এই অভিপ্রকাশের পূর্ণ প্রশস্তিতে নিজের অজ্ঞতায় প্রাণখুলে হেসে ফেললেন জোনাস। ফল হলো, লুইজির সতর্ক এই প্রবেশ পুরোদস্তুর একটা আক্রমণের মতোই যে উত্ত্যক্ত করে তাঁকে, সেটা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। প্রথমত এই প্রবেশ ছিল দীর্ঘস্থায়ী, দ্বিতীয়ত হাত দুটি ছড়িয়ে, কাঁধ দুটি পেছন দিকে হেলিয়ে আর উঁচুতে পা তুলে যে রকম মূকাভিসারে যেত সে, তাতে লুইজির দিকে চোখ না পড়ে উপায় থাকত না। নিজের ব্যক্ত-ইচ্ছের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছিল এই পদ্ধতি, কেননা এর ফলে খুবই ঝুঁকি ছিল যে স্টুডিওময় ছড়ানো-ছিটানো ক্যানভাসে হুমড়ি খেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পড়ে যাবে লুইজি। এ রকম মুহূর্তেই শব্দে ঘুম ভেঙে যাবে বাচ্চাটার, সাধ্যমতো নিজের বিরক্তি জাহির করবে সে, মোটেই যা হেলাফেলার হবে না। ছেলের ফুসফুসের প্রতাপে উল্লসিত পিতা দৌড়ে গিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করবে তাকে এবং অনতিবিলম্বেই স্ত্রী গিয়ে অব্যাহতি দেবে তাঁকে। জোনাস তারপর ক্যানভাস তুলে নেবেন আবার, হাতে বুরুশ নিয়ে তুরীয়ানন্দে নাছোড় আর সার্বভৌম কণ্ঠস্বর শুনবেন তাঁর আত্মজের।

এটা ছিল ঠিক সেই সময়কাল যখন জোনাসের সাফল্য অনেক বন্ধুকে আকর্ষণ করেছিল। টেলিফোনে কিংবা অপ্রস্তুত আগমনে আবির্ভূত হতো সেইসব বন্ধু। অনেক আলোচনা করেই টেলিফোনটা স্টুডিওতেই রাখা হয়েছিল। প্রায়ই বেজে উঠত এটা এবং বাচ্চাটার ঘুম ভাঙাত। টেলিফোনের জরুরি বেজে ওঠার সঙ্গে নিজের কান্নার শব্দ জুড়ে দিত সে তারপর। এমন যদি ঘটত যে এরকম সময় অন্য বাচ্চাদের সামলাতে ব্যস্ত লুইজি, তাহলে তাদের সঙ্গে করেই টেলিফোনের কাছে চলে আসবার চেষ্টা করত সে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই সে দেখতে পেত এক হাতে বাচ্চাটিকে ধরে আছেন জোনাস, অন্য হাতে বুরুশ আর রিসিভার, যার মাধ্যমে লাঞ্চে নেমন্তন্ন হচ্ছিল তাঁর। জোনাস ভেবে অবাক হতেন তাঁর কথাবার্তা নীরস বলে সকলেই তাঁর সঙ্গে লাঞ্চে আগ্রহী ছিল। কাজের দিনটাকে অটুট রেখে সন্ধেবেলায় যাওয়াটাই পছন্দ ছিল তাঁর। বেশির ভাগ সময়েই বন্ধুরা দুর্ভাগ্যবশত কেবল লাঞ্চের জন্যই, বিশেষ করে সেদিনেরই লাঞ্চ, সময় করতে পারত। প্রিয় জোনাসকে সেজন্যই চাপাচাপি করত তারা। জোনাস গ্রহণ করে বলতেন তখন, 'যেমন বলবে তুমি!' টেলিফোন রেখে লুইজির হাতে বাচ্চাটিকে দিতে দিতে যোগ করতেন, 'তিনি কি চিন্তাশীল নন?' তারপর কাজে ফিরতেন, লাঞ্চ কিংবা ডিনারে বিঘ্নিত হয়েই। ক্যানভাসগুলো একপাশে সরিয়ে রাখতে হতো, বিশেষ টেবলটা ভাঁজ খুলে পাততে হতো, এবং বাচ্চাদের সঙ্গে বসে পড়তে হতো। খেতে খেতেই যে ছবিখানি আঁকছিলেন, তার ওপর নজর রাখতেন তিনি এবং অন্তত প্রথম দিকে, চিবানো এবং গেলার ব্যাপারে বাচ্চাদের ঢিলেমিটা লক্ষ করতেন। ফলে প্রত্যেকটা খাওয়াই ছিল বাড়াবাড়ি রকমের দীর্ঘ। কিন্তু খবরের কাগজে তিনি পড়েছেন হজমের জন্য ধীরে ধীরে খাওয়াটাই জরুরি, এবং তখন থেকে প্রতিটি খাওয়াই দীর্ঘতর আনন্দকে যুক্তিসিদ্ধ করল।

অনেক সময় তাঁর নতুন বন্ধুরা বাড়িতেই চলে আসত। রাতু অবশ্য রাতের খাবার শেষ হবার আগে কখনোই আসত না। দিনের বেলা সে অফিসেই থাকত এবং এছাড়া, জানাই ছিল তার যে আঁকিয়েরা দিনমানের আলোতেই কাজ করে। কিন্তু জোনাসের নতুন বন্ধুরা সবাই ছিল শিল্পী বা সমালোচক গোত্রের। কেউ কেউ ছবি এঁকেছে, কেউ বা আঁকতে চলেছে, আর বাকিরা যা আঁকা হয়েছে বা হবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তাই নিয়ে ভাবিত ছিল। শিল্পের শ্রমকে সবাই নিশ্চিতভাবেই উঁচু মর্যাদা দিত আর অভিযোগের আঙুল তুলত বর্তমান পৃথিবীর সেইসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যারা নাকি শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য এই শ্রম এবং সাধনায় লেগে থাকাটাকেই দুঃসাধ্য করে তোলে। গোটা বিকেল জুড়েই এরকম নিন্দাবাদ করত তারা, জোনাসকে কাজ চালিয়ে যেতে অনুনয় করত যেন তারা সেখানে নেই এরকম ভেবে নিয়ে এবং উপক্ষো করেই, কারণ তারা কেউই এরকম বেরসিক নয় যে শিল্পীর সময়ের মূল্য তারা বোঝে না। তাদের উপস্থিতিতেই কাজ চালিয়ে যাবার প্রস্তাবনায় জোনাস বন্ধুদের প্রতি প্রসন্ন হতেন। কাজে ফিরতেন তিনি, তার ভেতরেই বন্ধুদের প্রশ্নের জবাব অথবা তাঁকে শোনানো কোনও টুকরো গল্পের শেষে হাসি-টাসিও চলত।

তাঁর সেই সারল্য বন্ধুদের আরও প্রগলভ করে তুলত। তাদের উৎসাহ এতটাই নিবিড় ছিল যে খাবার সময়ের কথাও ভুলে যেত তারা। কিন্তু বাচ্চাদের মনে করার ক্ষমতা তুলনায় ভালো ছিল। তারা ছুটে আসত, অতিথিদের সঙ্গে মিশে যেত, হল্লা করত, আদর খেত আর এক কোল থেকে আর এক কোলে চলে যেত। অবশেষে বাড়ির মাথায় চৌকো আকাশে মরে আসত আলো, হাতের বুরুশ নামিয়ে রাখতেন জোনাস। যা-আছে-তাই ভাগ করে খেতে অনুরোধ করা ছাড়া কিছুই করার থাকত না তখন, আর গল্প করে যেতে, গভীর রাত তক, অবশ্যই শিল্প সম্পর্কে, বিশেষ করে সাদামাটা আঁকিয়ে, চুরি করেই আঁকে যারা অথবা নিজের ঢাক পেটায়, তাদেই সম্পর্কে, যদিও সকলেই তারা গর-হাজির সেখানে। দিনের প্রথম সূর্যালোকের সুবিধাটুকু নেবার উদ্দেশ্যে জোনাস সকালে তাড়াতাড়ি ওঠাই পছন্দ করতেন। তিনি জানতেন এটা কষ্টকর, ঠিক সময়ে প্রাতঃরাশও তৈরি হবে না, আর তিনিও ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। অন্যদিকে একটি সন্ধ্যার ভেতরেই অত কিছু শেখার, যা নিশ্চিতভাবেই তাকে সমৃদ্ধ করত শিল্পকর্মে, সুযোগও খুশি করত তাঁকে। 'প্রকৃতির মতো শিল্পেও নষ্ট হয় না কিছুই', প্রায়ই বলতেন তিনি। 'এটা ভাগ্যেরই দাক্ষিণ্য।'

বন্ধুদের সঙ্গে কখনও-সখনও শিষ্যরাও জুটে যেত। জোনাসের এখন বেশ কিছু শিষ্য হয়েছে। গোড়াতে বিস্ময় হতো তাঁর, ভেবে পেতেন না, এখনও যাঁর নিজেরই বাকি সব কিছু খুঁজে পাবার, তাঁর কাছে কেউ আবার শিখবে কী। তাঁর ভেতরের শিল্পীসত্তা তো হাতড়ে মরছে অন্ধকারে। কেমন করে সঠিক পথের নিশানা বলতে পারেন তিনি? কিন্তু খুব দ্রুতই বুঝে ফেললেন তিনি শিষ্য মানে সব সময় এমন কেউ নয়, শেখার জন্যই যে আগ্রহী। প্রায়ই, পক্ষান্তরে, গুরুকে শেখানোর অনুৎসুক আনন্দের জন্যই শিষ্য হতে চায় অনেকে। তখন থেকে সাম্মানিক এই আতিশয্য নীরবেই স্বীকার করে নিতেন তিনি। জোনাসের শিষ্যের দল জোনাস কী এঁকেছেন আর কেনই বা, সে সবই ব্যাখ্যা করে শোনাত তাঁকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এভাবেই জোনাস নিজের শিল্পকর্মে এমন অনেক ইচ্ছেরই অভিপ্রকাশ খুঁজে পেতেন এবং আরও অভাবিত সব বিষয়, যা তাঁকে বিস্মিত করত। নিজেকে তিনি সামান্য বলেই ভেবেছিলেন। হঠাৎই নিজেকে অসামান্য বলে আবিষ্কার করেন শিষ্যদের দৌলতে। এরকম সন্দেহাতীত বৈভবের মুখোমুখি হয়ে কখনও কখনও গর্বের এক টংকার শুনতে পেতেন তিনি। 'এটা সত্যি তো বটেই', বলতেন তিনি। 'ওই যে মুখের প্রেক্ষিত, আমি জানি না, ওখানে অপরোক্ষ মানবিকীকরণ বলতে কী বোঝাতে চাইছে ওরা। তবুও ওই প্রতিভাসের কারণেই সত্যিই আমি কোথাও একটা পৌঁছে গিয়েছি হয়তো।' কিন্তু চট-জলদিই অস্বস্তিকর সেই ঋদ্ধিকে ভাগ্যের ওপরই চাপিয়ে দিতেন তিনি। 'এ সেই ভাগ্য', বলতেন তিনি, 'কোথাও পৌঁছেছে যে। আমি তো লুইজি আর বাচ্চাদের সঙ্গে বাড়িতেই রয়েছি।'

আরও একটা বাড়তি সুবিধা ছিল শিষ্যদলের, জোনাসকে আত্মপীড়নে বাধ্য করত তারা। নিজেদের আলাপচারিতায় এত উচ্চাসনে বসাত তারা তাঁকে, বিশেষ করে তাঁর বিবেক এবং কর্মনিষ্ঠার কারণে, যে অতঃপর তাঁর পক্ষে যেকোনও শৈথিল্যই ছিল গর্হিত অপরাধ। কঠিন একটা কাজের শেষে এবং আবার কাজে ফেরার আগে এক টুকরো চিনি বা চকোলেট নিয়ে ছেলেমানুষি করার পুরনো যে অভ্যাস গড়ে উঠেছিল তাঁর, সেটা আর রইল না। একা থাকলে তবুও চুরি করেই করতেন সেটা। কিন্তু শিষ্য আর বন্ধুবর্গের নিরন্তর উপস্থিতি তাঁর নৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখত। তাদের চোখের সামনে চকোলেট নিয়ে খোঁটাখুঁটি তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর ছিল, আর এরকম তুচ্ছ একটা ব্যক্তিগত ছেলেমানুষির জন্য তাদের আকর্ষণীয় আলাপচারিতায় বিঘ্ন ঘটানোও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

উপরন্তু, তাঁর শিষ্যবর্গ নিজের নান্দনিক বিশ্বাসে ন্যস্ত থাকতে চাপ সৃষ্টি করত তাঁর ওপর। একটানা কাজ করতে করতে কখনও কখনও হঠাৎ-অবকাশে বাস্তবতাকে সহসা নতুন এক আলোয় উদ্ভাসিত দেখতেন তিনি, কিন্তু নিজস্ব নান্দনিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অভ্যস্ত ক্ষীণ একটি ধারণাই ছিল তাঁর। তাঁর শিষ্যবর্গের, অন্যদিকে অনেক রকম ভাবনা ছিল, পরস্পরবিরোধী এবং নির্দিষ্ট রকমের এবং বিষয়টি নিয়ে কোনও পরিহাসই পছন্দ করত না তারা। কখনও কখনও নিজের খেয়ালখুশিকেই, শিল্পীর যা সহজাত স্বভাব, আঁকড়ে ধরতে চাইতেন জোনাস। কিন্তু শিষ্যবর্গ তাদের ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও ছবির দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে যখন তাকাত, নিজের শিল্পকৃতি সম্পর্কে আরও কিঞ্চিৎ সচেতন হতে বাধ্য হতেন তিনি, আর এতে তাঁর সুবিধাই হতো।

শেষমেশ, এই শিষ্যবর্গই আর এক রকমভাবে সাহায্য করত তাঁকে। সেটা হলো তাদের নিজস্ব সৃষ্টি সম্পর্কে মতামত দিতে তাঁকে বাধ্য করা। বস্তুত এমন একটা দিনও যেত না যখন কেউ না কেউ শুধু ছবির খসড়া নিয়ে আসত তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাছে, তিনি আর তাঁর ক্যানভাসের মাঝখানে এমন একটি জায়গায় রাখত সেটা, আলোর দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক যার অবস্থান। জোনাসের মতামতের প্রতীক্ষা করত তারা। তখন পর্যন্ত শিল্পকর্ম বিচারে তাঁর মৌলিক অক্ষমতায় সংগোপনে সর্বদাই সংকুচিত থাকতেন তিনি। কিছু ছবি যা তাঁকে অন্যতর অনুভূতিতে নিয়ে যেত, অথবা যেসব ছবি নিতান্তই মামুলি, তা বাদে আর সব ছবিই তাঁর কাছে ছিল তুল্যমূল্য আর অগ্রাহ্য। এর ফলে, শিল্প-বিচারে নিজস্ব কিছু মাপকাঠি তৈরি করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি, শিষ্যভেদে পরিবর্তনসহ ছিল যা। রাজধানীর সব শিল্পীই তাই করত, আসলে প্রতিবার এ এক পরিমাপকরণ। সবাই যখন পরিবেষ্টন করে থাকত তাঁকে, প্রত্যেক শিষ্যকেই তুষ্ট করতে গিয়ে সেই পরিমাপকরণে সূক্ষ্ম বিভাজন-রেখা টানতে হতো তাঁকে। শৌখিন এ দায়ই নিজের শিল্প সম্পর্কে একটি শব্দ ও প্রত্যয়ের ভাণ্ডার গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল তাঁকে। তবুও এ প্রচেষ্টা তাঁর স্বাভাবিক হিতৈষণাকে তিক্ত করার অবকাশ পায়নি। অচিরেই উপলব্ধি করলেন তিনি যে তাঁর শিষ্যবর্গ সমালোচনায় আগ্রহী নয়। কারণ কোনও দাম নেই তার, বরং উদ্দীপনাই, সম্ভব হলে, প্রশংসাই, প্রার্থিত ছিল তাদের। এই প্রশংসা আলাদা আলাদা রকমের হতে হবে। কড়ার শুধু এই। নিজের সহমত হবার প্রবণতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না জোনাস। জোনাসকে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে হতো তাই।

এভাবেই কাটতে লাগল জোনাসের দিন, তাঁর ইজেলের চারপাশে বৃত্তাকারে সাজানো চেয়ারে সমাসীন বন্ধু আর শিষ্যবর্গের মাঝখানেই চলতে লাগল তাঁর ছবি-আঁকা। প্রায়শই এছাড়াও, রাস্তার দিকের জানালায় এসে দাঁড়াত তাঁর পড়শিরা, আর এভাবেই বেড়ে যেত জনতার সংখ্যা। কথোপকথন চলত, মত বিনিময়, তাঁর কাছে আনা ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি, চলন্ত লুইজির দিকে তাকিয়ে হাসতেন, হাতের বুরুশ হাতেই থাকত তাঁর, যা দিয়ে কখন কখন অর্ধ-সমাপ্ত ছবিতে এক-আধটা আঁচড় কাটতেন তিনি। এদিক থেকে, তাঁর জীবন ছিল টইটম্বুর, একটি ঘণ্টাও ব্যর্থ যেত না, আর একঘেয়ে জীবন থেকে এই মুক্তির জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাতেন তিনি। অন্যদিকে একটা ছবি শেষ করতে বুরুশের বিস্তর আঁচড় লেগে যেত তাঁর, আর মাঝেমধ্যেই মনে হতো একঘেয়েমির সুবিধাটাই হলো এই যে শ্রমসাধ্য কাজের ভেতর দিয়েই তার প্রতিরোধ সম্ভব। কিন্তু বন্ধুদের অতিরিক্ত উৎসাহের কারণেই জোনাসের সৃষ্টির গতি শ্লথ হতে লাগল। এমনকি একাকিত্বের বিরল মুহূর্তেও এগিয়ে যেতে নিজেকে ভয়ানক ক্লান্ত বলে অনুভব করতে লাগলেন তিনি। আর এই রকম সব মুহূর্তেই স্বপ্ন দেখতেন নতুন এক জীবনচর্যার, বন্ধু-প্রীতির সঙ্গে ক্লান্তির উদ্বর্তনের মেলবন্ধন ঘটাবে যা।

লুইজির কাছে বিষয়টা উত্থাপন করলেন তিনি। লুইজি তখন আপনা থেকেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বড় দুটি সন্তানের বেড়ে ওঠা আর তাদের ঘরের অপরিসরতা নিয়ে চিন্তিত হতে শুরু করেছে। একটা পর্দার আড়ালে বড় ঘরে তাদের বিছানাকে সরিয়ে আর ছোট ঘরে কোলের বাচ্চাটিকে রেখে দেবার প্রস্তাব করল সে। এতে টেলিফোন-বিভ্রাটে বাচ্চাটার জেগে ওঠার আশঙ্কা থাকবে না। বাচ্চাটি যেহেতু সামান্য জায়গাই নেবে, ছোট ঘরটিকে স্টুডিওতে রূপান্তরিত করে নিতে পারবে জোনাস। বড় ঘরটি তাহলে দিনের বেলা ভিড় সামলাবার কাজে লাগবে, আর এ-ঘর ও-ঘর করে জোনাস বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব অথবা নিজের কাজ– দুটোই করতে পারবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল জোনাসের যে একাকিত্বের প্রয়োজন আছে, সবাই বুঝবে সেটা। অধিকন্তু, বড় দুটি বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দেবার প্রয়োজনেই সন্ধেটাকে সংক্ষিপ্তকরণে সহায়ক হবে তাদের। 'দারুণ!' এক মুহূর্ত ভেবেই বলে ফেললেন জোনাস। 'তা ছাড়া', লুইজি বলল, 'তোমার বন্ধুরা যদি তাড়াতাড়ি বিদায় হয়, দুজনে দুজনকে তাহলে একটু বেশি করেই কাছে পাব।' জোনাস লুইজির দিকে তাকালেন। বিষণ্ন একটা ছায়া সরে গেল লুইজির মুখের ওপর দিয়ে। জোনাসের বাজল, বাহু দিয়ে বেষ্টন করলেন লুইজিকে, তারপর গভীর অনুরাগে চুম্বন করলেন তাকে। লুইজি নিজেকে সমর্পণ করে দিল এবং মুহূর্তের জন্য বিয়ের প্রথম দিনগুলোর মতোই সুখে আপ্লুত হলো তারা। কিন্তু নিজেকে জোর করেই বিচ্ছিন্ন করে নিল সে; ঘরটা জোনাসের পক্ষে সম্ভবত খুবই ছোট ছিল। লুইজি একটা গোটানো ফিতে নিল এবং দুজনেই আবিষ্কার করল, জোনাস এবং তাঁর শিষ্যবর্গের ক্যানভাস, সংখ্যা দ্বিতীয়টিই বিশাল, যে অপরিসরতা সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে যে স্থানটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হতে যাচ্ছে তার থেকে তাঁর বর্তমান কাজের পরিসরটি কিছুমাত্র বৃহত্তর নয়। আসবাবপত্র সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন জোনাস।

কপালগুণে, যতই তিনি কম কাজ করতে লাগলেন, ততই বাড়তে লাগল তাঁর খ্যাতি। প্রতিটি প্রদর্শনী সাগ্রহে অপেক্ষিত এবং আগাম প্রশংসিত হতো। সত্যি বলতে গেলে, অল্প কিছু সমালোচক, যাদের মধ্যে দুজন তাঁর স্টুডিওর নিয়মিত অতিথি ছিল, তাদের বক্তব্যের আন্তরিকতায় মিতভাষণের কিছু জল মিশিয়েছিল। কিন্তু সামান্য এই দুর্ভাগ্য মুছে গিয়েছিল শিষ্যবর্গের উষ্মায়। দৃঢ়তার সঙ্গেই অবশ্য বলত তারা– প্রথম পর্বের ছবিগুলো সব কিছুরই ঊর্ধ্বে স্থাপিত, কিন্তু বর্তমান পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো একটি প্রকৃত বিপ্লবেরই পূর্বাভাস। যখনই তাঁর প্রথম কাজগুলো প্রশংসিত হতো, তখনই সামান্য যে বিরক্তি বোধ করতেন তিনি, তাঁর জন্য নিজেকে ভর্ৎসনা করতেন জোনাস এবং ধন্যবাদ দিতেন তাদের অজস্রভাবে। রাতুই গজগজ করত কেবল, 'যত সব অমানুষ একটা স্ট্যাচুর মতোই জড়বৎ দেখতে চায় তোমাকে ওরা। আর, তোমার বাঁচার অধিকারটাকেই অস্বীকার করে!'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কিন্তু জোনাস তাঁর শিষ্যকুলকে সমর্থন করতেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না', রাতুকে বলতেন তিনি, 'কারণ আমার সব কাজই তোমার পছন্দ।' রাতু হাসত, 'অবশ্যই! যে ছবিগুলো তুমি আঁকো, সেগুলো আমি পছন্দ করি না, আমি পছন্দ করি রং-তুলি নিয়ে তোমার আঁকাটাকেই বরং।'

যেমন করেই হোক, ছবিগুলো জনপ্রিয়তা অটুট রইল এবং সোৎসাহে সংবর্ধিত একটি প্রদর্শের পর সেই বণিকটি স্বেচ্ছায় তাঁর মাসোহারা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিল। যারপরনাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে জোনাস গ্রহণ করলেন তা। 'তোমার কথা যে-ই শুনেছে,' বণিকটি জানাল, 'সে-ই ভাববে টাকার একটা বিশেষ অর্থ আছে তোমার কাছে।' এই সহৃদয়তা শিল্পীকে যেন নিরস্ত্র করে দিল। তবুও, একটা ক্যানভাস অনুদান-বিক্রির জন্য যখন তিনি বণিকটির অনুমোদন চাইলেন, বণিকটি জানতে চাইল এই অনুদান কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটাবে কি না। জোনাস জানতেন না। বণিকটি তাই চুক্তিপত্রের শর্তেই লগ্ন থাকার প্রস্তাব করল যেখানে বিক্রির ষোলোআনা অধিকার তাকেই প্রদত্ত রয়েছে। 'চুক্তি চুক্তিই', বলল সে। সেখানে বদান্যতার কোনও অবকাশই নেই। 'আপনি যেরকম বলেন', শিল্পী বললেন।

নতুন এই ব্যবস্থা জোনাসের কাছে একটি অনিঃশেষ পরিতুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াল। যেসব চিঠি-চাপাটি এখন তাঁর কাছে এসে পৌঁছায়, সৌজন্যবশতই যেগুলোর উত্তর না দিয়ে ফেলে রাখতে পারেন না তিনি, সেগুলো লিখে ফেলার জন্য আসলে প্রায়ই পলাতক হতে কোনও বাধা ছিল না তাঁর। কেউ লিখত জোনাসের শিল্পকর্ম বিষয়ে, কেউ বা, যাদের সংখ্যাই বহুতর, লিখত নিজেরই বিষয়ে। শিল্পসৃষ্টিতে উৎসাহ প্রার্থিত থাকত তাদের অথবা উপদেশ কিংবা আর্থিক সহায়তা। খবরের কাগজে যতই নাম প্রকাশিত হতে লাগল জোনাসের, ততই ন্যক্কারজনক যাবতীয় অবিচারের বিরুদ্ধে, অপরাপর মানুষের মতোই, সক্রিয় অংশগ্রহণে অধিকতর মনস্ক হলেন তিনি। জোনাস উত্তর লিখতেন, শিল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতেন, ধন্যবাদ জানাতেন মানুষকে, উপদেশ দিতেন, সামান্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গলবন্ধ ছাড়াই পথে বেরোতেন এবং পরিশেষে, যেসব প্রতিবাদপত্র তাঁকে পাঠানো হতো, সেগুলো স্বাক্ষর করে দিতেন। 'তুমি এখন রাজনীতি করছ? লেখক আর কুৎসিত প্রবীণা দাসীদের জন্যই রেখে দাও ওটা' রাতু বলল। না, তিনি শুধু সেসব প্রতিবাদপত্রেই স্বাক্ষর দেবেন, কোনও বিশেষ ফলশ্রুতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বলে উদঘোষিত যেগুলো। কিন্তু সুন্দর এই স্বাধীনতায় সকলেই ভাগ বসাতে চাইল। সপ্তাহভর পকেটে চিঠির বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন জোনাস, নিরন্তর অমনোযোগে বেড়েই চলত যা। খুব জরুরি যেগুলো, তিনি উত্তর দিতেন, সাধারণত অপরিচিতদের কাছ থেকেই প্রাপ্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সেগুলো, আর যেগুলো অনেক ধীরে-সুস্থে লেখার, অর্থাৎ কিনা যেগুলো তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া, সেগুলো রেখে দিতেন সুসময়ের অপেক্ষায়। নরির্থক সময়-যাপন কিংবা খেয়ালখুশির স্রোতে গা ভাসানো থেকে এসব দায়-দায়িত্ব সরিয়ে রাখত তাঁকে। সবসময়ই মনে হতো পিছিয়ে পড়ছেন তিনি, অপরাধী বলে মনে হতো নিজেকে, এমনকি কখনও কখনও কাজের মধ্যেও ব্যাপৃত থাকতেন যখন তিনি।

আগের চাইতেও ছেলেদের নিয়ে ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেল লুইজির। অন্য পরিস্থিতি হলে যে কাজ জোনাসই বাড়িতে সামলাতে পারতেন, সেইসব কাজেই নিজেকে নিঃশেষিত করতে লাগল লুইজি। জোনাসের কষ্ট হতো এতে। আসলে জোনাসের ছবি-আঁকা ছিল আনন্দেরই জন্য, কিন্তু ঝক্কি তাঁর যত কিছু সামলাতে হতো লুইজিকেই। কেনাকাটার জন্য লুইজি বাজারে বেরোলেই এটা তিনি হাড়ে-হাড়েই টের পেতেন। 'টেলিফোন!' চেঁচিয়ে উঠত বড় ছেলেটি, আর সঙ্গে সঙ্গেই আঁকার কাজ বন্ধ করতে হতো তাঁকে, ফিরে আসতে না আসতেই অন্য আমন্ত্রণ। ছেলেদের মধ্যে কেউ একজন দরজা খুলে দেওয়ায় সেখান থেকেই মিটার টোকার লোক চেঁচিয়ে উঠত– 'গ্যাসের লোক!' 'আসছি,, আসছি!' আর জোনাস যখন টেলিফোন বা দরজা থেকে ফিরছেন, কোনও বন্ধু বা শিষ্য, কখনও কখনও দুজনেই, বিঘ্নিত আলাপচারিতার বাকিটুকু শেষ করতে ছোট ঘরটার দিকে অনুসরণ করত তাঁকে। ক্রমেই সকলেই তারা সেই হলঘরের নিয়মিত অতিথি হয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে যেত তারা, নিজেদের মধ্যে খোশগল্প করত, সামান্য দূর থেকে জোনাসের মতামত জানতে চাইত, অথবা ভিড় জমাত ছোট্ট সেই ঘরখানিতে। যারা ভেতরে ঢুকত তারা বলত, 'এখানে অন্তত কিঞ্চিৎ দৃশ্যমান আপনি, কোনও রকম বিঘ্ন বাদ দিয়েই।' জোনাসকে স্পর্শ করত এই অভিব্যক্তি। 'ঠিক বলেছ', বলতেন তিনি। 'আসলে, পরস্পরকে দেখার সুযোগ কেউই আমরা কখনোই পাই না।' সেইসঙ্গে এই অভিজ্ঞান ছিল তাঁর, যাদের দেখতে পাচ্ছেন না তিনি, তাদের নিরাশই করছেন এবং এ ভাবনাটাই বিষণ্ন করত তাঁকে। অনেক সময়ই তারা হতো সেই রকমই বন্ধু তাঁর, যাদের সঙ্গে সাক্ষাতে উন্মুখ থাকতেন তিনি। কিন্তু সময় ছিল না, সব কিছুই মেনে নিতে পারতেন না। ফলে, খ্যাতি বিঘ্নিত হতো তাঁর। লোকে বলত, 'অহংকার হয়েছে, কেননা সাফল্য এসেছে। কাউকেই দেখতে পায় না আর সে।' অথবা, 'নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসে না সে।' উঁহু, লুইজিকে তিনি ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন ছেলেদের, রাতু এবং আরও কয়েকজনকে। সকলের জন্যই তাঁর একটা ভালো লাগার ব্যাপার ছিল। কিন্তু জীবন বড় ছোট, সময় দুরন্ত ধাবমান। আর তাঁর নিজের উদ্যমেরও একটা সীমা আছে। জগৎ আর মানুষকে আঁকায় ধরে রাখা আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
একই সঙ্গে তাদের সঙ্গে সহবাস নিশ্চিতভাবে দুরূহ ছিল। অন্যদিকে অভিযোগে অনীহ ছিলেন তিনি, বাধা-বন্ধের ব্যাখ্যাতেও। কারণ, করলেই পিঠে চাপড় মেরে বলত লোকে, 'ভাগ্যবান মানুষ! খ্যাতির এই হলো মূল্য!'

ফল দাঁড়াল, স্তূপাকার হলো তাঁর চিঠি-চাপাটি, শিষ্যদলের চাহিদার কোনও খামতি হলো না, আর শৌখিন সামাজিকেরা ঘিরে ফেলল তাঁর চারপাশ। বলতেই হবে, চিত্রশিল্পে উৎসাহী হওয়ায় এসব মানুষকে সাধুবাদই দিতেন জোনাস। অন্য সকলের মতো এরাও তো ইংলিশ রাজপরিবার অথবা ভোজনবিলাসী পরিভ্রমণ নিয়ে তুঙ্গ উত্তেজনায় কালাতিপাত করতে পারত। সত্যি কথাটি হলো, শৌখিন এই সামাজিকেরা সকলেই মহিলা, সকলেই ব্যবহারে নিতান্ত সরল। নিজেরা কখনোই ছবি কিনত না তারা, শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত বন্ধুদের শুধু এই আশায়, প্রায়ই যা ভিত্তিহীন, তাদের বদলে তারাই কিনবে তাঁর ছবি। অন্যদিকে লুইজিকে সাহায্য করত তারা, বিশেষভাবে অতিথিদের চা পরিবেশনে। হাতে হাতে ঘুরত চায়ের কাপ, রসুই-ঘর থেকে হলঘর ধরে বড় ঘরে চলে যেত, আর তারপর চলে আসত ছোট্ট স্টুডিওর আশ্রয়ে, যেখানে জোনাস, এক মুঠো বন্ধু আর আগন্তুকের মধ্যখানে, ঘরখানি ভরে দিতে যথেষ্টই যা, এঁকেই চলেছেন যতক্ষণ না হাতের বুরুশ নামিয়ে রেখে সকৃতজ্ঞ চিত্তে কাপটি তুলে নিতে হচ্ছে তাঁকে, দৃষ্টিনন্দন এক যুবতী, বিশেষ করে তাঁরই জন্য, চা ঢেলে দিয়েছে যখন সেখানে।

চায়ে চুমুক দেন তিনি, ইজেলে জনৈক শিষ্য যে রেখা-চিত্রটি তুলে ধরছে সেটি তাকিয়ে দেখেন, বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি করেন, গত রাতে যে একগাদা চিঠি লিখে ফেলেছেন তিনি, তাদেরই কাউকে সেগুলো পোস্ট করে দেবার জন্য বলতে গিয়ে হাসি থামান, দ্বিতীয় সন্তানটিকে তুলে নেন, পড়ে গিয়েছিলেন শিশুটি, হোঁচট খেয়ে, ফটোর জন্য পোজ নেন, আর তারপরেই 'জোনাস, টেলিফোন!' শুনেই শূন্যে হাত তুলে কাপ নাড়ান, হলের ভেতরে দাঁড়ানো ভিড়ের ভেতর দিয়ে অনেকানেক ক্ষমাপ্রার্থনার কথা বলে পথ করে নেন নিজের, ফিরে আসেন, ছবিটার এক কোণে জায়গা করে নেন, দৃষ্টিনন্দন সেই যুবতীর পোর্ট্রেট আঁকতে তিনি যে খুবই খুশি হবেন সেই কথা বলতে থামেন, নিজের ইজেলে অভিনিবিষ্ট হন আবার। কাজ করতে করতেই, 'জোনাস! একটা সই!' কী এটা, রেজিস্ট্রি চিঠি?' 'না, কাশ্মীরের কারাবন্দিরা।' 'আসছি!' তক্ষুনি দরজার দিকে দৌড়বেন তিনি বন্দিদের এক যুবক বন্ধুকে স্বাগত জানাতে এবং তার প্রতিবাদ শুনতে, এর ভেতরে রাজনীতি আছে কি না তাই নিয়ে চিন্তিত হবেন সামান্য এবং সেদিক থেকে চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি পাবার পর শিল্পী হিসেবে তাঁর স্বাধিকার থেকে অবিচ্ছেদ্য কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে জোরালো প্রতিবাদ রেখে স্বাক্ষর দেবেন এবং অন্তত পুনরাবির্ভূত হবেন, কারও নাম স্মরণে আনতে না পারলেও, কেবলই একজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্প্রতি বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা অথবা কোনও এক বিদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। নাট্যকারটি পাঁচ মিনিট মুখোমুখি দাঁড়াবে তাঁর, চোখের ভাষাতেই প্রকাশ করবে তার হৃদয়াবেগ, ফরাসি-অনভিজ্ঞ তার পক্ষে এর চেয়ে স্বচ্ছতর আত্মপ্রকাশ সম্ভব ছিল না, আর, আহেলি ভ্রাতৃত্ববোধে মাথাখানি ঝাঁকাবেন তখন জোনাস। এ রকম ন-যযৌ-ন-তস্থৌ অবস্থা থেকে, সৌভাগ্যবশত, সহসাই নিষ্কৃতি ঘটবে তাঁর যখন মঞ্চের সর্বাধুনিক এক দাপুটে ব্যক্তিত্ব মস্ত এই শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হবে বলে ঢুকে পড়বে ভেতরে। জোনাস বলবেন, আনন্দিত তিনি, সত্যিই তাই, পকেটের ভেতরে অনুভব করবেন জবাব-না-দেওয়া চিঠির গুচ্ছ, বুরুশ তুলে নেবেন হাতে, ছবির একটা অংশ আঁকতে প্রস্তুত হবেন, কিন্তু প্রথমেই এই মাত্র এক জোড়া শিকারি কুকুর তাঁর জন্য নিয়ে এসেছেন যিনি, ধন্যবাদ জানাতে হবে তাঁকে, শোবার বড় ঘরে গিয়ে বন্ধ করে রেখে আসতে হবে তাদের, ফিরে আসবেন সেই মহিলা-দাতার দুপুরের আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে, ফিরে যেতে হবে দৌড়েই ফের লুইজির ডাকে নিজের চোখেই দেখে আসতে, সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ না রেখে যে অ্যাপার্টমেন্টের জীবনে আদৌ অভ্যস্ত হয়নি সারমেয়গুলো, নিয়ে যাবেন তাদের স্নানের ঘরে, যেখানে এমন তারস্বরে চেঁচাতে থাকবে তারা যে শেষমেশ কেউই আর শুনতেও পাবে না তাদের গলা। প্রতিমুহূর্তে, অতিথিদের মাথার ওপর দিয়ে একবার করে লুইজির চোখের দিকে তাকাবেন জোনাস, আর তাঁর মনে হবে বড় বিষণ্ন সেই দৃষ্টি। অবশেষে, শেষ হবে দিন, অতিথিরা বিদায় নেবে, অন্যরা বড় ঘরে থেকে যাবে, আর লুইজি যখন ছেলেদের বিছানায় শুইয়ে দেবে, আবেগপ্রবণ হয়ে উঠবে তারা, লুইজিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সম্ভ্রান্ত সাড়ম্বর পোশাকের এক মহিলা, নিজের বিলাসবহুল বাড়িতে, দুটি তলা নিয়ে বিস্তৃত যা, যেখানে জীবন ঘনিষ্ঠ আর ঘরোয়া নয় তেমন এই জোনাসদের মতো, ফিরে যেতে হবে বলে অনুযোগ করবে।

শনিবারের এক বিকেলে রাতু অভিনব একটি কাপড় শুকোবার যন্ত্র নিয়ে এল, রান্নাঘরের সিলিংয়েই স্ক্রু দিয়ে আটকানো যেতে পারে যাকে। ফ্ল্যাটটা লোকের ভিড়ে একেবারেই ঠাসা দেখতে পেল সে। ছোট্ট ঘরটায় শিল্প-রসিক-পরিবৃত জোনাস সেই মহিলার পোর্ট্রেট আঁকছেন, যিনি তাঁকে কুকুর উপহার দিয়েছিলেন। অন্যদিকে তাঁকেই আঁকছে একজন বেতনভুক্ত শিল্পী। লুইজির কথায়, সরকারি নির্দেশেই সেই শিল্পী কাজটি করছেন। এর নামকরণ হবে 'কারুমগ্ন শিল্পী'। বন্ধুকে নজরদারির জন্য রাতু ঘরের একটি কোণে আশ্রয় নিল। বন্ধু মগ্ন তাঁর শিল্প-প্রয়াসে। একজন শিল্প-রসিক, রাতুকে যে ইতিপূর্বে দেখেনি, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'বেশ দেখাচ্ছে ওঁকে, তাই না?' রাতু জবাব দিল না। 'মনে হচ্ছে আপনিও আঁকেন?' বলল সে আবার। 'আমিও আঁকি। তাহলে শুনুন বলি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ওঁর এখন পড়তির মুখ।' 'এর মধ্যেই?' রাতু প্রশ্ন করে। 'হ্যাঁ। এই হলো সাফল্য। সাফল্য অপ্রতিরোধ্য। শেষ হয়ে গেছে সে।' 'পড়তির মুখে তিনি, নাকি শেষ হয়ে গেছেন একেবারে?' 'পড়তির মুখে যে শিল্পী, তিনি তো শেষই হয়ে গেছেন। এই তো দেখুন না, ভেতরে আঁকার মতো আর কিছু নেই তাঁর। নিজেই তিনি অঙ্কিত হচ্ছেন, ঝোলানো থাকবেন কোনও মিউজিয়ামে।'

পরে, মাঝরাতে, লুইজি, রাতু আর জোনাস– জোনাস দাঁড়িয়ে আর বাকি দুজন বিছানার এক কোণে বসে– একেবারে নির্বাক। ছেলেরা ঘুমোচ্ছিল, লুইজি সরে বাসন-পত্তর ধুয়েছে, রাতু আর জোনাস মোছামুছি করছে সেগুলো। ভালো রকমই ক্লান্তি বোধ করছিল তারা। 'একজন কাজের মেয়ে নাও না কেন?' বাসন-পত্তরের ডাঁই দেখে রাতু জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু বিষণ্ন গলায় লুইজি বলেছিল, 'কোথায় থাকতে দেব তাকে আমরা?' অতএব কথা ছিল না তাদের। 'সুখী তোমরা?' হঠাৎ-ই শুধোল রাতু। হাসলেন জোনাস, ক্লান্ত দেখাল তাঁকে। 'হ্যাঁ। সকলেই তো আমার প্রতি সদয়।' 'না', রাতু বলল। 'নজর করে দেখ। সকলেই ভালো নয় তারা।' 'কে নয়?' 'ধরো না, শিল্পী বন্ধুরাই তোমার!' 'জানি', বললেন জোনাস। 'অনেক শিল্পীই কিন্তু ওই রকম। যাঁরা আছেন, তাঁদের সম্পর্কে নিশ্চিত নয় তারা, এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর সম্পর্কেও নয়। সেই কারণেই প্রমাণ খুঁজে বেড়ায় তারা, বিচার করে, শাস্তি দেয়। সেটাই শক্তি জোগায় তাদের; অস্তিত্বের এটাই হলো শুরু। এমনই নিঃসঙ্গ তারা!' রাতু মাথা ঝাঁকাল। 'আমার কথা শোনো', জোনাস বললেন, 'আমি তাদের জানি। তাদের ভালোবাসতেই হবে।' 'আর তোমার কী ব্যাপার?' রাতু শুধোল। 'তুমি কি সত্যিই আছ? কারও সম্পর্কেও তো কখনোই মন্দ বলো না তুমি।' হাসতে শুরু করলেন জোনাস। 'ওহ! প্রায়ই তাদের সম্পর্কে মন্দ ভাবি আমি। কিন্তু ভুলে যাই আবার।' গম্ভীর হলেন তিনি। 'না, আমার অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিত নই আমি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, একদিন আমি থাকব।'

রাতু লুইজির অভিমত জানতে চাইল। ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে জানাল সে, তার মতে জোনাসই ঠিক– তাদের অতিথিদের মতামতের কোনও মূল্যই নেই। জোনাসের কাজটাই হলো আসল। আর জানাই ছিল তার যে ছেলে বড় হচ্ছে। বড় হচ্ছে বলেই আলাদা একটা খাট কিনতে হবে। অনেকটা জায়গা নিয়ে নেবে এই খাট। আর একটা বড় অ্যাপার্টমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত কী-ই বা করতে পারে তারা? বড় শোবার ঘরের দিকে তাকালেন জোনাস। এটা অব্যশই একটা আদর্শ শোবার ঘর নয়। বিছানাটা বিশাল। কিন্তু সারা দিনমান ঘরটা শূন্যই থাকে। লুইজিকে ব্যাপারটা বলতে লুইজি চিন্তা করল। শোবার ঘরে অন্তত জোনাসকে বিরক্ত করবে না কেউ। যাই করুক, ছেলেগুলো তাদের বিছানাতে শুয়ে পড়বে না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্তত। 'তোমার কী মনে হয়' লুইজি এবারে রাতুকেই জিজ্ঞেস করল। রাতু জোনাসের দিকে তাকাল। জোনাস জানালা দিয়ে রাস্তার ওপাশে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর নক্ষত্রহীন আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি, এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা নামিয়ে দিলেন। ফিরে এসে রাতুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, একটি কথাও না বলে বিছানায় তার পাশে এসে বসলেন। লুইজি, দৃশ্যতই বিধ্বস্ত, জানিয়ে দিল স্নানে যাচ্ছে সে। দুই বন্ধু যখন একলা, জোনাস অনুভব করলেন রাতুর কাঁধ তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে আছে। রাতুর দিকে তাকালেন না তিনি, কিন্তু বললেন, 'আঁকতে ভালোবাসি আমি। গোটা জীবনটাই, রাত দিন, আঁকতেই চাই আমি। এটা কি ভাগ্যের কথা নয়?' রাতু প্রীতির চোখে তাকাল তাঁর দিকে।

'হ্যা', বলল সে, 'ভাগ্যেরই কথা এটা।'

ছেলেরা বড় হচ্ছিল। তারা সুখী এবং স্বাস্থ্যবান দেখে জোনাস খুশিই ছিলেন। এখন স্কুলে যায় তারা, ফিরে আসে চারটায়। এখনও শনিবার বিকেলে জোনাস সঙ্গ পান তাদের, অথবা বৃহস্পতিবার, প্রায়ই পাওয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী ছুটির দিনেও। নিঃশব্দে খেলা করার মতো যথেষ্ট বড় হয়নি এখনও তারা, কিন্তু তাদের খুনসুটি আর হাসিতে কোনও মতে অ্যাপার্টমেন্টটা ভরিয়ে রাখার মতো। তাঁকেই শান্ত করতে হয় তাদের, ভয় দেখাতে, কখনও-সখনও মারবে, এমন ভাব করতে। কাচাকুচির কাজও থাকে, বোতাম সেলাইয়ের কাজ। সব লুইজি করে উঠতে পারত না। যেহেতু কোনও পরিচারিকা নিতে পারত না তারা, ঘনিষ্ঠ তাদের জীবনচর্যায় আনতে পারত না কাউকে, লুইজির বোন রোজি, একটি বড় মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিল যে, তারই সাহায্য নেবার প্রস্তাব পাড়লেন জোনাস। 'হ্যা', লুইজি বলল, 'রোজিকে নিয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না আমাদের। যখনই চাইব, চলে যাবে সে।' এই সমাধানে খুবই উৎফুল্ল হলেন জোনাস। এটা একদিকে লুইজিকে যেমন স্বস্তি দেবে, অন্যদিকে স্ত্রীর ক্লান্তির অস্বস্তিবোধ থেকেও অব্যাহতি দেবে তাঁকে। এই অব্যাহতি তার চেয়েও বড় রকমের ছিল এই কারণে যে প্রায়ই সেই বোন তার মেয়েটিকেও সঙ্গে করে এনে শক্ত করত তার হাত। দুজনেই সোনার মতোই দামি ছিল। তাদের সৎ স্বভাব অধিকার করে ছিল তাদের গুণ আর পরার্থপরতা। সাহায্য করতে গিয়ে যা কিছু করা সম্ভব সবই করত তারা এবং তাদের সময়ের ব্যাপারে কোনও নালিশ ছিল না। তাদের নিঃসঙ্গ জীবনের একঘেয়েমিতে এটা সহায়ক হয়েছিল। লুইজির বাড়ির স্বচ্ছন্দ পরিবেশও তাদের কাছে আনন্দদায়ক হয়েছিল। যেরকম আগেই ভাবা গিয়েছিল, কেউই আটকে ছিল না বাধ্যবাধকতায় এবং দুটি পরিবারই, শুরু থেকেই আন্তরিক ছিল। বড় ঘরটা সাধারণ ঘর হয়ে উঠেছিল, তাৎক্ষণিক খাবার ঘর, পোশাকের ঘর এবং শিশুদের ঘর। ছোট ঘরটা, যেখানে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটি শুত, সেটাই ছবি

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রাখার ঘর হয়েছিল। সেখানেই থাকত একটা ফোল্ডিং বিছানা, যখন মেয়েটি সঙ্গে করে আনত না, সেখানেই ঘুমোত রোজি কখনও-সখনও।

শোবার বড় ঘরটিই জোনাসের দখলে ছিল এবং বিছানা আর জানালার মধ্যবর্তী স্থানটিতেই আঁকার কাজ চলত তাঁর। ছেলেদের ঘর ঠিকঠাক করেই প্রতি সকালে তাঁর ঘরটি ঠিকঠাক করে দেওয়া হতো। জোনাস সেই সময়টুকু অপেক্ষা করতেন। তারপর থেকে একটা বেড-শিট বা তোয়ালে নিতে আসা ছাড়া কেউই তাঁকে আর বিরক্ত করত না। বাড়ির একমাত্র কাবার্ডটি সেই ঘরেই রক্ষিত ছিল। অতিথি যারা, সংখ্যায় যদিও বেশি নয় তেমন, বেশ কিছু অভ্যাস তৈরি করে নিয়েছিল। জোনাসের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় আরও একটা আলগা হবার জন্য দুজনের জন্য সেই শয্যাতেই শুয়ে পড়তে ইতস্তত করত না তারা। লুইজির প্রত্যাশার এটা ছিল ঠিক বিপরীত। ছেলেরাও বাবাকে দেখতে ঢুকে পড়ত ভেতরে। 'এস, ছবি দেখি আমরা।' আঁকা ছবিগুলো জোনাস দেখাতেন তাদের আর স্নেহভরে চুমু খেতেন সকলকে। তাদের পাঠিয়ে দেবার পরে অনুভব করতেন একটুও ফাঁক না রেখে হৃদয় তাঁর পূর্ণ করে দিয়ে গেছে তারা। এরা না থাকলে নিতান্তই শূন্য একা হয়ে যেতেন তিনি। নিজের ছবির মতোই ভালোবাসতেন তাদের, কারণ পৃথিবীতে একমাত্র তারাই ছিল নিজেদের মতো প্রাণোচ্ছল।

তবুও জোনাস পরিশ্রম কমিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর, কেন ঠিক তা না জেনেই। অধ্যবসায়ী ছিলেন তিনি, কিন্তু এখন আঁকতে গেলে কষ্ট হয় তাঁর, এমনকি নির্জনতর মুহূর্তেও। এরকম সময়ে আকাশের দিকে তাকিয়েও কেটে যায় তাঁর। সবসময়ই ভুলো মন, অনায়াসে ডুব দিতেন ভাবনার গভীরে, কিন্তু অধুনা স্বপ্নবিলাসী। ছবি সম্পর্কে ভাবেন তিনি, তাঁর পেশা সম্পর্কে, আঁকার বদলে। 'আঁকতে ভালোবাসি আমি', এখনও বলতেন তিনি স্বগত, আর বুরুশ সমেত হাতখানি ঝুলে থাকত এক পাশে, দূরের কোনও রেডিওতে কানখানি পাতা থাকত তাঁর।

সেই সময়, খ্যাতি তাঁর পড়ন্ত হলো। প্রবন্ধে-নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে বক্রোক্তি, কোনোটা খোলাখুলিই অমিত্রসুলভ এবং কিছু কিছু এতটাই নোংরা যে সেগুলো গভীরভাবে আহত করত তাঁকে। কিন্তু নিজেকে বলতেন তিনি এসব আক্রমণ থেকেই এমন কিছু ভালো সংকেত পেয়ে যাবেন, যা আরও ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করবে তাঁকে। তখনও আসত যারা, আরও ঘনিষ্ঠের মতোই ব্যবহার করত তারা, যেন পুরনো বন্ধু তাঁর, স্বচ্ছন্দ। নিজের কাজে ফিরতে চাইলে তারা বলত, 'ওহ্, চালাও, চালাও! ঢের সময় এখন। 'জোনাস অনুভব করতেন নিজেদের ব্যর্থতার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে ইতিমধ্যেই সঙ্গী করে নিয়েছে তাঁকে তারা। কিন্তু, অন্যদিক থেকে, মনে এই একাত্মতার শুভঙ্কর দিক ছিল একটা। রাতু কাঁধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঝাঁকিয়ে বলত, 'তুমি একটা মূর্খ। তোমাকে একটুও পরোয়া করে না তারা!' 'একটু তারা ভালোবাসে আমাকে এখন', জোনাস উত্তর করতেন। 'এই একটু ভালোবাসাটা বিস্ময়কর। এটা পেলে কী এসে যায় তোমার?' তিনি তাই বকবক করে চলেন, চিঠিপত্র লেখেন এবং সাধ্যমতো ছবি আঁকেন। প্রায়ই, বিশেষ করে রবিবারগুলোতে, লুইজি আর রোজির সঙ্গে ছেলেরা বাইরে গেলে সত্যিই আঁকতেন তিনি। সন্ধে নাগাদ ছবিটা আঁকায় সামান্য এগোতে পেরেছেন দেখে উল্লসিত হতেন। সেই সময় আকাশই আঁকার বিষয় ছিল তাঁর।

সেই বণিকটি যেদিন জানাল যে বিক্রি যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে যাওয়ায় দুঃখিত চিত্তেই পাঠানো টাকার পরিমাণ কমাতে বাধ্য হচ্ছে সে, জোনাস সায় দিলেন তাতে, কিন্তু লুইজির দুশ্চিন্তা বাড়ল। মাসটা ছিল সেপ্টেম্বর আর ছেলেদের স্কুলের পোশাক নতুন করেই করে দিতে হবে। নিজের স্বাভাবিক সাহস নিয়েই কাজ শুরু করে দিল সে, কিন্তু অচিরেই ভেঙে পড়ল। রোজি রিপু কিংবা বোতাম সেলাই করতে পারত, কিন্তু নতুন কিছু করতে পারত না। কিন্তু তার স্বামীর খুড়তুতো বোন পারত। লুইজিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল সে। জোনাসের ঘরের কোণের দিকের একটা চেয়ারে সময়ে সময়ে এসে বসত সে, সেখানেই নিশ্চুপ সেই মহিলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির বসে কাটাত। এতটাই স্থির বসে থাকত যে লুইজি জোনাসকে একজন সীবনরতার ছবি আঁকার প্রস্তাব করল। 'ভালো প্রস্তাব', বললেন জোনাস। চেষ্টা শুরু করলেন তিনি, দুটি ক্যানভাস নষ্ট করলেন, তারপরেই অর্ধসমাপ্ত একটা আকাশের ছবিতে ফিরে গেলেন। পরের দিন অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরেই ঘোরাফেরা করলেন কিছুক্ষণ এবং আঁকার বদলে ভাবলেন গভীরভাবে। একজন শিষ্য, ভয়ানক উত্তেজিত, দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ, যা তিনি অন্য কোনওভাবে দেখতে পেতেন না, দেখাতে নিয়ে এল তাঁকে, যেখান থেকে জানলেন তিনি তাঁর আঁকা ছবি নিয়ে অতিশয়োক্তিই হয়নি শুধু, সেগুলো অনাধুনিকও বটে। বণিকটি টেলিফোন করে বলল তাঁকে বিক্রি পড়ে যাওয়ায় কতখানি চিন্তিত সে। তবুও স্বপ্ন দেখা আর গভীর ভাবনা চালিয়েই যেতে লাগলেন তিনি। শিষ্যটিকে বললেন প্রবন্ধটার কিছু সত্যি আছে, কিন্তু তিনি, জোনাস, ভালো কাজ করার আগামী অনেক বছরের ওপরে এখনও নির্ভর করতে পারেন। বণিকটিকে জানালেন তার দুশ্চিন্তা তিনি বুঝতে পেরেছেন, যদিও তিনি তার শরিক নন। মস্ত একটা কাজ, সত্যিই নতুন ধরনের, করার আছে তাঁর; সব কিছুই নতুন করে শুরু হতে চলেছে আবার। যখন তিনি বলছিলেন একথা, তাঁর অনুভব হলো সত্যি কথাই বলছেন তিনি এবং তাঁর ভাগ্যও সেখানে সহায়ক। তাঁর দরকার শুধু ভালো একটি ব্যবস্থাপনার।

পরবর্তী দিনগুলি হলঘরেই কাজ করবার চেষ্টা করলেন তিনি, দুদিন বাদে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আলো জ্বালিয়ে স্নানের ঘরে এবং পরের দিন রান্নাঘরে। কিন্তু, এই প্রথম, যে-সব মানুষকে সহসাই দেখেছেন তিনি, যারা তাঁর নিতান্তই অচেনা, সেই সব মানুষ এবং তাঁর নিজের প্রিয় পরিবার থেকেই বাধার সম্মুখীন হলেন তিনি। কিছু সময়ের জন্য কাজ স্থগিত রাখলেন এবং মগ্ন হলেন ভাবনায়। আবহাওয়া প্রসন্ন হলে ঘরের বাইরেই নিসর্গচিত্র আঁকতেন তিনি। দুর্ভাগ্য, এটা ছিল সদ্যই শীতের শুরু আর বসন্তের আগে নিসর্গচিত্রাঙ্কন শক্তই ছিল। তবুও চেষ্টা করলেন তিনি, এবং হাল ছাড়লেন। মজ্জায় শীতের কামড় টের পেলেন। ক্যানভাসগুলি নিয়ে অনেকগুলো দিন কাটালেন, প্রায়শই তাদের পাশে বসে থেকে অথবা জানালার সামনে চুপচাপ। আঁকলেন না কিছুই আর। এরপর সকাল হলেই বেরিয়ে পড়াটা অভ্যেসে দাঁড়াল তাঁর। কোনও কিছুর খুঁটিনাটি স্কেচ, একটা গাছ, বেঢপ বাড়ি একটা, চলন্ত কোনও মানুষের চেহারা এইসব কাজেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেন তিনি। দিনের শেষে, কিছুই করা হয় না তাঁর। ন্যূনতম আকর্ষণ যেখানে—খবরের কাগজ, কোনও সাক্ষাৎকার, দোকানের জানালা, কোনও কাফের উষ্ণ-অনুভব—এগুলোই বিপথগামী করতে লাগল তাঁকে। প্রতি সন্ধ্যেয় নাছোড় নষ্ট বিবেকের কাছে বাছাই অজুহাত জুগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। এই আপাত-বিনষ্টির সময় অতিক্রান্ত হলে তিনি যে আঁকতেই চলেছেন, আরও ভালো ছবি, নিশ্চিতই ছিল সেটা। এ-সবই ভেতরে অনুক্ষণ কাজ করে চলেছিল তাঁর, আর সৌভাগ্য যেন মেঘের অন্তরাল থেকে সদ্য স্নান সেরে ঝিলমিলিয়ে আবির্ভূত হবে আবার। ইত্যবসরে কাফেকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি। আবিষ্কার করেছিলেন মদ তাঁকে সেই একই মানসিক সমুন্নতি এনে দেয় ভালো একটি সৃষ্টিশীল দিনের শেষে যে-রকম পেতেন তিনি। সেই সময়টায় যে আত্তি আর উষ্ণতায় নিজের ছবি সম্পর্কে ভাবিত হতেন, নিজের সন্তান ছাড়া আর কিছুতেই ঘটত না সেটা। দ্বিতীয় পেগের পরেই আর্ত সেই আবেগ ফিরে পেতেন তিনি যা তাঁকে একই সঙ্গে গোটা এই বিশ্বের অধীশ্বর এবং দাসে পরিণত করে দিত। পার্থক্য কেবল এই ছিল যে, শূন্যময় ছিল এই উপভোগ, হাত দুটি নিষ্ক্রিয়, কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তবুও, যে আনন্দের জন্যে তাঁর বেঁচে থাকা, এটা ছিল ঘনিষ্ঠতম তার। এখন দীর্ঘ সময় ধোঁয়া আর শব্দের নরকে বসে আর স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দিতেন তিনি।

শিল্পীরা যে সব জায়গা বা সমাজে যাতায়াত করত, সেগুলি তিনি পরিহার করতেন। যখনই কোনও পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত যে তাঁর ছবি নিয়ে কথা বলত তাঁর সঙ্গে, ভয়ে সিঁটিয়ে যেতেন তিনি। পালাবার ফিকির খুঁজতেন, স্বাভাবিকভাবেই, পালিয়েও যেতেন ঠিক। জানতেন তিনি পেছনে কী বলা হয় তাঁর, 'ও ভাবে ও বুঝি রেমব্র্যান্ট', আর বাড়ত তাঁর অস্বস্তি। ফল দাঁড়াল, আর তাঁর হাসি আসত না এবং তাঁর পূর্বতন বন্ধুরা এর থেকে বিশ্রী আর অনিবার্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছোয় 'হাসি যদি তাঁর কাছে ত্যাজ্য হয়ে থাকে, তাহলে কারণটা হল অতিরিক্ত আত্মসন্তুষ্টি'। জানত তারা, ক্রমশই অধরা আর অন্তর্মুখী হয়ে উঠছেন তিনি। কোনও কাফেতে প্রবেশ করেই এই অনুভূতি গ্রাস করত তাঁকে যে কেউ না কেউ সেখানে চিনতে পেরে ভেতরটা বিষণ্ন করে দিচ্ছে তাঁর। মুহূর্তের জন্য, অসহায় আর অদ্ভুত এক দুঃখবোধে প্লাবিত তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন সেখানে, দুর্জ্ঞেয় মুখে তাঁর বিধৃত থাকত অস্বস্তি আর বন্ধুত্বের জন্য ব্যাকুল আর আকস্মিক হাহাকার। রাতুর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি মনে পড়ত তাঁর, দ্রুত ছুটে বেরিয়ে পড়তেন তিনি। 'লোকটার মাতলামিটা দেখ একবার!' একদিন যখন তিনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কাছেই তাঁর কোনও একজনকে বলতে শুনতে পেলেন তিনি।

এখন তিনি বাইরে সেই সব সমাগমেই যেতেন, যেখানে কেউ তাঁকে চেনে না। সেখানে তিনি বাক্যালাপ করতে পারেন, হাসতে পারেন এবং তাঁর সহৃদয়তাও ফিরে এল আবার, কারণ কেউই তাঁর কাছে কিছুই প্রত্যাশা করত না। কয়েকজন বন্ধু হলো তাঁর, যাদের তুষ্ট করা খুব একটা শক্ত ছিল না। তাদের মধ্যে বিশেষ করে একজনের সঙ্গ তাঁর পছন্দ ছিল। একটি স্টেশনের ভোজনশালায় যেখানে প্রায়ই যেতেন তিনি, সে তাঁকে পরিবেশন করত সেখানে। সেই লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, জীবনে কী কাজ তিনি করেছেন। জোনাস বলেছিলেন, আঁকার। 'ছবি আঁকা না ঘর-বাড়ি রং করা?' 'ছবি'। 'ভালো', লোকটি বলেছিল, 'শক্ত কাজ বটে।' বিষয়টা আর কখনও উত্থাপন করেনি তারা। না, সহজ কাজ নয় বটে, কিন্তু জোনাস সব ঠিকঠিক করে নেবেন, নিজের কাজ যে মুহূর্তে গুছিয়ে করার ফিকির খুঁজে পাবেন তিনি।

দিনের পর দিন এবং নিয়মিত মদ্যপানের পর অনেকের সঙ্গেই মোলাকাত হতো তাঁর, মহিলারাও সহায়তা করত। তাদের সঙ্গে গল্প করতে পারতেন তিনি, ভালোবাসাবাসির আগে এবং পরে এবং বিশেষ করে গর্বও হতো কিঞ্চিৎ। কারণ বিশ্বাস না করলেও তারা বুঝতে পারত তাঁকে। সময়ে সময়ে মনে হতো তাঁর, পুরনো শক্তি ফিরে আসছে আবার। একদিন যখন তাঁর পরিচিত মহিলাদের একজন উৎসাহীত করল তাঁকে, মনস্থির করে ফেললেন তিনি। ঘরে ফিরে গেলেন, শোবার ঘরে কাজ করার চেষ্টা করলেন আবার। সীবনশিল্পী অনুপস্থিতি তখন। কিন্তু এর ঘণ্টাখানেক পরেই ক্যানভাস সরিয়ে রাখলেন তিনি, না দেখেই লুইজির দিকে হাসলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। সারা দিন ধরে শুধুই পান করলেন তিনি, আর রাত কাটালেন সেই পরিচিতার সঙ্গে, যদিও কোনও অবস্থাতেই তাকে পাবার ইচ্ছে অবশিষ্ট ছিল না তাঁর। প্রভাতে বিধ্বস্ত মুখের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি লুইজির চোখে ধরা পড়ে গেল। জানতে চাইল সে সেই মেয়েটির সঙ্গ তিনি করেছেন কি না। জোনাস বললেন, মাতাল ছিলেন তিনি, তাই করেননি, কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আগে অন্যদের সঙ্গ তিনি করেছেন। আর, এই প্রথম, ভেতরে হৃদয় বিদীর্ণ হলো তাঁর, দেখলেন তিনি সহসা লুইজির চাহনি ডুবন্ত মেয়েমানুষের মতো দেখাল, বিস্ময় আর তীব্র যন্ত্রণা থেকেই যার জন্ম। হঠাৎই সংবিতে ফিরলেন তিনি, এই সময়টা লুইজির কথা তিনি আদৌ ভাবেননি। লজ্জিত বোধ করলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন লুইজির কাছে, চুকেবুকে গেছে সব, পুরনো দিনের মতোই সব কিছুই কাল সকাল থেকে শুরু হবে আবার। কথা সরল না লুইজির, চোখের জল আড়াল করতে চলে গেল সে।

পরের দিন খুব সকালেই বেরিয়ে পড়লেন জোনাস। বৃষ্টি পড়ছিল। ফিরে এলেন যখন কাক-ভেজা হয়ে, কাঠের তৈরি বোর্ডের ভারে ন্যুব্জ তিনি তখন। বাড়িতে বড় ঘরের ভেতরে পুরনো দুই বন্ধু কফি খাচ্ছিল। 'জোনাস নিজের শিল্পরীতি বদলাচ্ছে। কাঠের ওপরে আঁকতে চলেছে সে!' বলল তারা। জোনাস হাসলেন। 'ঠিক তা নয়। কিন্তু নতুন কিছু শুরু করতে চলেছি আমি।' স্নানঘর, পায়খানা এবং রান্নাঘরের সংলগ্ন ছোট হলের ভেতরে গেলেন তিনি। দুটি হল সমকোণে মিশেছে যেখানে, থামলেন সেখানে এবং অনেকক্ষণ ধরেই অন্ধকার সিলিং-এর দিকে উঠে যাওয়া উঁচু দেয়ালগুলো পর্যবেক্ষণ করলেন। একটা মইয়ের দরকার ছিল তাঁর। নিচে নেমে গিয়ে প্রহরীর কাছ থেকে নিয়ে এলেন সেটা।

তিনি ফিরে এলে অ্যাপার্টমেন্টে তখন অনেক অতিরিক্ত মানুষ। আবার তাঁর দেখা মেলায় হৃষ্ট অতিথিদের অনুরাগ কষ্ট করে পাশ কাটিয়ে এবং তাঁর পরিবারের প্রশ্নও অগ্রাহ্য করে হলের প্রত্যন্তে পৌঁছতে এগোলেন তিনি। সেই মুহূর্তে রান্নাঘর থেকে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এল। মইটাকে ঠিকভাবে রেখে জোনাস নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন তাকে। লুইজি তাকাল তাঁর দিকে। 'প্লিজ', বলল সে, 'আর কখনও করো না এমন।' 'না, না', জোনাস বললেন, 'আমি আঁকতে চলেছি। আমাকে আঁকতেই হবে।' কিন্তু মনে হলো স্বগতোক্তিই করছেন তিনি, কারণ তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্যত্র। কাজে লেগে গেলেন তিনি। দেয়ালের মাঝ বরাবর একটা মেঝে বানালেন, কিছুটা সংকীর্ণ, কিন্তু উঁচু আর গভীর একটা লফ্‌ট পেতে। শেষ বিকেলেই তৈরি হয়ে গেল সবটা। মইয়ের সাহায্যে লফ্‌টের মেঝে ধরে ঝুলে পড়লেন জোনাস এবং কাজটা কতটা টেকসই হয়েছে দেখতে চিবুক নামিয়ে ঝাঁকি দিলেন বার কয়েক। তারপরেই সকলের সঙ্গে মিলে গেলেন তিনি। তাঁকে আবার এত বন্ধুবৎসল দেখে খুশি হলো সবাই। সন্ধেবেলা, অ্যাপার্টমেন্ট যখন তুলনামূলকভাবে ফাঁকা, একটা প্রদীপ, একটা চেয়ার, একটা টুল আর একটা ফ্রেম নিলেন জোনাস। তিনজন মহিলা এবং ছেলেদের বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে এই সব নিয়ে লফ্‌টে উঠলেন তিনি। 'এবারে', উঁচু তাঁর পাটাতন থেকে বললেন, 'কারও অসুবিধা সৃষ্টি না করেই কাজ করতে পারব আমি।' লুইজি শুধোল তাঁকে, এ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সম্পর্কে নিশ্চিত কি না তিনি। 'অবশ্যই', জবাব দিলেন তিনি। 'বেশি জায়গার দরকার নেই আমার। অনেক বেশি স্বাধীনতা থাকবে আমার। অনেক মহৎ শিল্পী আছেন মোমবাতির আলোতেই আঁকার কাজ করেছেন যাঁরা, আর । 'মেঝেটা কি যথেষ্ট পোক্ত?' ঠিক তাই। 'ভেব না', জোনাস বললেন, 'একটা ভারি ভালো সমাধান এটা।' এবং নেমে এলেন তিনি আবার।

পরদিন কাক-ভোরে লফ্‌টে উঠে পড়লেন তিনি, বসলেন সেখানে, দেয়াল-ঘেঁষে টুলের ওপরে। ফ্রেমটা রাখলেন, আর অপেক্ষা করতে লাগলেন, প্রদীপ না জ্বালিয়েই। কেবল রান্নাঘর কিংবা পায়খানা থেকেই সরাসরি শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। আর সব শব্দই দূরের বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। কারও আসা, দরজায় ডোর-বেল বেজে ওঠা এবং টেলিফোন, ভেতরে আসা-যাওয়া, কথাবার্তা, অস্পষ্ট পৌঁছচ্ছিল তাঁর কানে, বাইরের রাস্তা কিংবা অন্য কোনও অট্টালিকা থেকে সেসব শব্দ ভেসে আসছিল যেন। তাছাড়া গোটা সেই অ্যাপার্টমেন্টটাই চোখ- ধাঁধানো সূর্যালোকে ভেসে যাচ্ছিল যদিও, লফ্‌টের ভেতরে স্থির হয়ে ছিল অন্ধকার। 'ওখানে কী করছ তুমি, জোনাস?' 'কাজ করছি।' 'আলো ছাড়াই?' 'হ্যাঁ, একটুক্ষণের জন্য।' আঁকছিলেন না তিনি, ভাবনায় ডুবে ছিলেন। এই আঁধার কিংবা খণ্ড নৈঃশব্দ্য, আগের অভিজ্ঞতার তুলনায়, মরুভূমি কিংবা সমাধি-মন্দিরের নৈঃশব্দ্য বলে প্রতিভাত হলো তাঁর কাছে, নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দই যেন শ্রুতিগোচর হলো তাঁর। লফ্‌টে যে শব্দ পৌঁছচ্ছিল তা যেন তাঁকে আর স্পর্শই করছিল না, এমনকি যদি তাঁর উদ্দিষ্ট তিনিই হয়ে থাকেন। তিনি যেন সেসব মানুষেরই মতো, ঘুমের ভেতরেই একাকী মৃত্যু ঘটে যাদের, আর সকাল হলে টেলিফোন বেজে চলে, জ্বরো রোগীর মতো নাছোড়, কোনও এক নির্জন আবাসে, একটি মানবদেহ চিরদিনের মতো বধির হয়ে পড়ে আছে যেখানে। কিন্তু তিনি তো বেঁচে আছেন, নিজের গহনে এই নৈঃশব্দ্য শুনতে পাচ্ছেন তিনি, সৌভাগ্য ফিরে আসবে বলে অপেক্ষা করে আছেন, হোক না সে অলক্ষ্য এখনও, উদয় তার অবশ্যম্ভাবী, অবশেষে বিস্ফোরিত হবে, অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয়, এখনকার বিশৃঙ্খল শূন্য এই দিনগুলোকে ছাপিয়ে। 'ওঠ, ওঠ', বললেন তিনি। 'তোমার আলো থেকে বঞ্চিত করো না আমাকে।' সৌভাগ্য যে ঝিকিয়ে উঠবে নিঃসন্দেহ ছিলেন তিনি। কিন্তু আরও দীর্ঘ সময় ভাবনায় ডুবে থাকতে হবে তাঁকে, কারণ পরিবার থেকে অবিচ্ছিন্ন থেকেও একাকী হবার সুযোগ তিনি পেয়ে গেছেন অবশেষে। এখনো স্বচ্ছভাবে যা তাঁর বুঝে ওঠা হয়নি, আবিষ্কার করতে হবে তাকে, যদিও অনুক্ষণ তা জানা ছিল তাঁর, আর জানতেন বলেই যেন নিয়তই ছবিতে বিম্বিত হয়েছে তা। অবশেষে নিগূঢ় সেই তাতেই স্পর্শ করতে হবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাঁকে, যেটা কেবল শিল্পেরই সত্য নয়, যা এখন সুস্পষ্ট তাঁর কাছে। সে কারণেই প্রদীপটা জ্বালাননি তিনি।

এখন রোজই ফিরে যান তাঁর লফ্‌টে। অতিথির সংখ্যা কমে গেছে, কারণ কাজে ব্যস্ত থাকায় কথাবার্তায় মন দিতে পারত না লুইজি। খাবার খেতে নিচে নামতেন জোনাস এবং আবার উঠে যেতেন সেই ওপরে। সারা দিনমান অন্ধকারে নিশ্চল বসে থাকতেন তিনি। রাতে স্ত্রীর কাছে ফিরতেন, স্ত্রী তখন শুয়ে পড়েছে। কদিন বাদে লুইজিকে তাঁর দুপুরের খাবার ওপরেই তুলে দিতে বললেন। এত কষ্ট করেই লুইজিকে তা করতে হলো যে জোনাস শিহরিত হলেন। অন্য সময়ে যাতে তাকে বিরক্ত করতে না হয়, সেই ভেবে এমন কিছু তাকে তিনি তৈরি করে দিতে বললেন যা তিনি লফ্‌টেই মজুদ করে রাখতে পারেন। ক্রমেই সারাদিনে নামার আর কোনও উপলক্ষই রইল না তাঁর। কিন্তু কদাচিৎ তিনি তাঁর খাবার ছুঁয়ে দেখতেন।

একদিন সন্ধেবেলা লুইজিকে ডেকে কয়েকটি কম্বল চাইলেন তিনি। 'রাতটা আমি এখানেই কাটাব।' পেছনের দিকে মাথাটাকে হেলিয়ে লুইজি তাকাল তাঁর দিকে। বলার জন্য মুখ খুললেও কিছুই বলল না সে। চিন্তিত বিষণ্ন দৃষ্টিতে জোনাসকে খুঁটিয়ে দেখছিল সে কেবল। সহসাই দেখলেন জোনাস, কতটাই বুড়িয়ে গিয়েছে লুইজি আর কত গভীরভাবেই না তাদের জীবন-যন্ত্রণা কুরে খেয়েছে তাকে। তাঁর মনে হলো, লুইজিকে সত্যিই বুঝি কখনও দেখাশোনা করেননি তিনি। কিন্তু তাঁর কিছু বলার আগেই এমন করুণ হাসল সে, মুচড়ে উঠল জোনাসের হৃদয়। 'যেমন বলবে তুমি, প্রিয়,' বলল সে।

তখন থেকে লফ্‌টেই রাত কাটাতে লাগলেন তিনি, নামতেনই না কখনো প্রায় আর। ফলে, অ্যাপার্টমেন্টে অতিথি সমাগম শূন্য হয়ে গেল, কেননা দিনে বা রাতে জোনাসকে আর দেখা যেত না। কাউকে বলা হলো দেশে গেছেন তিনি; অন্যদের মিথ্যে বলা যখন কষ্টকর হতো, বলা হলো, একটা স্টুডিও করেছেন তিনি। একা রাতুই শুধু আসত নিয়মিত। যতক্ষণ না বন্ধুতামাখা মস্ত মাথাখানি তার লফ্‌টের মেঝের ঠিক ওপর পর্যন্ত পৌঁছত, মই বেয়ে ওপরে উঠে যেত সে। 'চলছে কেমন?' শুধোত সে। 'চমৎকার'। 'তুমি কি কাজ করছ?' 'ও-ই হলো।' 'কিন্তু তোমার তো ক্যানভাস নেই কোনও!' 'ওই একই কাজ করছি আমি।' মই থেকে লফটে এই বাক্যালাপ চালিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। রাতু মাথা ঝাঁকাত তার, নেমে আসত ফের, তারপর, মই বেয়ে ওপরে না উঠেই জোনাসকে শুভরাত্রি জানালে অন্ধকার থেকেই উত্তর করত জোনাস, 'দেখা হবে, বন্ধু আমার।' এক সন্ধেয় শুভরাত্রির সঙ্গে ধন্যবাদ কথাটিও যোগ করলেন জোনাস। 'ধন্যবাদ কেন?' 'কারণ তুমি ভালোবাস আমায়।' 'এটা একটা খবরই বটে!' যেতে যেতেই বলল রাতু।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর এক সন্ধেয় রাতুকে ডাকল জোনাস। রাতু দৌড়ে এল। এই প্রথম প্রদীপখানি জ্বালানো হয়েছে। লফ্‌ট থেকে ঝুঁকেছিলেন জোনাস, দুচোখে ব্যগ্র দৃষ্টি। 'একটা ক্যানভাস দাও আমাকে।' বললেন তিনি। 'কিন্তু কী হয়েছে তোমার? কী রোগা হয়ে গেছ তুমি, একটা অশরীরীর মতো দেখাচ্ছে তোমাকে।' 'গত দুদিন আমি প্রায় কিছুই খাইনি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমাকে কাজ করতে হবে।' 'আগে খেয়ে নাও।' 'না, খিদে নেই আমার।' রাতু একটা ক্যানভাস এনে দিল। লফটে অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে জোনাস বললেন, 'ওরা কেমন আছে?' 'কারা?' 'লুইজি আর ছেলেরা।' 'ওরা ভালো আছে। আরও ভালো থাকত যদি তুমি সঙ্গে থাকতে ওদের।' 'আমি ওদের সঙ্গেই আছি। ওদের বলে দাও সব কিছুর ওপরে ওদের সঙ্গেই আছি আমি এখনও।' এই বলে অদৃশ্য হলেন তিনি। রাতু ফিরে এল এবং লুইজিকে জানাল কী ভীষণ চিন্তিত সে। লুইজি স্বীকার করল বেশ কিছুদিন ধরে নিজেও সে উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছে। 'কী করতে পারি আমরা? ওহ্, ওর জায়গায় কাজটা যদি আমিই করতে পারতাম!' রাতুর মুখোমুখি হলো লুইজি, একেবারে বিধ্বস্ত। 'ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না', বলল সে। তাকে ঠিক সেই কিশোরী বালিকাটির মতো দেখাল, অবাক রাতু। হঠাৎই বুঝতে পারল সে, লুইজি লজ্জা পেয়েছে।

সারারাত– সকাল পর্যন্ত প্রদীপ জ্বলেই গেল। রাতু কিংবা লুইজি, যে কেউ এলে জোনাসের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'ভুলে যাও, কাজ করছি আমি।' দুপুরের দিকে তিনি কিছু কেরোসিন চাইলেন। সেই প্রদীপটা, ধোঁয়া বেরোচ্ছিল যা থেকে, সন্ধে পর্যন্ত আবার জ্বলতে থাকল উজ্জ্বল। লুইজি আর ছেলেদের সঙ্গে নৈশাহার পর্যন্ত থেকে গেল রাতু। মাঝরাতে জোনাসকে শুভরাত্রি জানাতে গেল সে। আলোচিত সেই লফ্‌টের নিচে একটু অপেক্ষা করল, তারপর কিছু না বলেই চলে গেল। দ্বিতীয় দিনের সকালেই ঘুম ভেঙে লুইজি দেখল প্রদীপটা তখনও জ্বলছে।

সুন্দর একটা দিন ফুঠে উঠছিল, কিন্তু জোনাসের হুঁশ ছিল না। দেয়ালের গায়ে, ক্যানভাসটা সরিয়ে রেখেছেন তিনি। পরিশ্রান্ত, নিঃশব্দে বসে ছিলেন সেইখানে, দু হাঁটুর ওপরে হাতের চেটো উলটে রেখে। নিজেকেই বললেন তিনি, এইবার আর কাজ নয় কখনও। সুখী বলে মনে হলো নিজেকে তাঁর। ছেলেদের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে পেলেন তিনি, জলের শব্দ, বাসন-কোসনের ঝনঝন। কথা বলছিল লুইজি। দোকানগুলোর দিকে একটা ট্রাক চলে যেতে বিশাল জানালাগুলোয় খটখট শব্দ হলো। পৃথিবীটা সেখানেই থেকে গেছে, তরুণী আর প্রেমময়ী। মানুষের ভেতর থেকে উত্থিত স্বগত মর্মর শুনতে পেলেন জোনাস। এত দূর থেকে অন্তর্গত আনন্দময় সেই প্রেরণার মুক্ত টাটকা এক বাতাসে তাঁর শিল্প, তাঁর বহুকালের সংগোপন মূক যে ভাবনাগুলো সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তাঁকে, প্রতিকূল মনে হলো না তাঁর। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ছেলেরা ছুটাছুটি করছিল, ছোট্ট মেয়েটি হাসছিল, লুইজি নিজেও, কতদিন যে হাসিটুকু শোনা হয়নি তাঁর। তিনি তাদের ভালোবাসেন! কত যে ভালোবাসেন! প্রদীপটা নিভিয়ে দিলেন তিনি, আর সহসা প্রত্যাবৃত্ত সেই আঁধারে, সেখানেই ঠিক, সৌভাগ্যের সেই তারাখানি, জ্বলছিল নাকি তখনও? এটা সেই তারা, সকৃতজ্ঞ চিত্তে চিনতে পারলেন, আর তারপর, নিঃশব্দেই পড়ে গেলেন যখন তখনও তাকিয়ে ছিলেন সেদিকেই তিনি।

যে ডাক্তারকে ডেকেছিল তারা, একটু বাদে জানাল সে, 'এটা কিছুই নয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই উঠে দাঁড়াবেন তিনি আবার।' 'আপনি কি নিশ্চিত, ভালো হয়ে উঠবেন তিনি?' লুইজি জিজ্ঞেস করল। মুখের চেহারা ভাঙাচোরা তার। 'ভালো হয়ে যাবেন।' অন্য ঘরে, রাতু তাকিয়ে দেখছিল ক্যানভাসটি, একেবারে শূন্য, মাঝখানে নিতান্তই খুদে অক্ষরে একটাই শব্দ লিখে রেখেছেন কেবল জোনাস, যার পাঠোদ্ধার সম্ভব হলেও নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না সেটা 'নির্জনতা', নাকি 'নির্ভরতা'।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বর্ধিষ্ণু শিলাখণ্ড

লাল বেলে-পাথরের কাঁচা-পথের বাঁকে, এখন যা কাদা-মাটির দলা, বেমক্কা ঘুরে গেল গাড়িটা। হেডলাইট দুটো হঠাৎই খুঁজে বের করল অন্ধকারে– প্রথমে পথের এক পাশে, পরে অন্য পাশে– টিনের ছাউনি-ঢাকা কাঠের দুটি কুটির। ডানদিকে, দ্বিতীয় কুটিরের কাছে, অল্প কুয়াশায়, অমসৃণ খাম্বার ওপরে একটি নজর-কুঠি দেখা যাচ্ছিল। নজর-কুঠির চুড়ো থেকে ধাতব একটা তার, শুরুর জায়গাটা দৃশ্যমান নয়, পথটাকে আড়াআড়ি আটকে-দেওয়া বাঁধের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে, গড়িয়ে নামার সময় ঝিকিয়ে উঠল সে গাড়িরই আলোয়। গতি কমাল গাড়িটা, থমকে দাঁড়াল কুঁড়েঘর দুটির কয়েক গজের মধ্যেই।

চালকের ডান পাশের আসন থেকে যে মানুষটিকে উঠতে দেখা গেল, গাড়ি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে মেহনত করতে হলো তাঁকে। উঠে দাঁড়ালে, মস্ত, প্রশস্ত তাঁর অবয়ব কাত হলা সামান্য। গাড়ির পার্শ্ববর্তী ছায়ায়, ভূমিতলে দৃঢ় পায়ে দণ্ডায়মান এবং ক্লান্তিতে অবসন্ন তাঁকে মনে হলো অলস মোটরের শব্দই শুনছেন বুঝি বা। তারপর বাঁধের দিকেই হেঁটে গেলেন তিনি আর হেডলাইটের আলোর শঙ্কুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঢালের একেবারে মাথায় গিয়ে থামলেন, অন্ধকার প্রেক্ষাপটে প্রশস্ত তাঁর পিঠের রূপরেখা ফুটে উঠল। এক মুহূর্ত পরেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। মানুষটি সংকেত করলেন এবং মোটর বন্ধ করে দিল চালকটি। কাঁচা সেই পথ এবং অরণ্যের ওপরে সহসাই ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশাল হিম এব নৈঃশব্দ্য। তখনই শুনতে পাওয়া গেল জলের কলশব্দ।

নিচে নদীর দিকে তাকালেন মানুষটি, প্রসারিত বহতা আঁধারের মতোই দৃশ্যমান যা, কখনও কখনও ঝিকিয়ে উঠছিল অস্পষ্ট আলোয়। অন্য পাড়ে, দূরে আরও, নিশ্চিতভাবেই ছিল ঘনতর চিত্রার্পিত এক আঁধার। নিশ্চল সেই পাড়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালে হলদেটে একটা আলো দেখা যায়– দূরের তেল-লণ্ঠনেরই মতো। সুবিশাল মানুষটি গাড়ির দিকে ফিরলেন এবং মাথা নাড়লেন। গাড়ি-চালক আলো নিভিয়ে দিল, জ্বালল আবার, পর্যায়ক্রমে জ্বালাতে আর নেভাতে লাগল। বাঁধের ওপরে দৃশ্য এবং অদৃশ্য হচ্ছিলেন মানুষটি, যখনই দেখা যাচ্ছিল, প্রতিবারেই দীর্ঘতর এবং বিশালাকায়। হঠাৎই নদীর অপর পাড়ে, অদৃশ্য একটি হাতে একটি লণ্ঠন সামনে-পেছনে বেশ কয়েকবার আন্দোলিত হলো। সেখান থেকে চূড়ান্ত সংকেত পাবার পর গাড়ি-চালক পুরোপুরি নিভিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দিল আলো। গাড়ি আর সেই মানুষটি অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। আলো নিভে গেলে, প্রায়-দৃশ্যমান হলো নদী– অথবা থেকে থেকেই জ্বল-জ্বলে হলো অন্তত দীর্ঘ-তরল কয়েকটি পেশি তার। রাস্তার দুপাশেই আকাশের গা-ঘেঁষে বুনো গাছপালার অন্ধকার স্তূপ, খুবই কাছে যেন, মনে হচ্ছিল। উষ্ণ বাতাসে তখনও লেগে ছিল ঘণ্টাখানেক আগেকার সেই কাঁচা-পথ ভিজিয়েদেওয়া ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ঘনতর হয়ে ছিল আদিম এই বনাঞ্চলের নৈঃশব্দ্য আর বিস্তৃত পরিচ্ছন্নতার স্থবিরতা। কৃষ্ণবর্ণ আকাশে অস্পষ্ট নক্ষত্রের ঝিকিমিকি।

কিন্তু অন্য পাড় থেকে শৃঙ্খল আর জল-ভাঙার চাপা শব্দ উঠল। কুটিরের ওপর দিকে তখনও অপেক্ষমাণ মানুষটির ডান পাশে ঠিকঠাকই ছড়িয়ে গেল সেই তারটি। ভোঁতা একটা কঁকানি ছড়িয়ে গেল এর সঙ্গে, নদী থেকে উঠে-আসা আন্দোলিত-জলের ক্ষীণ অথচ শ্রুতিযোগ্য একটা ধ্বনির মতো। আরও নিয়মিত হলো সেই কঁকানি, জলের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল আরও, আর যতই বড় দেখাতে লাগল লণ্ঠনটি, স্থানিক অবস্থানটি পরিষ্কার হলো তার। এর হলদেটে জ্যোতি আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে লাগল এখন। পুরুষ্ট বাঁশের খুঁটির ওপরে শুকনো তাল-পাতার চতুষ্কোণ চালার নিচে থেকে কুয়াশায় লণ্ঠনটা যখন জ্বলছিল আর উজ্জ্বলতর হচ্ছিল, সেই জ্যোতিও প্রসারিত এবং সংকুচিত হচ্ছিল। যেমন-তেমন এই আশ্রয়টি, চারপাশে অস্পষ্ট ছায়ার নড়াচড়া যার, শ্লথগতিতে এগোচ্ছিল তীরের দিকে। এটা যখন প্রায় মাঝ-নদীতে, তিনজন খর্বকায় মানুষ, কৃষ্ণবর্ণই প্রায়, হলদে আলোয় পরিষ্কার ফুটে উঠল তাদের অবয়ব। কোমরের উর্ধ্বাংশ অনাবৃত তাদের, মাথায় ছুঁচলো টুপি। দুপা ফাঁক করে স্থির দাঁড়িয়ে ছিল তারা, একটু ঝুঁকেই, অন্ধকার থেকে অবশেষে বেরিয়ে-আসা মস্ত বেঢপ সেই নৌকার গায়ে অদৃশ্য জলরাশির অভিঘাতে বিষম গতিবেগটুকু সামলে নিতেই। নৌকাটা আরও কাছাকাছি এলে স্রোতের দিকে সেই চালার পেছনে দুজন দীর্ঘকায় নিগ্রোকে দেখতে পেলেন মানুষটি, বড়সড় খড়ের টুপির আর সুতোর প্যান্ট ছাড়া তাদেরও পরনে আর কিছু নেই। পাশাপাশি বসে লম্বা দুটি দাঁড়ের ওপরে সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিচ্ছিল তারা, গলুইয়ের দিকে নদী-গর্ভে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল দাঁড়ু দুটি, আর সেই নিগ্রো দুটি একই গতিতে, যতদূর পর্যন্ত ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, ঝুঁকে পড়ছিল জলের ওপরে। নৌকার সামনের দিকে সেই তিন সংকর-বর্ণ মানুষ, নিশ্চল আর নিশ্চুপ, তাদের জন্য অপেক্ষমাণ মানুষটির দিকে চোখ না তুলেই তীর-ভূমির এগিয়ে-আসা লক্ষ করছিল।

একটা কিছুর গায়ে সহসাই ধাক্কা খেল সেই নৌকা। আর সেই ধাক্কায় লণ্ঠনটা জলের ভেতরে প্রক্ষিপ্ত একটা জেটিকে আলোকিত করে তুলল। দাঁড় দুটির প্রান্ত মুঠোয়, মাথার ওপরে দুহাত– স্থির দাঁড়িয়ে ছিল দীর্ঘকায় সেই নিগ্রো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দুটি, দাঁড় দুটি কোনও রকমে ঠেকানো নদীর তলদেশে, কিন্তু সুদৃঢ় তাদের পেশিগুলো একটা গতিময়তায়, যা কিনা সেই জলেরই অভিঘাত-সৃষ্ট বলে মনে হচ্ছিল, হিল্লোলিত হচ্ছিল। অন্য মাল্লারা জেটির ওপরকার খুঁটিগুলোতে চেইন পাকিয়ে দিল, লাফিয়ে পড়ল পাটাতনের ওপরে এবং তক্তার মতো একটা কিছু নামিয়ে দিল, জেটির ঢালের সঙ্গে নৌকাটার মুখটাকে জুড়ে দিল যা।

গাড়িতে ফিরে এলেন সেই মানুষটি, ভেতরে ঢুকে গেলেন, গাড়ি-চালক চাপ দিল স্টার্টার। ধীরে বাঁধের ওপরে উঠে গেল গাড়িটা, আকাশের দিকে বনেটের অভিমুখ, আর তারপরেই ঢালু-পথে নামতে গিয়ে নিম্নাভিমুখী হলো। ব্রেক কষেই সামনের দিকে গড়াল গাড়ি, কাদাতে হড়কেও গেল সামান্য, থেমে গেল, চলল আবার। জেটির ওপরে গড়িয়ে গেল এটা, লাফিয়ে উঠে শব্দ করল পাটাতনের তক্তাগুলো, প্রান্তে পৌঁছল, যেখানে সংকর-বর্ণের মানুষগুলো, তখনও মৌন, দুধারে দণ্ডায়মান এবং ধীরে নৌকার দিকে অগ্রসর হলো। সামনের চাকা দুটি পড়তেই নৌকাটির নাক ডুবে গেল জলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভেসে উঠল আবার, গাড়িটার সম্পূর্ণ ভার তুলে নিতে। গাড়ি-চালক গলুইয়ের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেল গাড়িটা তখন, চৌকোনা ছাউনির সামনে, যেখানে ঝোলানো ছিল লণ্ঠনটা। সংকর-বর্ণের সেই মাল্লারা মুহূর্তে কাত হয়ে পড়া তলটাকে গলুইয়ের সতমলে তুলে দিল ফের। একসঙ্গেই লাফিয়ে পড়ল নৌকায়, কর্দমাক্ত তীরভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে। নৌকার তলায় চাপ পড়ল নদীর এবং জলের উপরিতলে তুলে দিল তাকে, মাথার ওপরকার তারের সমান্তরাল তীরভূমির দীর্ঘ ঢালের শেষ প্রান্তে ভেসে গেল তারপর। দীর্ঘকায় নিগ্রো দুটি সহজ হলো, দাঁড় দুটি ভেতরে নিয়ে এল তাদের। সেই মানুষটি আর গাড়ি-চালক বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে এবং উজান-স্রোতের দিকে নৌকার ধার-ঘেঁষে দাঁড়াবার জন্য এগিয়ে এল। এই নামা-ওঠার ভেতরে কেউই কথা বলেনি, এমনকি এখনও প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গাতেই রয়েছে, স্থির-নিশ্চল এবং নিশ্চুপ, দীর্ঘকায় নিগ্রো দুটির একজন কেবল খসখসে কাগজে সিগারেট পাকাচ্ছিল একটা।

মানুষটা তাকিয়ে ছিলেন সেই ফাঁকের দিকে, যেখানে বিশাল ব্রাজিল-অরণ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে নদীটা এবং ধেয়ে এসেছে তাঁদের দিকে। সেইখানে কয়েকশ গজ চওড়া, কাদা-গোলা মসলিন নদী-জল চাপ দিচ্ছিল নৌকোর পাশে এবং তারপর, নৌকার দু প্রান্তে বাঁক নিচ্ছিল অবলীলায়, তার দুরন্ত নিঃসঙ্গ বন্যার মতো ছড়িয়ে গিয়ে প্রশান্ত বয়ে চলেছিল অন্ধকার অরণ্য আর রাত্রির মধ্য দিয়ে সাগরাভিমুখে। একটা সোঁদা গন্ধ, জল কিংবা স্পঞ্জের মতো আকাশ থেকেই সমুত্থিত, ঝুলে ছিল বাতাসে। নৌকার তলপেটে জলের আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পাওয়া যাচ্ছিল এখন, দু পাড়ে থেকে থেকে কোলা ব্যাঙের ডাক অথবা পাখিদের অদ্ভুত কান্নার শব্দ। বিশাল মানুষটি বেঁটে-খাটো পাতলা গাড়ি-চালকের দিকে এগোলেন, একটা বাঁশের গায়ে ঝুঁকে ছিল তখন সে, হাত-দুটি পিরানের পকেটে, একসময় নীল ছিল যা কিন্তু এখন সারাদিন ধরে তাদের দিকেই বহমান একই সেই লাল ধুলোয় সমাচ্ছন্ন। একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে তার, বয়সে নবীন হলেও বলিরেখা-পূর্ণ সে মুখ। সত্যি সত্যিই তাঁদের দিকে দৃকপাত না করে ভেজা আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ানো অস্পষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে ছিল সে একদৃষ্টে।

কিন্তু পাখিদের চিৎকার তীক্ষ্নতর হলো, অপরিচিত কলকাকলি মিশে গেল তার সঙ্গে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাছির তারে শব্দ উঠল কঁকানির। দীর্ঘকায় নিগ্রো দুটি জলের ভেতরে ছুড়ে দিল দাঁড় দুটি এবং মাটির জন্য অন্ধভাবে হাতড়াতে থাকল। যে পাড়টি এইমাত্র ছেড়ে এসেছেন তাঁরা, সেদিকেই ঘুরে দাঁড়ালেন সেই মানুষটি। জল আর অন্ধকারে তীর-ভূমি অবলীন এখন, হাজার হাজার কিলোমিটার ছড়িয়ে-থাকা আরণ্যক মহাদেশের মতোই বিশাল আর বন্য। অদূর-সমুদ্র আর এই অরণ্য-বিস্তারের মাঝখানে এই মুহূর্তে বন্য এক নদীতে ভাসমান গুটিকয়েক মানুষ, মনে হলো, পথভ্রষ্ট বুঝি বা। নৌকাটি নতুন জেটিতে ধাক্কা খেল যখন, যাবতীয় নোঙর ফেলে দিয়ে দীর্ঘ ভয়ংকর এবং অভিযানের শেষে অন্ধকারে যেন তারা অবতরণ করছে কোনও এক দ্বীপ-দেশে।

মাটি পেতেই অবশেষে শোনা গেল মানুষগুলোর কণ্ঠস্বর। গাড়ি-চালকটি এইমাত্র মিটিয়ে দিয়েছে তাদের পাওনা এবং গাড়িটি যখন চলতে শুরু করল আবার, ভরা সেই নিশীথে অদ্ভুত উৎফুল্ল গলায় পর্তুগিজ ভাষায় বিদায় জানাতে লাগল তারা।

'ওরা বলেছিল ষাট, ইগুয়াপে যাবার কিলোমিটার। আরও তিন ঘণ্টা, তাহলেই পথ শেষ। সক্রেটিস সুখী'। গাড়ি-চালকটি বলে উঠল।

নিজের মতো করেই উষ্ণ আন্তরিক হাসলেন সেই মানুষটি।

'আমিও, সক্রেটিস, আমিও সুখী। কঠিন এই অভিযান।'

'খুব ভারী, মি. ডি'আরাস্ট, খুবই ভারী আপনি,' এবং সেই গাড়ি-চালকটিও হেসে উঠল, যেন আর কখনোই থামবে না সে।

গাড়িটার গতি কিঞ্চিৎ বেড়েছে। নম্র, মিঠে একটা সুবাসের ভেতর দিয়ে সুউচ্চ বৃক্ষের দেয়াল আর দুর্ভেদ্য গাছপালার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল ওটা। অরণ্যের অন্ধকারে উড়ন্ত জোনাকিরা অবিরাম একদিক থেকে অন্যদিকে সরে যাচ্ছিল এবং প্রতি মুহূর্তে উইন্ডশিল্ডে আছড়ে পড়ছিল রক্তচক্ষু পাখির দল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কখনও কখনও রাতের গভীর থেকে অদ্ভুত বন্য আওয়াজ উঠে আসছিল তাদের দিকে, আর গাড়ি-চালকটি তার সওয়ারিটির দিকে তাকিয়ে কৌতুকে ঘোরাচ্ছিল চোখ দুটি তার।

রাস্তাটা বাঁক-বহুল এবং ছোটখাটো অনেক ঝোরা পার হয়ে চলে গেছে নড়বড়ে কাঠের সেতু পেরিয়ে। ঘণ্টাখানেক বাদে কুয়াশা ঘন হতে শুরু করল। শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ঝাপসা হলো গাড়ির আলো। ঝাঁকুনির সত্ত্বেও, ডি'আরাস্ট আধোঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। স্যাঁতসেঁতে বনাঞ্চলে তিনি আর যাচ্ছিলেন না তখন, যাচ্ছিলেন সেররার রাস্তায়, সাও-পাওলো ছাড়ানোর সময় সকালে যে পথ ধরেছিলেন তাঁরা। ধুলোর সেই পথে লাল ধুলোই উড়ছিল শুধু, স্বাদ যার এখনও লেগে আছে মুখে তাঁদের এবং দুধারে, যতদূর চোখ যায়, সমতল জুড়ে ছিল বিক্ষিপ্ত গাছপালা। প্রখর সূর্য, সংকীর্ণ গিরিপথে ভরা বিবর্ণ পাহাড়, রাস্তার পাশে পাশে ক্ষুধার্ত ষাঁড়ের দল, একমাত্র পথ-প্রদর্শক যাদের ক্লান্ত শুকনো শকুনের দল, অনন্ত মরুর দীর্ঘ অফুরান এক অভিযাত্রা স্টার্ট দিল সে। গাড়িটা থেমে গিয়েছিল। এখন তাঁরা জাপানের ভেতরে রাস্তার দুধারে নড়বড়ে ঘরবাড়ি, আর বাড়িগুলোর ভতরে সংগোপন কিমোনো। নোংরা জোব্বা আর ব্রাজিলের খড়ের টুপি-পরা একজন জাপানির সঙ্গে কথা বলছিল গাড়ি-চালকটি। গাড়িটি চলতে শুরু করল তারপর।

'ও বলল মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার।'

'কোথায় ছিলাম আমরা? টোকিওতে?'

'না। রেজিস্ট্রোতে। ব্রাজিলে সব জাপানিরাই এখানে আসে।'

'কেন?'

'জানি না। ওরা হলুদ, মি. ডি'আরাস্ট, আপনি তো জানেন।'

কিন্তু ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছিল বন, আর রাস্তাও মসৃণতর হচ্ছিল, যদিও পেছল। বালিতে হড়কে যাচ্ছিল গাড়িটা। জানালা দিয়ে তপ্ত, ভেজা বাতাস আসছিল, টক-টক গন্ধ।

'গন্ধ পাচ্ছেন এর?' গাড়ি-চালক শুধোল, ঠোঁট দুটি চেটে তার। 'পুরনো সেই সাগর সেখানে। কাছেই, ইগুয়াপে।'

'যথেষ্ট পেট্রল থাকলেই হলো আমাদের, 'ডি'আরাস্ট বললেন। নিশ্চিন্তে ঘুমের গভীরে চলে গেলেন তিনি আবার।

খুব সকালে বিছানায় উঠে বসে ডি'আরাস্ট বিস্ময়ে বিশাল সেই ঘরটির দিকে তাকালেন, এইমাত্র যেখানে ঘুম ভেঙেছে তাঁর। মস্ত দেয়ালগুলোর নিচের অর্ধাংশে সদ্য পাটকিলে রঙের কলি ফেরানো হয়েছে। ওপরের অংশ, একসময় সাদা রংই করা হয়েছিল, আর সিলিং পর্যন্ত ঢাকা আছে হলদেটে রঙের ছোপে। মুখোমুখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিছানার দুটি সারি। ডি'আরাস্ট দেখলেন তাঁর সারির শেষ প্রান্তে একটি বিছানা তৈরি নয়, আর শূন্যই সেটা। কিন্তু তাঁর বাঁ দিকে একটা গোলমাল শুনতে পেলেন তিনি এবং দরজার দিকে ফিরলেন, যেখানে সক্রেটিস, দু হাতেই একটা করে মিনারেল ওয়াটারের বোতল নিয়ে হাসছিল দাঁড়িয়ে। 'সুখ স্মৃতি'! বলল সে। ডি'আরাস্ট ঝাঁকালেন শরীরটা। হ্যাঁ, গত রাতে মেয়র যে হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁদের, নাম তার 'সুখ-স্মৃতি'। 'সুনিশ্চিত স্মৃতি', সক্রেটিস বলল আবার। 'ওরা আমাকে বলেছিল প্রথমে হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, তারপর জল। এরই মধ্যে সুখ-স্মৃতি, ধোয়া-ধুয়ি ভুসভুসে জলেই।' অদৃশ্য হলো সে, হাসতে হাসতে, গান গাইতে গাইতে, রাতভর কালান্তক যে হাঁচি কাঁপিয়েছে তাকে আর ডি'আরাস্টকে চোখ বন্ধ করতে দেয়নি, আপাতদৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র বিধ্বস্ত না হয়েই তাতে।

ডি'আরাস্ট পুরোপুরি জাগ্রত এখন। লোহার গরাদে দেওয়া জানালা দিয়ে বৃষ্টিভেজা লাল-মাটির ছোট্ট একটা উঠোন দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি, দীর্ঘ একগুচ্ছ আলোকলতার ওপরে নিঃশব্দেই ঝরে যাচ্ছিল বৃষ্টি। মাথার ওপরে হলুদ একটা স্কার্ট ধরে একজন মহিলা চলে গেল। বিছানায় চিৎ হয়ে শুলেন ডি'আরাস্ট, উঠে বসলেন তৎক্ষণাৎ, বিছানা ছেড়েই নেমে এলেন। শরীরের ভারে কঁকিয়ে উঠল বিছানাটা। সেই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকল সক্রেটিস 'আপনার জন্য, মি. আরাস্ট। বাইরে অপেক্ষা করছেন মেয়র।' কিন্তু ডি'আরাস্টের মুখের ভাব দেখে যোগ করল সে 'ভাববেন না, কোনও তাড়া নেই তাঁর।'

মিনারেল ওয়াটার দিয়ে দাড়ি কামাবার পর বাড়িটার গাড়ি-বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন ডি'আরাস্ট। সোনা-বাঁধানো চশমার নিচে নিখুঁত ছোটখাটো একজন প্রবঞ্চকের দৃষ্টি আর চেহারা নিয়ে মেয়রকে মনে হচ্ছিল বৃষ্টির বিষণ্ন ভাবনায় ডুবে আছেন বুঝি। কিন্তু ডি'আরাস্টকে দেখতে পেয়েই মধুর একটা হাসি বদলে দিল তাঁর চেহারার আদলটাই। ছোট্ট তাঁর শরীরটাকে সোজা রেখে দৌড়ে গেলেন তিনি এবং বাস্তুকারটির চারপাশে হাত দুটি ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। সেই মুহূর্তে নিচু পাঁচিলের অন্য পাশে একটা গাড়ি তাঁদের সামনে চলে এল, হড়কে গেল নরম কাদায় এবং কোনাকুনি দাঁড়িয়ে গেল একেবারে। 'বিচারক!' বললেন মেয়র। মেয়রেরই মতো বিচারকের পোশাকটিও ছিল নেভি ব্লু রঙের। কিন্তু তিনি ছিলেন তরুণতর, অথবা তাঁর সম্ভ্রান্ত চেহারা আর কৈশোরক চকিত চাহনিতে সে রকমই মনে হচ্ছিল তাঁকে। তাঁদেরই দিকে উঠোনটি পার হচ্ছিলেন এখন তিনি, সন্তর্পণে কাদা-মাটি এড়িয়ে। ডি'আরাস্টের কয়েক পা দূর থেকেই স্বাগত জানাতে হাত বাড়িয়েই দিয়েছিলেন তিনি। মহান সেই বাস্তুকারটিকে, যিনি তাঁদের সামান্য গ্রামটিকে সম্মানিত করেছিলেন, আপ্যায়ন করে গর্বিত হচ্ছিলেন তিনি;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ইগুয়াপেতে শহরের এক চতুর্থাংশ নিম্নাঞ্চলে নিয়মিত বন্যা রোধের জন্য ছোট্ট জেটিটি নির্মাণ করে মহান সেই বাস্তুকার অমূল্য যে পরিষেবা দিতে চলেছেন, তাতে আনন্দিত হচ্ছিলেন তিনি। কী মহান বৃত্তি, জল-শাসন আর নদী বশীকরণের! আহ্, ইগুয়াপের গরিব মানুষেরা মহান এই বাস্তুকারের নাম দীর্ঘকাল নিশ্চিতভাবে স্মরণ করবে এবং এখন থেকে আগামী বহু বছর তাদের প্রার্থনায় উল্লেখ করবে তা। এরকম মুগ্ধতা আর উচ্ছ্বাসে আবিষ্ট ডি'আরাস্ট ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে এবং একটা জেটির সঙ্গে একজন বিচারকের সম্ভাব্য যোগসূত্রটি নিয়ে বিস্মিত হতে ভরসা পেলেন না। তাছাড়া মেয়রের কথামতো, তখন ক্লাবঘরে যাবার সময়, গরিব এলাকাগুলোতে পরিদর্শনে যাবার আগে, শহরের গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ মহান সেই বাস্তুকারকে সংবর্ধনা জানাতে উদগ্রীব ছিলেন যেখানে। কারা ছিলেন সেই গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ? 'হ্যাঁ', মেয়র বললেন, 'মেয়র হিসেবে আমি, এই যে মি. কারভালহো, বন্দরের ক্যাপটেন এবং কম গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকজন। তাছাড়া তাদের জন্য বিশেষ কোনও মনোযোগ দিতে হবে না আপনাকে, কারণ ফরাসি বলে না তারা।'

ডি'আরাস্ট সক্রেটিসকে ডাকলেন এবং বললেন সকালটা কেটে গেলে দেখা হবে তাঁদের।

'ঠিক আছে', সক্রেটিস বলল, 'ফোয়ারার উদ্যানে যাব আমি।'

'উদ্যানে?'

'হ্যাঁ, সবাই জানে। ভয়ের কিছু নেই, মি. ডি'আরাস্ট।'

যেতে যেতে ডি'আরাস্ট লক্ষ করলেন, হাসপাতালটা অরণ্য-প্রান্তেই নির্মিত। ছাদের ওপরেই প্রায় ঝুলে রয়েছে অজস্র বৃক্ষ-পত্র। গোটা বনানীর মাথার ওপরে, বৃষ্টির মিহি একটা চাদর ঝরে যাচ্ছিল যেন, মস্ত একটা স্পঞ্জের মতোই নিঃশব্দে শুষে নিচ্ছিল বনানী তা। বিবর্ণ টালির ছাদের কয়েকশ বাড়ির সেই শহর ছড়িয়ে ছিল অরণ্য আর নদীর মাঝখানে, আর জলের দূরাগত ধ্বনি পৌঁছে যাচ্ছিল হাসপাতাল অবধি।। গাড়িটা ভেজা রাস্তায় উঠে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়ই বেশ বড়-সড় আয়তকার একটা খোলা জায়গায় এসে গেল। লাল মাটিতে কর্দমাক্ত অজস্র খানাখন্দের ভেতরে সেখানে ছিল টায়ার, লোহার চাকা আর ঘোড়ার খুরের ছাপ-ছোপ। জায়গাটার চারপাশে ঘিরে ছিল উজ্জ্বল পলেস্তারার স্বল্প-উচ্চতার ঘর-বাড়ি, যার পেছনে দৃশ্যমান ছিল ঔপনিবেশিক শিল্প-রীতির-নীল-সাদা বর্ণিল গির্জার গোলাকার দুটি চুড়ো। মুক্ত এই প্রেক্ষিতটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল জলাভূমি থেকে উঠে-আসা নোনা গন্ধ। জায়গাটার মাঝখানে ভেজা কয়েকটি ছায়ামূর্তি ঘোরাঘুরি করছিল। বাড়িগুলোর ধারঘেঁষে মিশ্র-রক্তের আমেরিকান, জাপানি, আধ-পেটো-দেশী ভারতীয়ের বিচিত্র এক জনতা আর সম্ভ্রান্ত অগ্রণী

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নাগরিকবৃন্দ, যাঁদের গাঢ় পোশাক বিদেশি বলেই মনে হচ্ছিল সেখানে, শ্লথগতিতে পায়চারি করছিলেন। গাড়িটাকে জায়গা করে দিতে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে গেল তারা, তারপর থেমে গেল এবং লক্ষ করতে লাগল। সেই জায়গাটার কোনও একটা বাড়ির সামনে গাড়িটা যখন থমকে দাঁড়াল, ভেজা সেই মিশ্র রক্তের আরেমিকানরা নিঃশব্দে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়াল তাঁকে।

ক্লাবটা হলো তিনতলার ওপরে বাঁশের তৈরি একটা কাউন্টার আর লোহার কফি-টেবিলে সজ্জিত ছোটখাটো একটা পানশালার মতো, অগ্রণী নাগরিকে পূর্ণ। গ্লাস হাতে মেয়র ডি'আরাস্টকে স্বাগত এবং জগতের যাবতীয় সুখ কামনা জানাবার পর তাঁর সম্মানে ইক্ষুরসের সুরা পান করলেন সকলে। কিন্তু জানালার কাছে ডি'আরাস্ট পান করছিলেন যখন, ঘোড়-সওয়ারের পোশাকে কিম্ভূত চেহারার বিশাল একটা মানুষ এগিয়ে এল এবং সামান্য টালমাটালের পরে তড়বড় করে দুর্বোধ্য এক ভাষণ দিল, যা থেকে বাস্তুকার 'পাসপোর্ট' শব্দটিকেই কেবল উদ্ধার করতে পারলেন। ইতস্তত করলেন তিনি এবং তারপরেই প্রমাণ-পত্রটি বের করলেন। লোভীর মতোই লোকটি কেড়ে নিল সেটি। পাসপোর্টটির ভেতরে আঙুল বুলিয়ে দেখে নিয়ে স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করল সে। আবার ভাষণ শুরু করে দিল, বাস্তুকারের নাকের ডগায় প্রমাণ-পত্রটি নাচিয়ে। উত্তেজিত না হয়েই বাস্তুকার ক্রুদ্ধ সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু। সেই বিচারক সহাস্যে এগিয়ে এলেন তখন এবং ব্যাপার কী জানতে চাইলেন। তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সামান্য সেই জীবটিকে মুহূর্তের জন্য খুঁটিয়ে দেখল সেই মাতালটি, আর, তারপর, আরও বিপজ্জনকভাবে টলতে টলতে, নতুন তার মধ্যস্থতাকারীর মুখের ওপর নাড়াতে থাকল কাগজটি। একটা কফি-টেবিলের পাশে শান্তভাবে বসে ডি'আরাস্ট অপেক্ষা করছিলেন। কথোপকথন ভয়ানক তপ্ত হয়ে উঠল, এবং সহসাই কান-ফাটানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন সেই বিচারক, কেউই তাঁর সম্পর্কে অনুমান করতে পারেনি যা। বামাল ধরা-পড়া শিশুর মতোই, কোনওরকম আগাম-বার্তা ছাড়াই, হঠাৎই পিছু হটল কদাকার সেই লোকটি। বিচারকের চূড়ান্ত নির্দেশে শাস্তি-পাওয়া একটি স্কুল-বালকের মতোই দরজার দিকে ভেতরে সরে গেল এবং অদৃশ্য হলো।

বিচারকটি তৎক্ষণাৎ ডি'আরাস্টের কাছে চলে এলেন এবং মিষ্টি গলায় তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে কুৎসিত যে লোকটা এইমাত্র চলে গেল, সে হলো পুলিশ-প্রধান, আর এমনই তার দুঃসাহস যে পাসপোর্টটা ঠিক নেই বলে দাবি করছিল সে। এই আতিশয্যের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে তাকে। বিচারক কারভালহো এরপর তাঁকে বৃত্তাকারে ঘিরে-দাঁড়ানো অগ্রণী নাগরিকবৃন্দের দিকে মনোযোগী হলেন। যা মনে হলো, প্রশ্ন করলেন তাঁদের। সামান্য আলোচনার পর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ডি'আরাস্টের কাছে গম্ভীর মার্জনা চাইলেন বিচারক, সহমত হবার জন্য অনুরোধ করলেন তাঁকে এই বলে যে তাঁর প্রতি ইগুয়াপের গোটা শহরটির সংবেদনশীল সম্মাননা এবং কৃতজ্ঞতাবোধের এমন বিস্মৃতি সুরাপান জনিত মত্ততা ছাড়া অন্য কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না এবং তাঁকেই শুধোলেন, হতচ্ছাড়া সেই মানুষটিকে কী শাস্তি দেওয়া যায় তা স্থির করে দিতে। ডি'আরাস্ট বললেন, কোনও শাস্তি তাঁর অভিপ্রেত নয়, এটা একটা তুচ্ছ ঘটনা এবং নদীতে যেতেই বিশেষভাবে আগ্রহী তিনি। সহজ রসিকতায় জোরের সঙ্গেই মেয়র বললেন, শাস্তি একটা অবশ্যপ্রাপ্য, দোষী মানুষটি কারারুদ্ধ হবে এবং যতক্ষণ না তাঁদের সম্মানিত অতিথি লোকটির ভাগ্য নির্ধারণ করছেন, সকলেই অপেক্ষা করবেন তাঁরা। কোনও আপত্তিই সহাস্য সেই কাঠিন্যকে গলাতে পারল না এবং ডি'আরাস্টকে প্রতিশ্রুতি দিতে হলো যে বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখবেন তিনি। এরপর শহরের গরিব এলাকাগুলো ঘুরে দেখতে সম্মত হলেন তাঁরা।

নিচু পেছল দু পাড়ে ইতিমধ্যে পীতাভ জলরাশি ছড়াচ্ছিল সেই নদী। ইগুয়াপের শেষ বাড়িটিও পেছনে ফেলে এসেছেন তাঁরা এবং নদী আর উঁচু খাড়াই একটি বাঁধের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাটি আর গাছের ডালপালার কয়েকটি কুঁড়েঘর সেখানে। তাঁদের সামনে, বাঁধের প্রান্ত-সীমায়, হঠাৎই অরণ্যের শুরু আবার, ও-পাড়ে যেমন। কিন্তু মধ্যবর্তী জলস্তরের বিস্তার গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে অতি দ্রুত প্রসারিত হয়ে চলল যতক্ষণ না অস্পষ্ট ধূসর একটি রেখায় গিয়ে বিলীন হলো তা– সমুদ্রের সেখানেই শুরু। একটি কথাও না বলে ডি'আরাস্ট ঢালের দিকে হেঁটে গেলেন, বন্যার বিভিন্ন স্তরের টাটকা চিহ্ন তখনও সেখানে। কর্দমাক্ত একটি পথ কুঁড়েঘরগুলোর দিকে উঠে গেছে। ঘরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে নবীন আগন্তুকদের দেখছিল নিগ্রোরা। অনেক দম্পতিই হাত ধরাধরি করে ছিল এবং জাঙালের প্রান্তসীমায়, বয়স্কদের সামনে, এক সারি কালো শিশু ঠেলে-বেরোনো পেট আর কাঠি-কাঠি পায়ে গোল- গোল চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিল হাঁ করে।

কুঁড়েঘরগুলোর সামনে পৌঁছে বন্দর-ক্যাপ্টেনকে ইশারা করলেন ডি'আরাস্ট। মোটা-সোটা সহাস্য নিগ্রো সে, পরনে সাদা ইউনিফর্ম। ডি'আরাস্ট স্প্যানিশে জিজ্ঞেস করলেন তাকে, একটা কুঁড়েঘরে যাওয়া সম্ভব কি না। ক্যাপ্টেন নিশ্চিত ছিল যে এটা সম্ভব, একটা ভালো প্রস্তাব বলেও মনে করল এটাকে সে। মহান সেই বাস্তুকার খুবই আকর্ষণীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারবেন সেখানে। নিগ্রোদের কাছে লম্বা ভাষণ দিল সে ডি'আরাস্ট আর নদীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। একটি কথাও না বলে শুনল তারা। ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হতে কেউই নড়ে-চড়ে উঠল না। আবার অধৈর্যের মতো বলল সে। তারপর তাদের মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ডাকল একজনকে, সে তার মাথা নাড়ল। এরপর আদেশের সুরেই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বলল সে। দল থেকে বেরিয়ে এল সেই লোকটি, ডি'আরাস্টের মুখোমুখি দাঁড়াল এবং ইঙ্গিতে পথ দেখিয়ে দিল। কিন্তু দৃষ্টি তার বিদ্বেষী। ছোট ছোট ধূসর চুল আর শীর্ণ বলিরেখাময় মুখের বয়স্ক একজন মানুষ সে; শরীরখানি তবুও তার যুবকেরই মতো, কঠিন সহিষ্ণু কাঁধ এবং সুতির পাজামা আর ছেঁড়া কামিজের ভেতর দিয়ে মাংসপেশি দৃশ্যমান। এগিয়ে গেলেন তাঁরা, ক্যাপ্টেন এবং নিগ্রো-জনতা অনুসরণ করল তাঁর এবং নতুন আরও খাড়াই একটি বাঁধে উঠলেন, কাদা, টিন এবং কঞ্চি দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরগুলো মাটিকে এমন কষ্ট করেই কামড়ে ধরে আছে যে বনেদের দিকে ভারী পাথর দিয়ে শক্তপোক্ত করতে হয়েছে তাদের। সেই পথ দিয়ে একজন স্ত্রীলোককে নেমে যেতে দেখলেন তাঁরা। খালি পা তার পিছলে যাচ্ছিল কখনও-কখনও। মাথায় ছিল জলপূর্ণ ড্রাম একটি। এরপর তিনটি কুটিরে ঘেরা ছোট এলোমেলো আকারের খোলা একটি জায়গায় পৌঁছলেন তাঁরা। লোকটি সেগুলোর একটির দিকে হেঁটে গেল এবং ক্রান্তীয় লতায় বাঁধা বাঁশের একটা দরজা ঠেলে খুলল। একটি কথাও না বলে একপাশে দাঁড়াল সে, সেই একই ভাবলেশহীন মুখে স্থির দৃষ্টিতে বাস্তুকারের দিকে তাকিয়ে। কুটিরের ভেতরে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলেন না ডি'আরাস্ট, ঘরের ঠিক মাঝামাঝি মেঝের ওপরে নিভন্ত অগ্নিকুণ্ড ছাড়া। তারপর পেছনের একটা কোণের দিকে আ-ঢাকা ছেঁড়া-ফাটা গদির পাতলা একটা শয্যা দেখতে পেলেন, অন্য কোণে মাটির থালা-বাসন-ঢাকা একটি টেবিল, আর দুয়ের মাঝখানে, স্ট্যান্ডের মতো কিছু একটা, যার ওপরে রয়েছে সন্ত জর্জ-এর রঙিন একটি ছবি। কুটিরে ঢুকতেই ডানপাশে ছেঁড়া-ফাটা পোশাকের স্তূপ ছাড়া কিছুই নেই আর। সিলিং থেকে নানা রঙের কিছু অন্তর্বাস ঝোলানো ছিল, মেঝের আগুনে শুকনো হচ্ছিল সেগুলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, মেঝে থেকে উঠে-আসা ধোঁয়া আর দারিদ্র্যের গন্ধ পেলেন ডি'আরাস্ট, দম বন্ধ হয়ে এল তাঁর। পেছনে হাত তালির শব্দ করল ক্যাপ্টেন। ঘুরে দাঁড়ালেন বাস্তুকার এবং প্রিদর্শিনী কালো একটি মেয়েকে এগিয়ে আসতে এবং কিছু একটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরতে দেখতে পেলেন আলোয়। একটি গ্লাস তুলে নিলেন তিনি এবং ইক্ষু-রসের ঘন সুরা পান করলেন। শূন্য গ্লাসটি নেবার জন্য মেয়েটি তার ট্রে বাড়িয়ে ধরল এবং এমন কমনীয় ভঙ্গিমায় চলে গেল যে ডি'আরাস্ট সহসা ধরে রাখতেই চাইলেন যেন তাকে।

কিন্তু মেয়েটিকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এসে কুটিরের চারপাশে নিগ্রো আর অগ্রণী নাগরিকবৃন্দের ভিড়ে আলাদা করতে পারলেন না তাকে আর। বৃদ্ধ মানুষটিকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি, একটি কথাও না বলে মাথা নোয়াল সে। তারপর এগোলেন তিনি। তাঁর পেছনে ক্যাপ্টেনটি আবার শুরু করে দিলে তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ব্যাখ্যান এবং শুধোল, কবে নাগাদ রিও থেকে ফরাসি কোম্পানিটি কাজ শুরু করবে, আর বর্ষার আগেই জেটিটি নির্মিত হয়ে যেতে পারে কি না। ডি'টারাস্ট জানতেন না; সত্যি বলতে কি, তিনি তা নিয়ে ভাবছিলেনও না। পাতলা কুয়াশার নিচে ঠাণ্ডা নদীর দিকে নেমে গেলেন তিনি। পৌঁছনোর সময় থেকেই বিশাল সুদূরাভিসারী সেই কল্লোল-ধ্বনি শুনেই যাচ্ছিলেন তিনি, জল কিংবা গাছপালার তরঙ্গ-বিক্ষোভ থেকেই উৎসারিত হচ্ছিল হয়তো বা তা, ঠিক বলতে পারলেন না। তীরে পৌঁছে দূরে অস্পষ্ট সমুদ্র-রেখার দিকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি– হাজার হাজার কিলোমিটার ব্যাপী কেবলই জলরাশি– আফ্রিকা, তারও পরে, আপন জন্মভূমি ইউরোপ-অভিমুখী।

'ক্যাপ্টেন', প্রশ্ন করলেন তিনি, 'এইমাত্র যে মানুষগুলোকে দেখলাম, তাদের জীবিকা কী?'

'যখন দরকার পড়ে আমাদের, তখন কাজ করে তারা', বলল ক্যাপ্টেন। 'আমরা গরিব।'

'ওরাই কি সবচেয়ে গরিব?'

'ওরাই সবচেয়ে গরিব।'

সেই বিচারক, তক্ষুনি উপস্থিত হলেন সেখানে, সবচেয়ে ভালো জুতো জোড়াই পায়ে গলিয়ে তাঁর, বললেন মহান বাস্তুকারকে, যে মানুষগুলোকে কাজ দিতে চলেছেন তিনি, এর মধ্যেই ভালোবেসে ফেলেছে তাঁকে তারা।

'আর, জানেন নিশ্চয়ই, রোজই এরা নাচে আর গায়।'

তারপর, প্রসঙ্গান্তরে না গিয়েই, শাস্তি সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কি না, ডি'আরাস্টকে শুধোলেন সে কথা।

'কীসের শাস্তি?'

'কেন, আমাদের পুলিশ-প্রধানের।'

'ছেড়ে দিন ওকে।'

বিচারক বললেন, সেটা সম্ভব নয়; শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে। ততক্ষণে ইগুয়াপের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন ডি'আরাস্ট।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে রহস্যময় আর মনোরম সেই ফোয়ারার ছোট্ট উদ্যানে কলা আর প্যান্ডানাস গাছের মাঝখানে নাম-না-জানা লতা-গুল্মের পাশে বিলম্বিত ছিল বিদেশি ফুলের গুচ্ছ। পথগুলো যেখানে কাটাকুটি করে চলে গেছে, ভেজা পাথরে স্তূপ সেখানে, ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিচিত্র পোশাকের ভিড়। মিশ্র-জাত, সাদা-কালোর বর্ণ-সংকর এবং কিছু মিশ্র-রক্তের আমেরিকান নিচু গলায় গল্প-সল্প করছিল অথবা বাঁশের তৈরি সাঁকোর দিকে পায়চারি করছিল, গাছপালা আর ঝোপঝাড় নিবিড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আর অধিকতর দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল যেদিকে। সেইখানে, আচমকাই শুরু হয়ে গেছে বনাঞ্চল।

ভিড়ের ভেতরে ডি'আরাস্ট সক্রেটিসকে খুঁজছিলেন। হুট করেই পেছন থেকে সক্রেটিস গায়ের ওপর পড়ল তাঁর।

'ছুটির দিন আজ', বলল সে, হাসতে হাসতেই, এবং ওপরে-নিচে লাফ মারতে গিয়ে খামচে ধরল ডি'আরাস্টের কাঁধ।

'কীসের ছুটি?'

'কেন, জানেন না?' ডি'আরাস্টের সামনা-সামনি যেতেই বিস্মিত গলায় বলল সক্রেটিস। 'ভগবান যিশুর উৎসব। বাগানের নকল সাজানো গুহায় একটা হাতুড়ি নিয়ে ফি-বছরে সবাই তারা আসে।'

আঙুল তুলে দেখাল সক্রেটিস, কিন্তু কোনও নকল গুহা নয়, মনে হলো, বাগানের কোণের দিকে অপেক্ষা করছে একদল মানুষ।

'দেখতে পাচ্ছেন? ভগবান যিশুর মূর্তি, ভেসে এল একদিন ওই সমুদ্র থেকে– উজানে। কয়েকজন জেলে খুঁজে পেল তাকে। কী অপরূপ! কী অপরূপ! তারপর এই গুহায় পরিষ্কার করল মূর্তিটিকে তারা। আর এখন গুহার ভেতরে বাড়ন্ত হয় একটি পাথর-খণ্ড। ফি-বছরে এটাই হলো উৎসব। হাতুড়ি দিয়ে ভাঙো এটাকে, ভেঙে টুকরো টুকরো করো স্বর্গীয় সুখের কারণে। আর তারপর, আবার বাড়তে থাকে এটা, ভাঙতে থাকো তুমিও। এ এক অলৌকিক কাণ্ড।'

গুহার কাছে পৌঁছল তারা এবং অপেক্ষমাণ মানুষের ও-পাশে নিচু প্রবেশপথ দেখতে পেল। ভেতরে, কম্পিত মোমের আলোর নিবিড় অন্ধকারে নতজানু একটি দেহ হাতুড়ির আঘাত হেনে যাচ্ছিল। রোগাটে লম্বা গোঁফ-সমন্বিত মিশ্র-রক্তের সেই আমেরিকান মানুষটি উঠে দাঁড়াল এবং সবাই যাতে দেখতে পারে, খোলা মুঠোয় ছোট্ট ভেজা একটা পাথরের টুকরো নিয়ে বেরিয়ে এল, তারপর চলে যাবার আগে সতর্কভাবে মুঠি বন্ধ করে ফেলল তৎক্ষণাৎ। আর একজন মানুষ ঝুঁকে পড়ল তখন এবং ঢুকে পড়ল গুহার ভেতরে।

ডি'আরাস্ট ঘুরে দাঁড়ালেন। চারপাশেই অপেক্ষমাণ পূর্ণার্থীরা, কেউই দেখছিল না তাঁকে, গাছপালা থেকে ঝরে-পড়া পাতলা জলের চাদরের নিচে একেবারে শান্ত-চিত্ত। সেই একই জল-চাদরের নিচে গুহার সামনে অপেক্ষা করছিলেন তিনিও, কীসের জন্য, জানতেন না। যেন নিরন্তর অপেক্ষা করেই আছেন তিনি, সত্যি বলতে কি, এ দেশে পৌঁছনার পর– এক মাস ধরে। অপেক্ষাই করে আছেন তিনি– আর্দ্র দুপুরের গনগনে তাপে, রাতের খুদে নক্ষত্রপুঞ্জের নিচে, কাজ তাঁর শেষ হয়নি, জেটি নির্মিত হয়নি, রাস্তাগুলো কাটা হয়নি, তবুও– যে কাজটা এখানে সম্পন্ন করতে এসেছেন তিনি নেহাতই একটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিস্ময়ের অজুহাতমাত্র যেন তা, অথবা একটি সংঘর্ষের জন্যই অপেক্ষা তাঁর, যা তিনি কল্পনাও করেননি, কিন্তু তাঁরই জন্য পৃথিবীর প্রান্তসীমায় প্রতীক্ষারত যা। ঝাঁকুনি দিলেন নিজেকে তিনি, হেঁটে চলে গেলেন ছোট্ট সেই জনতার অমনোযোগের ভেতর দিয়ে এবং নির্গমনের পথের দিকেই এগোলেন। নদীতেই ফিরতে হবে তাঁকে এবং নামতে হবে কাজে।

কিন্তু সক্রেটিস সেই পথের কাছে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল বেঁটেখাটো, স্থূলকায়, কোমরে বেল্ট-বাঁধা একজন মানুষের সঙ্গে, গায়ের রং যার কালোর চাইতে হলুদই বরং বলা চলে। কামানো গোটা মাথাটাই চওড়া তার কপালকে আরও প্রশস্ততা দিয়েছিল যেন। অন্যদিকে বড়সড় সমৃণ মুখখানি শোভিত ছিল চৌকো করে ছাঁটা ঘনকালো শ্মশ্রুতে।

'একজন ভক্ত মানুষ'! পরিচয় করিয়ে দিতে বলল সক্রেটিস। 'আগামীকাল শোভাযাত্রায় থাকবে ও।'

ভারী সার্জের তৈরি নাবিকের পোশাক, সবুজ জ্যাকেটের তলায় নীল-সাদা জামা পরা লোকটি শান্ত কালো চোখ মেলে খুঁটিয়ে দেখছিল ডি'আরাস্টকে। একই সঙ্গে হাসছিল আবার ভরাট উজ্জ্বল ঠোঁটের মাঝখানে শ্বেত-শুভ্র সব কটি দাঁত মেলে দিয়ে তার।

'স্প্যানিশ জানে ও', সক্রেটিস বলল এবং আগন্তুকের দিকে ফিরে যোগ করল 'মি. ডি'আরাস্ট বলো।' তারপরে নাচের ভঙ্গিতেই অন্য একটি দলের দিকে চলে গেল সে। লোকটি হাসি থামাল এবং ডি'আরাস্টের দিকে সরাসরি কৌতুহলের চোখে তাকাল।

'আপনার ইচ্ছে আছে, ক্যাপ্টেন?'

'আমি ক্যাপ্টেন নই', ডি'আরাস্ট বললেন।

'ওতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আপনি একজন নোব্‌ল। সক্রেটিস বলেছে আমাকে।'

'আমি নই। কিন্তু আমার ঠাকুরদা ছিলেন। তাঁর বাবা এবং তাঁদের সব পূর্বসূরিই। এখন আমাদের দেশে মহত্ত্ব আর নেই।

'আহ্!' নিগ্রোটি বলল, হাসতে হাসতে। 'জানি আমি; প্রত্যেকেই একজন নোব্‌ল।'

'না, ব্যাপারটা তা নয়। মহৎ মানুষ যেমন নেই, সাধারণ মানুষও তেমনই নেই।'

লোকটি ভাবল; তারপর মনস্থির করল।

'কেউ কাজ করে না? কেউ কষ্ট পায় না?'

'হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ মানুষ।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তাহলে সেটাই তো সাধারণ মানুষ ।'

'সেদিক থেকে, হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ আছে। কিন্তু প্রভুর দল হলো পুলিশ অথবা বণিকেরা ।'

সাদা-কালোর মিশ্র-রক্তের লোকটির দয়ার্দ্র মুখখানি কুঞ্চিত হলো । তারপর গজগজ করল সে 'হুম্! কেনা আর বেচা, হ্যাঁ! কী নোংরা! আর এই পুলিশ, কুকুরের খরবদারি ।'

হঠাৎই হাসিতে ভেঙে পড়ল সে ।

'আপনি, আপনি বেচেন না?'

'বলতে গেলে, না। আমি সেতু, রাস্তা বানাই ।'

'এটা ভালো। আমি, একটা জাহাজের বাবুর্চি। যদি ইচ্ছে করেন, আমাদের কালো বিনের খাবার করে দেব আপনাকে ।'

'ঠিক আছে ।'

ডি'আরাস্টের আরও কাছে ঘেঁষে এল বাবুর্চিটি এবং তাঁর হাত ধরল ।

'শুনুন, আপনি যা বললেন, আমার তা পছন্দ। আমিও আপনাকে বলতে যাচ্ছি। আপনার পছন্দ হতেও পারে বা ।'

দরজার কাছে একটা বাঁশঝাড়ের নিচে স্যাঁতসেঁতে একটা কাঠের বেঞ্চের ওপরে টেনে নিয়ে এল তাঁকে সে ।

'সমুদ্রে ছিলাম আমি, ইগুয়াপে থেকে অল্প দূরে, কূল-ঘেঁষা ছোট্ট একটা ট্যাঙ্কারে, এখানকার বন্দরগুলোতে মাল-পত্তরের জোগানদার ছিল যা। এর পাটাতনে আগুন ধরে গেল। আমার দোষ নয়! আমার কাজ আমি জানি! না, একেবারে মন্দ কপাল। লাইফ বোটগুলো নামাতে পেরেছিলাম আমরা। রাতের দিকে সমুদ্র উত্তাল হলো, লাইফ বোট উলটে দিল, আমি ডুবে গেলাম। যখন উঠে এলাম ওপরে, নৌকায় ঘা খেল আমার মাথা। ভাসতে লাগলাম আমি। রাতটা ছিল অন্ধকার, জলরাশি বিপুল, আর তাছাড়া, আমি ভালো সাঁতার জানি না; ভয় পেয়েছিলাম আমি। ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে একটা আলো দেখতে পাই এবং ইগুয়াপেতে ভগবান যিশুর গির্জাটা চিনতে পারি আমি। ভগবান যিশুকে আমি তাই বললাম, আমাকে যদি বাঁচান তিনি, তাঁর শোভাযাত্রায় একশ পাউন্ডের একটি পাথর মাথায় করে বইব তবে। আমাকে না-ই বা বিশ্বাস করলেন কিন্তু সমুদ্র শান্ত হয়ে এল, সেইসঙ্গে আমার হৃদয়। ধীরে সাঁতার দিলাম আমি, অন্তরে সুখ এবং কূলে পৌঁছে গেলাম। আগামীকাল আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব আমি ।'

ডি'আরাস্টের দিকে সহসাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'হাসছেন না তো?'

'না, হাসছি না। একজন মানুষকে তার প্রতিশ্রুতি তো রক্ষা করতেই হবে ।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লোকটা চাপড় মারল তাঁর পিঠে।

'এবারে, নদীর কাছে, আমার ভাইদের কাছে আসুন। আপনার জন্য কিছু বিন রান্না করব আমি।'

'না', ডি'আরাস্ট বললেন, 'অনেক কাজ আছে আমার। যদি চান, সন্ধেয় হতে পারে।'

'ভালো। কিন্তু আজ রাতে বড় কুটিরে নাচ আর প্রার্থনা আছে। সন্ত জর্জের কারণেই এই উৎসব।' ডি'আরাস্ট শুধোলেন, সে-ও নাচবে কি না। বাবুর্চিটির মুখ সহসাই কঠিন হলো; এই প্রথম দুচোখে তার বিভ্রম।

'না, না, নাচব না আমি। আগামীকাল পাথরটা বইতেই হবে আমাকে। ভারী এটা। সন্ত-এর উৎসবে আজ সন্ধেবেলা যাব আমি। আর তারপরে চলে যাব তাড়াতাড়ি।

'অনেকক্ষণ ধরে চলে এটা?'

'রাতভর এবং সকালেও খানিকটা।'

অস্পষ্ট লাজুক চোখে ডি'আরাস্টের দিকে তাকাল সে।

'নাচে আসুন না। তারপরে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন আমাকে। না হলে, থেকে যাব আমি, নাচব। সম্ভবত এটাকে এড়িয়ে যেতে পারব না আমি।'

'নাচতে পছন্দ করো তুমি?'

'ওহ্, হ্যাঁ! পছন্দ করি। তাছাড়া, ধূমপান আছে, সাধু-সন্তরা আছেন, মেয়েরা আছে। সব কিছু ভুলে যাবেন আপনি, কিছুই আর মেনে চলতে হবে না।'

'মেয়েরাও আছে? শহরের সব মেয়েরাই?'

'শহরের নয়, কুটিরগুলোর।'

জাহাজি বাবুর্চির মুখে ফিরে এল হাসি। 'আসুন। ক্যাপ্টেন, মেনে চলব আপনাকে আমি। আর আগামীকাল আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমাকে সাহায্য করবেন আপনি।'

সামান্য বিরক্তবোধ করলেন ডি'আরাস্ট। আজগুবি ওই প্রতিশ্রুতির কী মানে তাঁর কাছে? কিন্তু তাঁর দিকে সুন্দর, সরল, বিশ্বস্ত হাসি-মাখানো মুখটির দিকে তাকালেন তিনি, স্বাস্থ্য আর প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল ছিল কালো তার গাত্র-ত্বক।

'আসব আমি', বললেন তিনি। 'এখন তোমাকে নিয়ে হাঁটব সামান্য।'

সেইসঙ্গে অভ্যর্থনার পানীয় এগিয়ে-ধরা কৃষ্ণাঙ্গ সেই মেয়েটির ছবি ভেসে উঠল তাঁর মনে, কেন, তা না জেনেই।

বাগানের বাইরে চলে গেলেন তাঁরা, অনেক কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে হাঁটলেন, এবং উচ্চাবচ খোলামেলা সেই চত্বরে পৌঁছলেন, চারপাশের নিচু ঘরবাড়ির জন্য প্রশস্ততরই দেখাচ্ছিল যাকে। দেয়ালের পলেস্তারা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল আর্দ্রতা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি যদিও বাড়েনি। নদী আর গাছপালার মর্মরধ্বনি স্পঞ্জের মতো আকাশের পরিণাহ পেরিয়ে কিছুটা অস্ফুটই পৌঁছচ্ছিল যেন তাঁদের কাছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছিলেন তাঁরা, ডি'আরাস্ট ভারী পায়ে আর বাবুর্চিটি রয়ে-সয়ে। থেকে থেকেই মাথাখানি তুলছিল লোকটি আর সঙ্গীর দিকে হাসছিল তাকিয়ে। গির্জার দিকে গেলেন তাঁরা, ঘরবাড়ির মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তাকে, চত্বরের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন, আরও কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে হাঁটলেন, রান্নার কটু গন্ধ ভাসছিল সেখানে। একটা প্লেট কিংবা রান্নার বাসন-কোশন হাতে কোনও একটা দরজা দিয়ে উৎসুক মুখ বাড়াচ্ছিল একজন স্ত্রীলোক এবং পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। গির্জার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর, একইরকম নিচু ঘরবাড়ির পুরনো একটা এলাকায় ঢুকে গেলেন এবং কয়েকটি কুটিরের ও-পাশে, চিনতে পারলেন ডি'আরাস্ট যেগুলো, সহসাই বেরিয়ে এলেন অদৃশ্য নদীর জল-কল্লোলের ভেতরে।

'ঠিক আছে। ছেড়ে দিচ্ছি আপনাকে। সন্ধেয় দেখা হবে', বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, গির্জার সামনে।'

কিন্তু বাবুর্চিটি ডি'আরাস্টের হাত ছাড়ল না। ইতস্তত করল সে। শেষমেশ মনটাকে গুছিয়ে নিল।

'আর আপনি, কখনও কি আপনি ডাকেননি তাঁকে, অঙ্গীকার করেননি?'

'হ্যাঁ, একবারই, আমার বিশ্বাস।'

'কোনও জাহাজডুবিতে?'

'মনে করতে পারেন।' এবং রুক্ষভাবেই হাতখানি ছাড়িয়ে নিলেন ডি'আরাস্ট। কিন্তু ঘুরে চলে যাবার মুহূর্তেই বাবুর্চিটির চোখে চোখ পড়ল তাঁর। দ্বিধান্বিত হলেন তিনি এবং হাসলেন তারপর।

'বলতে পারি তোমাকে, যদিও গুরুত্ব নেই তারা। আমারই ভুলের কারণে কোনও একজন মরতে বসেছিল। আমার মনে হয়েছিল ডেকেছিলাম তাঁকে আমি।'

'অঙ্গীকার করেছিলেন?'

'না। উচিত ছিল করাই।'

'অনেক দিন আগে?'

'এখানে আসার খুব বেশি দিন আগে নয়।'

দু হাতে নিজের দাড়ি আঁকড়ে ধরল বাবুর্চিটি। চোখ তার জ্বলছিল।

'আপনি একজন ক্যাপ্টেন,' বলল সে। 'আমার বাড়ি আপনারই বাড়ি। তাছাড়া, আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমাকে সহায়তা করতে চলেছেন আপনি, আর ব্যাপারটা এমন, প্রতিশ্রুতি আপনারই [illegible]। আপনা[illegible]ও কা[illegible] লেগে যাবে এটা।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাসলেন ডি'আরাস্ট, বললেন, 'সে রকম মনে হয় না আমার।'

'অহংকারী আপনি, ক্যাপ্টেন।'

'সে রকমই ছিলাম আমি; এখন নিঃসঙ্গ। কিন্তু বলো তো আমাকে তোমার মহান যিশু কি সবসময়ই সাড়া দিয়েছেন তোমাকে?'

'সবসময়ই... না, ক্যাপ্টেন!'

'তাহলে?'

শিশুসুলভ উল্লসিত একটি হাসিতে ভেঙে পড়ল বাবুর্চিটি।

'ভালো', বলল সে, 'দায় নেই তাঁর, তাই না?'

ক্লাবঘরে, নেতৃস্থানীয় নাগরিকবৃন্দের সঙ্গে দুপুরের আহার সারলেন ডি'আরাস্ট। মেয়র বললেন, ইগুয়াপেতে তাঁর এই মহান আগমনের কিছু চিহ্ন থেকে যায় যাতে, শহরের অতিথি-খাতায় অবশ্যই তাঁর স্বাক্ষর চাই তাই। তাঁদের অতিথির গুণাবলি এবং প্রতিভা, মহান যে দেশের অধিবাসী তিনি, যে সরলতায় তারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন, এসব ছাড়াও দুটি কি তিনটি প্রশংসার নতুন অভিব্যক্তি খুঁজে পেলেন বিচারক মশাই। ডি'আরাস্ট শুধুই বললেন, এটা নিশ্চয়ই তাঁরই প্রতি প্রদর্শিত সম্মান এবং দীর্ঘ এই নির্মাণকর্মটির বরাত তাঁর প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি সুযোগ। তাই শুনে বিচারকমশাই এরকম দীনতার জন্য প্রশংসা জানালেন তাঁকে। 'যাই হোক', শুধোলেন তিনি, 'পুলিশ-প্রধানের কী করা উচিত, তা নিয়ে কি ভেবেছেন আপনি?' ডি'আরাস্ট তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং বললেন, 'হ্যাঁ, আমার একটি সমাধান আছে।' এটাকে ব্যক্তিগত একটি অনুগ্রহ এবং ব্যতিক্রমী সৌজন্য বলে মনে করবেন তিনি, মূর্খ সেই মানুষটিকে তাঁর নামেই ক্ষমা করে দেওয়া হয় যদি। তাহলে ইগুয়াপেতে, সুন্দর এই শহর আর দয়ালু তার অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচয় এতটাই উপভোগ করেছেন যেখানে, শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়াতেই তাঁর অবস্থান শুরু করতে পারেন তিনি। বিচারকমশাই, সপ্রতিভ এবং সহাস্য, মাথাখানি নাড়লেন তাঁর। মুহূর্তের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের মতোই সেই শব্দাবলির গভীরে চলে গেলেন তিনি, উপস্থিত সকলকে মহান ফরাসি জাতির মহানুভব ঐতিহ্যের প্রশংসা করতে আহ্বান জানালেন এবং ডি'আরাস্টের দিকে ঘুরে গিয়ে আবার, নিজেকে সন্তুষ্ট বলে ঘোষণা করলেন। 'ব্যাপারটা যেহেতু সেইরকম', শেষ করলেন তিনি, 'পুলিশ-প্রধানের সঙ্গে আজ সন্ধেয় ভোজ খাব আমরা।' কিন্তু ডি'আরাস্ট জানালেন, কুটিরের নৃত্য-উৎসবে বন্ধুদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি। 'আহ্, হ্যাঁ!' বললেন, বিচারকমশাই। 'আমি খুশি যে আপনি যাচ্ছেন। দেখবেন আপনি, আমাদের লোকজনকে ভালো না বেসে কেউই পারবে না।'

সেই সন্ধেয় ডি'আরাস্ট, জাহাজের বাবুর্চিটি এবং তার ভাই সকালেই তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দেখে-আসা কুটির-কেন্দ্রের আগুনের আঙরার চারপাশে বসে ছিলেন। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে ভাইটিকে মোটেই বিস্মিত বলে মনে হয় না। স্প্যানিশ সে বলতেই পারে না প্রায় এবং অধিকাংশ সময়ে মাথাটাই নাড়াচ্ছিল কেবল। আর সেই বাবুর্চিটি, মূল গির্জার ব্যাপারে আগ্রহ জানাচ্ছিল তার এবং তারপর কালো বিনের সুপ নিয়ে বকছিল এন্তার। এখন নিশিপতন ঘটে গেছে এবং বাবুর্চিটি আর তার ভাইকে ডি'আরাস্ট যদিও দেখতে পাচ্ছিলেন তখনও, কুটিরের পেছন দিকে উবু হয়ে বসে-থাকা বৃদ্ধ এক রমণী এবং তাঁর সেবিকা সেই মেয়েটির চেহারা অস্পষ্টভাবে অনুমান করতে পারছিলেন তিনি। নিচের দিকে, নদীর একঘেয়ে শব্দ কানে বাজছিল তাঁর।

বাবুর্চিটি উঠে দাঁড়াল, বলল 'সময় হয়েছে' উঠে পড়লেন তাঁরা, কিন্তু স্ত্রীলোক দুটি নড়ল না। পুরুষেরাই বেরিয়ে গেল শুধু। ডি'আরাস্ট ইতস্তত করলেন, তারপর যোগ দিলেন সকলের সঙ্গে। নিশুতি রাত এবং বৃষ্টিও নেই। ফ্যাকাশে কালো আকাশটাকে তখনও তরল বলে মনে হচ্ছিল। কালো স্বচ্ছ সেই তরলে ঝুঁকে-পড়া দিকচক্রবালে তারা ফুটতে শুরু করেছিল। প্রায় তৎক্ষণাৎই নিভে গেল সব, একের পর এক ঝাঁপ দিতে লাগল নদীতে, আকাশ থেকে চুঁইয়ে-পড়া আলোর অবশিষ্ট বিন্দুরাশি যেন। ভারী বাতাসে জল আর ধোঁয়ার গন্ধ। বিশাল অরণ্যের মর্মর ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল কাছে, নিশ্চল যদিও। ড্রাম আর সংগীত সহসাই বেজে উঠল দূরে, শুরুতে অস্পষ্ট, পরে স্পষ্ট, কাছে, আরও কাছে আসতে আসতে অবশেষে থামল একেবারে। পরক্ষণেই খসখসে মসলিনের খাটো সাদা পোশাকের কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের একটি শোভাযাত্রা পরিদৃশ্যমান হলো। নানা রঙের দন্ত-নির্মিত নেকলেসে শোভিত আঁটোসাঁটো লাল জ্যাকেটে দীর্ঘকায় একটি নিগ্রো পেছনে পেছনে যাচ্ছিল তাদের এবং পেছনে তার, সাদা পায়জামা পরা পুরুষ মানুষের বিশৃঙ্খল এক জনতা এবং ত্রিভুজ আর বড়, ছোট ড্রামবাহী বাদকের দল। বাবুর্চিটি বলল, পুরুষদের পেছনে পেছনেই যেতে হবে তাদের।

শেষ কুটিরটি পার হয়ে কয়েক শ গজ নদী-বরাবর হাঁটার পর যে কুটিরটিতে পৌঁছল তারা, সেটি ছিল প্রশস্ত, আসবাবহীন আর তুলনায় আরামদায়ক। দেয়ালে পলেস্তারা। মেঝেটি অপরিষ্কার, মধ্যবর্তী একটি খাম্বার ওপরে খড় আর নল-খাগড়ার চালা আর দেয়ালগুলো আদুল। এক প্রান্তে তাল-পাতায় মোড়া ছোট্ট একটা বেদি, ঘরের অর্ধেকটা কোনও রকমে আলোকিত করে মোমবাতি জ্বলছিল তার ওপরে। চমৎকার রঙিন একটা ছাপা-ছবি ছিল সেখানে, আকর্ষক প্রসন্নতায় সন্ত জর্জ গুম্ফ-মণ্ডিত একটি ড্রাগনের অধিকাংশটাই আগলে ছিলেন। বেদির নিচে মধ্যযুগীয় ফরাসি রীতি অনুসারী কাগজে শোভিত একটা তাকের মতো, একটি মোমবাতি আর জলপাত্রের মাঝখানে শিং-অলা ঈশ্বরের আদলে মাটির তৈরি ছোট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি মূর্তি দণ্ডায়মান সেখানে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে রুপালি কাগজে তৈরি মস্ত এক ছুরি দোলাচ্ছিলেন সেই দেবতা।

বাবুর্চিটি ডি'আরাস্টকে একটি কোণের দিকে নিয়ে গেল, সেখানে দরজার কাছে একটি দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড়াল তারা। 'এই পথে', ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'বিরক্ত না করেই চলে যেতে পারব আমরা।' নারী আর পুরুষে সত্যি-সত্যিই ঠাসাঠাসি ছিল কুটিরটি। উত্তাপ ইতিমধ্যেই চড়তে শুরু করেছিল। ছোট্ট বেদির দু পাশে আসন গ্রহণ করেছিল বাদকের দল। পুরুষ এবং নারী নাচিয়েরা একই কেন্দ্রের দুটি বৃত্তে ভাগ হয়ে গেল, পুরুষরা রইল ভেতরে। ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে নিজের জায়গায় চলে এল লাল-জ্যাকেটের কৃষ্ণাঙ্গ সেই দলপতি। দু বাহু ভাঁজ করে দেয়ালের গায়ে হেলে দাঁড়ালেন ডি'আরাস্ট।

কিন্তু সেই দলপতি, নাচিয়েদের বৃত্ত ভেদ করে ঠেলেঠুলে, তাঁদের দিকেই এগিয়ে এল এবং গম্ভীর সহবতে, কয়েকটি কথা বলল বাবুর্চিটিকে। 'হাতের ভাঁজ খুলে ফেলুন', বলল বাবুর্চিটি। 'নিজেকে নিজেই আলিঙ্গন করছেন আপনি আর সন্তের আত্মার অবরোহণে বাধা দিচ্ছেন।' সবনিয়েই নিজের দু পাশে বাহু দুটি ঝুলিয়ে দিলেন ডি'আরাস্ট। দীর্ঘ, ভারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং স্বেদদীপ্ত মস্ত তাঁর মুখমণ্ডল নিয়ে দেয়ালের গায়ে তখনও হেলে দাঁড়িয়ে-থাকা ডি'আরাস্টকে জান্তব কোনও এক দেবতার মতোই দেখাচ্ছিল অবিকল। দীর্ঘাঙ্গ নিগ্রোটি তাঁদের দিকে দৃকপাত করল এবং সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গেই, প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে, একটি গানের প্রথম কলি সুর করে গেয়ে উঠল সে, ড্রামের বাজনার সঙ্গে সকলেই গেয়ে উঠল সমস্বরে। ভূমিতে প্রায় পদাঘাতের মতোই ভারী একরকম জোরালো নৃত্যে বৃত্ত দুটি বিপরীত মুখে ঘুরে যেতে শুরু করল, দোলায়িত পশ্চাদ্দেশের পৃথক দুটি সারিতে কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর হয়ে।

তাপ চড়ে গিয়েছিল। তবুও ক্রমেই কমছিল বিরতি, একেবারে থেমে যাওয়া ঘটছিল আরও কম, আর দ্রুততর হচ্ছিল সেই নাচ। অন্যদের ছন্দে একটুও শৈথিল্য না এনে, নিজের নাচকেও নিরবচ্ছিন্ন রেখে, দীর্ঘকায় সেই নিগ্রো বৃত্ত দুটি ভেদ করে ঠেলেঠুলে বেদি-অভিমুখেই অগ্রসর হলো আবার। এক গ্লাস জল আর একটি জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ফিরে এল সে, কুটিরের মাঝখানে ভূমিতলে বসাল বাতিটি। বাতিটির চারপাশে এক-কেন্দ্রিক দুটি বৃত্তাকারে ঢেলে দিল জলটা এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, উন্মত্তের মতো চোখ তুলে চালার দিকে তাকাল। গোটা শরীরটা কাঠ হয়ে গেল তার, আর তখনও অপেক্ষায় ছিল সে। 'সন্ত জর্জ আসছেন। দেখুন! দেখুন!' ফিসফিস করে বলল বাবুর্চিটি, চোখ তার ছিটকে বেরিয়ে আসছিল।

কিছু নাচিয়েদের মধ্যে ঘোরে পড়ে যাবার মতো লক্ষণই দেখা গেল যেন–

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পশ্চাদ্দেশে ন্যস্ত দু হাতের ঘোরতর এক ঘোর, আড়ষ্ট পদ-পাত, স্থির আর শূন্য দৃষ্টি। অন্যেরা দ্রুতি নিয়ে এল ছন্দে, মৃগী রোগীর মতো বেঁকে গেল পেছন দিকে, আর অস্ফুট কান্নার শব্দ জুড়ে দিল। ক্রমেই উচ্চগ্রামে চড়ল কান্নার শব্দ। এবং সমবেত তীক্ষ্ম একটি চিৎকারে তালগোল পাকিয়ে গেল যখন সব, সেই দলপতি, ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্তদৃষ্টি তখনও, ফুসফুসের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্রাণপণ হুংকারে বলে উঠল কিছু একটা। একই শব্দমালা পৌনঃপুনিক হলো হুংকারে সেই। 'দেখছেন', বাবুর্চিটি বলল, 'ও বলছে, ও-ই ঈশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্র।' কণ্ঠস্বরের বদলে চমকে গিয়ে ডি'আরাস্ট বাবুর্চিটির দিকে তাকালেন, হাত দুটি মুঠো করে এবং চোখ দুটি স্থির রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়ে নিজের জায়গা থেকে না সরেও অন্যদের পরিমিত পদ-সঞ্চালন অনুকরণ করছিল সে। তারপর দেখলেন, নিজের সবটুকু ওজন নিয়েই অল্প কিছু সময় নিজেও নেচেছেন তিনি, পা দুখানি অনড় রেখেই যদিও বা।

কিন্তু সবগুলো ড্রামই উদ্দাম বেজে উঠল আচমকা এবং লাল জ্যাকেটের মস্ত সেই শয়তান টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল সহসাই যেন। চোখে তার অগ্নিচ্ছটা, চার হাত-পা ঘুরপাক কাচ্ছে চারপাশে, ভাঁজ করা এক এক হাঁটুতে ভর দিয়ে লাফ মারছে সে, দ্রুততর করছে তার ছন্দ, যতক্ষণ না মনে হচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে যাবে সে অবশেষে। কিন্তু একটা লাফের মুখে অকস্মাৎই থমকে গেল সে, গর্বিত আর ভয়ংকর দৃষ্টি মেলে চারপাশে সকলের দিকে তাকাল, ড্রামগুলো বেড়ে উঠল বজ্র-নির্ঘোষে। একটা অন্ধকার কোণ থেকে সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে এল একজন নাচিয়ে, নতজানু হলো, এবং প্রেতাবিষ্ট সেই মানুষটির দিকে বাড়িয়ে ধরল ছোট্ট ছুঁচলো একটি তলোয়ার। দীর্ঘাঙ্গ নিগ্রোটি নিজের চারপাশে দৃষ্টি ক্ষেপণে ক্ষান্ত না দিয়েই গ্রহণ করল সেটি এবং নিজের মাথার চারপাশে চক্রাকারে ঘোরাল। সেই মুহূর্তে ডি'আরাস্ট লক্ষ করলেন, অন্যদের সঙ্গেই নেচে চলেছে বাবুর্চিটি। বাস্তকার তাঁর পাশ থেকে চলে যেতে দেখেননি তাকে।

রক্তিম অনিশ্চিত আলোয় বুক চেপে-ধরা ধুলো-বালি উঠল ভূমিতল থেকে. ঘনতর হলো বাতাস এবং চামড়ায় জড়িয়ে থাকল যেন। ক্লান্তিতে ক্রমেই অবসন্ন বোধ করলেন ডি'আরাস্ট এবং আগের চেয়েও বেশি কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। এমনকি নাচতে নাচতে কেমন করে নাচিয়েরা বিশাল সেই সিগারেট হস্তগত করে ধূমপান করছিল তখন, সেটাও নজরে পড়েনি তাঁর। অদ্ভুত তাদের শরীরী গন্ধে ভরে ছিল সেই কুটির আর টলিয়ে দিচ্ছিল মাথাটাকে তাঁর। সামনে দিয়ে বাবুর্চিটিকেই যেতে দেখলেন তিনি কেবল, তখনো নাচছে আর সিগারেটে টান দিচ্ছে সে। 'ধূমপান করো না', বললেন তিনি। ছন্দপতন না ঘটিয়েই অস্ফুট শব্দ করল বাবুর্চিটি, মাঝখানের খাম্বার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, এক্ষুনি ধরাশায়ী হবে এমন এক মুষ্টিযোদ্ধার ভঙ্গিতেই যেন। দীর্ঘ কম্পনে কুঁকড়ে যাচ্ছিল তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শিরদাঁড়া। ভারী চেহারার একজন নিগ্রো রমণী জান্তব তার মুখখানি এ-পাশ থেকে ও-পাশে ঘুরিয়ে অবিরাম চেঁচিয়ে যাচ্ছিল পাশাপাশি তার। কিন্তু আরও বীভৎস ঘোরের ভেতরে চলে গেল নিগ্রো যুবতীরা, মেঝেয় সেঁটে রইল পা তাদের, আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত খিঁচুনির তীব্রতায় ঝাঁকিয়ে উঠছিল দেহগুলো, কাঁধ অবধি পৌঁছেই তীব্রতর হচ্ছিল সেই কম্পন। সামনে-পেছনে মাথাগুলো তাদের প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল এমন, যেন শরীর থেকে কেটে আলাদা করে ফেলা হয়েছে সেগুলো। সেইসঙ্গে দীর্ঘ, সমবেত আর সুরহীন গলায় অবিরাম চিৎকার করতে শুরু করে দিলে সকলেই, মনে হলো, নিঃশ্বাস অথবা স্বর-ধ্বনির ওঠা-পড়ার বিরতি ছাড়াই– আঁটো করে বেঁধে রাখা হয়েছে দেহগুলো যেন, পেশি আর স্নায়ুসহ, চরমতম বিস্ফোরণের অপেক্ষায়, তাদের প্রতিটি মানুষকেই সেখানে, তখনও পর্যন্ত পুরোদস্তুর নির্বাক ছিল যারা, কণ্ঠস্বরে ফিরিয়ে আনতে শেষমেশ। আর তখনও চিৎকাররত, এক এক করে পড়ে যেতে লাগল রমণীর দল। কৃষ্ণাঙ্গ দলপতি তাদের প্রত্যেকের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল এবং বিশাল কালো পেশিবহুল তার হাতখানি দিয়ে দ্রুত এবং খিঁচুনির মতো চেপে ধরল তাদের কণ্ঠা। উঠে দাঁড়াল তারা, টলমলে পায়ে ফিরে গেল নাচে, এবং চিৎকার শুরু করে দিল ফের, প্রথমে নিচু গলায়, তারপরে উঁচু এবং দ্রুতগলা, পুনরায় পড়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং উঠেদাঁড়ানো এবং শুরু করে দিতে ফের, আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য, যতক্ষণ না সমবেত সেই চিৎকার কমতে থাকল, বদলাল এবং ভেঙে ছড়িয়ে গেল কুকুরের কর্কশ ডাকে,বাতাসের জন্য হা-মুখ কাঁপিয়ে দিয়ে তাদের। বিধ্বস্ত ডি'আরাস্ট, স্থির হয়ে দাঁড়ালেন যখন, দীর্ঘ নাচের কারণে পেশিগুলো তাঁর টানটান, আপন নৈঃশব্দ্যে দমবন্ধ হয়ে টলে পড়ছেন বলে অুভব করলেন নিজেকে। সেই তাপ, ধুলো-বালি, সিগারেটের ধোঁয়া, শারীরিক গন্ধ বাতাসকে নিঃশ্বাসের অযোগ্য করে তুলেছিল প্রায়। বাবুর্চির খোঁজে তাকালেন তিনি, অদৃশ্য সে। দেয়াল-ঘেঁষে ছেড়ে দিলেন নিজেকে ডি'আরাস্ট এবং উদগত বমি রুখে বসে পড়লেন উবু হয়ে।

চোখ মেলে তাকালেন যখন, তখনও তেমনই শ্বাসরোধী বাতাস, কিন্তু কোলাহল থেমে গেছে। ড্রামগুলোই কেবল বেজে চলেছে নিচু সুরে এবং কুটিরের প্রতিটি কোণে সাদা কাপড়ে ঢাকা প্রতিটি দল পায়ে তাল ঠুকে সময় কাটাচ্ছিল। কিন্তু ঘরটির কেন্দ্রে, গ্লাস এবং মোমবাতিটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে যেখান থেকে, এখন একদল কৃষ্ণাঙ্গী নারী অর্ধ-আবিষ্ট নেচে চলেছিল ধীরে, বাজনার শব্দকে নিরন্তর পাশ কাটিয়ে যেতে দিয়ে তাদের। চোখগুলো মুদিত, যদিও খাড়াই দাঁড়িয়ে ছিল তারা, পায়ের বুড় আঙুলে ভর দিয়ে হালকাভাবে দুলছিল, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে প্রায়। তাদের ভেতরে মোটাসোটা দুজন খেজুর পাতায় মুখ আড়াল করে রেখেছিল নিজেদের। দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে আর মনোরম পোশাকে আর একটি মেয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা। হঠাৎই চিনতে পারলেন ডি'আরাস্ট মেয়েটি তাঁরই আমন্ত্রকের কন্যা। সবুজ পোশাক আর [illegible]নের দিকে খাড়াই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পালক-সজ্জিত নীল মসলিনের শিকারি মহিলার টুপি-পরা মেয়েটির হাতে ধরা ছিল সবুজ আর হলুদ রঙের ধনুক এবং একটি তীর, মাথায় যার বাঁধা ছিল, রং-বেরঙের পাখি একটা। ছিপছিপে দেহের ওপরে সুন্দর মাথাখানি তার দুলছিল অল্প-অল্প, সামান্য হেলে পড়ছিল পেছন দিকে আর ঘুমজড়ানো মুখে তার আভাসিত হচ্ছিল নিষ্পাপ এক বিষণ্নতা। বাজনার ক্ষণিক বিরতিতে বেসামাল হচ্ছিল তার পা, আধা-জাগরণে আছে যেন সে। তবুও ড্রামের বাজনা নিবিড়তর বেজে উঠলে এক ধরনের গোপন উৎসাহের সঞ্চার ঘটল ভেতরে তার, যাকে কেন্দ্র করেই বলয়িত হবে নৃত্য-ভঙ্গিমা, বাজনার তালে তালেই থেমে যেতে আবার; ভারসাম্যের প্রান্তসীমায় টলমল করতে করতে তীক্ষ্ম অথচ সুরেলা অদ্ভুত এক পাখির কুহরে ডেকে উঠল সে।

ধীর সেই নাচে মজে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গিনী সেই অপরূপ দেবীকে দেখছিলেন ডি'আরাস্ট, হঠাৎই বাবুর্চিটি উদয় হলো সামনে তাঁর, মসৃণ তার মুখখানি ভাঙাচোরা এখন। চোখ থেকে লোপাট দয়ামায়া, সন্দেহাতীত তীব্র এক লালসা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ্য নয় সেখানে। ঠাণ্ডা গলায়, যেন একজন অপরিচিতকেই বলা হচ্ছে, বলল সে 'দেরি হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন। সারা রাত ধরেই নাচতে চলেছে এরা, কিন্তু তোমার উপস্থিতি এখন আর চাইছে না এরা।' ভারী হয়ে আছে মাথা, ডি'আরাস্ট উঠে দাঁড়ালেন এবং বাবুর্চিটিকে অনুসরণ করলেন। দেয়াল বরাবর দরজার দিকে এগিয়ে গেল বাবুর্চিটি। চৌকাঠে পৌঁছে একপাশে সরে দাঁড়াল বাঁশের দরজাটি ধরে, ডি'আরাস্ট বেরিয়ে গেলেন। ফিরে দাঁড়ালেন তিনি এবং বাবুর্চিটির দিকে তাকালেন, দাঁড়িয়েই আছে সে। 'এসো। একটু বাদেই তো পাথরটা বইতে হবে তোমাকে।'

'আমি থেকে যাচ্ছি', ভাবলেশহীন চোখে জানাল বাবুর্চিটি।

'আর তোমার প্রতিশ্রুতি?'

উত্তর না দিয়েই একটু একটু করে দরজাটা ঠেলতে লাগল বাবুর্চিটি, এক হাতে ডি'আরাস্ট খুলে ধরে রেখেছিলেন সেটাকে। যতক্ষণ না হাল ছেড়ে দিলেন ডি'আরাস্ট, এক মুহূর্ত এভাবেই রইলেন তাঁরা। কাঁধ দুটি ঝাঁকালেন তিনি। চলে গেলেন।

টাটকা সুগন্ধে ভরপুর ছিল সেই রাত। বনের মাথায় দক্ষিণ আকাশে দুর্নিরীক্ষ্য ধূলি-কণায় ঝাপসা কয়েকটি তারা মিটমিট করে জ্বলছিল। ভারী লিছ আর্দ্র বাতাস। তবুও কুটির থেকে বেরিয়ে আসতেই মনে হলো স্নিগ্ধ একটা শীতল আমেজ। পেছল ঢাল বেয়ে উঠলেন ডি'আরাস্ট, খানা-খন্দে মত্ত মানুষের মতো টলমলে পায়ে। চাপা শব্দ উঠছিল অদূরের বন থেকে। নদীর কলধ্বনি বাড়ছিল। গোটা ভূখণ্ডই যেন উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল রাতের জঠর থেকে, আর ঘৃণায়, আক্রান্ত হলেন ডি'আরাস্ট। তাঁর মনে হলো পুরো এ দেশটাকেই উগরে ফেলতে বিবমিষা যেন তাঁর, বিশাল বিস্তারের বিষণ্নতা, বনানীর ধূসর-সবুজ আলো, আর,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অন্তহীন বিবিক্ত এর নদ-নদীর নৈশ তরঙ্গ-ভঙ্গ। ভয়ানক বিশাল এই ভূমিখণ্ড, রক্ত আর ঋতু একাকার হয়ে গেছে, আর সময় তরলীভূত। মাটিতেই দীপ্ত এখানকার প্রাণশক্তি, আর এরই সঙ্গে একাত্ম হতে গেলে কর্দমাক্ত অথবা শুকনো ভূমিতলেই শুয়ে পড়তে হবে আর ঘুমোতে হবে বছরের পর বছর। ওই তো সামনে, ইউরোপ জুড়ে অবজ্ঞা আর ক্রোধ। এখানে, নির্বাসন অথবা নির্জনতা, উদাসীন আর মূর্ছাপ্রবণ মত্ত মানষগুলোর মাঝখানে, মৃত্যুর জন্যই নৃত্য যাদের। কিন্তু গাছপালার গন্ধ-বিধুর আর্দ্র এই রাতের হৃদয় চিরে রূপসী নিদ্রালসা সেই মেয়েটির গলায় আহত পাখির অরুন্তুদ সেই কুহর এখনও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি।

মাথা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল আধ-কপালের যন্ত্রণায়, নষ্ট একটা ঘুমের শেষে জেগে উঠলেন যখন ডি'আরাস্ট, শহর এবং নিশ্চল বনের মাথায় ভারী হয়ে চেপে ছিল আর্দ্র এক উত্তাপ তখন। হাসপাতালের গাড়ি বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন তিনি, বন্ধ হয়ে-যাওয়া হাত-ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি রেখে, সময় কত– জানেন না, ছড়ানো দিনের আলো আর শহরের নৈঃশব্দ্যে হতবাক হয়ে। প্রথম বিবর্ণ ছাদগুলোর ওপরে নিচু হয়ে ঝুলে আছে নীলাভ আকাশ। উত্তাপে জড়ভরত হলদে উড়ুবাস পাখির ঝাঁক হাসপাতালের উলটোদিকের ঘরবাড়ির ছাদে ঘুম লাগাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একটা আচমকাই ঝাপটে উঠল ডানা, ঠোঁট ফাঁক করল, পাখসাট দুবার, উঠে গেল ছাদের ওপরে কয়েক ইঞ্চি, পড়ে গেল ফের, আর ঘুমিয়ে পড়ল তক্ষুনি প্রায়।

শহরের দিকেই হেঁটে গেলেন বাস্তকার। প্রধান উদ্যানটি, যেসব রাস্তা ধরে এইমাত্র হেঁটে এলেন তিনি, তাদের মতোই খাঁ খাঁ করছিল। দূরে, আর নদীটির দুই পাড়ে, বনের মাথায়, নিচু কুয়াশার ঝুল। উল্লম্ব ঝরে পড়ছিল উত্তাপ, ছায়াচ্ছন্ন একটি জায়গা খুঁজতে লাগলেন ডি'আরাস্ট। সেই মুহূর্তে, একটা বাড়ির ঝুল-বারান্দায়, ছোট্ট একটি মানুষকে তাঁর দিকে ইশারা করতে দেখতে পেলেন তিনি। কাছে গেলে সক্রেটিসকে চিনতে পারলেন।

'এই যে, মি. ডি'আরাস্ট, উৎসবটা ভালো লেগেছে আপনার?'

ডি'আরাস্ট জানালেন, কুটিরের ভেতরটা ভয়ানক গরম ছিল, আর আকাশ আর রাতের বাতাসই ভালো লেগেছিল তাঁর।

'হ্যাঁ, সক্রেটিস বলল, 'আপনাদের দেশে সকলেই জমায়েত হয় শুধু। কেউ নাচে না।' দু হাত ঘষল সে, একপায়ে লাফ মারল, পাক খেল, হেসে উঠল উচ্চৈঃস্বরে। 'সম্ভব নয়, তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' ডি'আরাস্টের দিকে অনসুন্ধিৎসুর চোখে তাকাল সে অতঃপর। 'আর আপনি, আপনি কি জমায়েতে যাচ্ছেন?'

'না।'

'তাহলে, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'কোথাও না। জানি না আমি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আবার হেসে উঠল সক্রেটিস। 'সম্ভব নয়! গির্জা ছাড়া একজন নোব্‌ল, কিছু ছাড়া এক্কেবারে!'

হেসে ফেললেন ডি'আরাস্টও। 'হুঁ, দেখ, আমার জায়গা কখনোই খুঁজে পাইনি আমি। তাই বিদায় হই আমি।'

'আমাদের সঙ্গেই থেকে যান মি. ডি'আরাস্ট, আপনাকে ভালোবাসি আমি।'

'ইচ্ছে তো আমারও, সক্রেটিস, কিন্তু নাচতে তো জানি না আমি।' সুনসান শহরের শব্দহীনতায় প্রতিধ্বনিত হলো হাস্যরোল তাঁদের।

'আহ্‌', সক্রেটিস বলল, 'ভুলে গেছিলাম। মেয়র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। ক্লাবেই দুপুরের খাবার খাচ্ছেন তিনি।' এবং কিচ্ছু না বলেই হাসপাতালের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল সে।

'যাচ্ছ কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠলেন ডি'আরাস্ট।

নাকডাকার ভঙ্গি করল সক্রেটিস। 'ঘুমোব। শিগগিরই শোভাযাত্রা।' এবং প্রায় ছুটতে ছুটতে নাক ডাকতে শুরু করে দিল আবার সে।

শোভাযাত্রা দেখার জন্য ডি'আরাস্টকে সম্মানজনক একটা জায়গা দেবার জন্যই মেয়র চেয়েছিলেন কেবল। মাংস-ভাতের একটা প্লেট থেকে, অলৌকিকভাবে যা কিনা সুস্থ করে দেয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন রোগীকেও, দুজনে খেতে খেতে সেই কথাটাই বিশদ করছিলেন মেয়র। গির্জার উলটোদিকে, বিচারকের বাড়ির বারান্দায়, প্রথমেই জায়গা নিয়ে শোভাযাত্রাটাকে বেরিয়ে আসতে দেখবেন তাঁরা। তারপর গির্জামুখী প্রধান পথে টাউন হলে চলে যাবেন, অনুতপ্ত পাপীরা ফেরার সময় সেই পথটি ধরবে। বিচারক এবং পুলিশ-প্রধান সঙ্গী হবেন ডি'আরাস্টের, উৎসবে অংশগ্রহণের দায় আছে মেয়রের যেহেতু। পুলিশ-প্রধান আসলে ক্লাবঘরেই ছিলেন এবং অক্লান্ত হাসিতে সৌজন্য প্রকাশ করে চলেছিলেন ডি'আরাস্টের প্রতি, দুর্বোধ্য কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সাধুবাদ বর্ষণ করতে করতে তাঁর উদ্দেশ্যে। ডি'আরাস্ট যখন বেরোলেন সব দরজা খুলে দিয়ে দ্রুত তাঁর যাবার রাস্তা করে দিলেন তিনি।

জ্বলন্ত সূর্যের নিচে, তখনও সুনসান শহরে, সেই মানুষ দুজন বিচারকের বাড়ির দিকে হেঁটে চললেন। নৈঃশব্দ্যের ভেতরে তাঁদের পদশব্দই ছিল একমাত্র শ্রবণ-গোচর। কিন্তু সহসাই একটা আতশবাজি কাছেরই একটা রাস্তায় বিস্ফোরিত হলো এবং প্রতিটি ছাদে নির্লোম-কণ্ঠ, ভারী, ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া উড়ুবাসের ঝাঁককে উদ্ভাসিত করে দিল তা। সেই মুহূর্তেই প্রায় চারদিকে ছিটকে গেল কয়েক ডজন আতশবাজি, দরজাগুলো খুলে গেল, আর মানুষজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আর অপরিসর রাস্তাগুলোকে ভরে দিতে শুরু করে দিল।

বিচারকমশাই ডি'আরাস্টকে জানালেন, সামান্য তাঁর এই ভদ্রাসনে তাঁকে প্রত্যুদগমনে কতটাই গর্বিত তিনি এবং খড়িমাটির মতো নীল রঙের সুদৃশ্য জমকালো একটি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে চললেন তাঁকে। ডি'আরাস্ট এগোতে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ল্যানডিং-এ, দরজাগুলো খুলে গেল আর চাপা হাসিতে শিশুদের কালো মাথাগুলো উঁকি মেরেই মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। মূল ঘরটিতে, স্থাপত্যে সুন্দর, পাম-কাঠের আসবাব আর জোরালো কণ্ঠের পাখিতে পূর্ণ মস্ত খাঁচ ছাড়া কিছুই ছিল না আর। বিচারকমশাই এবং ডি'আরাস্ট যে ঝুল-বারান্দায় বসলেন, গির্জার সামনে ছোট্ট উদ্যানটির সবটাই দৃশ্যমান সেখান থেকে। জনতা জমতে শুর করেছিল সেখানে তখন, আকাশ থেকে প্রায় দৃশ্যমান তরঙ্গে নেমে-আসা উত্তাপে আশ্চর্য মৌন আর গতিহীন। একমাত্র শিশুরাই হুটোপুটি করছিল উদ্যানজুড়ে, হালকা আতশবাজিতে বেমক্কা থমকে গিয়ে এবং দ্রুত পরম্পরায় একজন থেকে আর একজনে চাউর হচ্ছিল চকিত খবর। পলেস্তারার দেয়াল, বারোটি নীল ধাপ, নীল আর সোনালি চুড়োর মালায় ঝুল-বারান্দা থেকে আরও খাটো দেখাচ্ছিল গির্জাটাকে।

আচমকাই গির্জার ভেতরে ফেটে পড়ল বাজনা। জনতা, গাড়ি বারান্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে, ছড়িয়ে গেল উদ্যানের চারপাশে। পুরুষেরা তাদের টুপি খুলে ফেলল, আর নতজানু হলো মেয়েরা। অনেকটা কুচকাওয়াজের মতোই বিলম্বিত বেজে চলল দূরের সেই বাজনা। বিদঘুটে উড়ানের শব্দ ভেসে এল বনাঞ্চল থেকে। স্বচ্ছ ডানা আর নড়বড়ে কাঠামোর খুদে একটা উড়োজাহাজ, চির-যৌবনবতী এই পৃথিবীতে একেবারেই বেমানান, গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে দৃশ্যমান হলো, ঝাপট মেরে গেল উদ্যানের একটু ওপরে, আর এরই অভিমুখে তুলে-ধরা মাথাগুলোর ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল গুরু-গর্জন-ধ্বনিতে। তারপর ঘুরে গেল এটা এবং অদৃশ্য হয়ে গেল সাগর-খাঁড়ি-বরাবর।

কিন্তু গির্জার ছায়াতলে অস্পষ্ট একটা হুড়োহুড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করল আবার। বাজনা থেমে গেছে, পেতলের ভেঁপু আর ড্রামের শব্দ ছিল বদলে এখন তার, সবটাই অদৃশ্য গাড়ি বারান্দার নিচে। কালো যাজকীয় পোশাকে নির্বিণ্ন মানুষেরা গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছিল এক এক করে, দরজার বাইরে দল তৈরি করছিল, এবং ধাপগুলো দিয়ে নামতে শুরু করেছিল। তাদের পেছনে আসছিল লাল আর নীল নিশান হাতে শ্বেতাঙ্গ অনুতাপী মানুষেরা, তারপর দেবদূতের বেশে বালকদের ছোট্ট একটি দল, সামান্য কালো আর গম্ভীর মুখের মেরি-মায়ের সন্ততিদের ভ্রাতৃ-সমাজ। শেষমেশ, কৃষ্ণবর্ণ পোশাকে ঘর্মাক্ত, অগ্রণী নাগরিকবৃন্দের দ্বারা বাহিত বহুবর্ণের একটি বেদিতে বেরিয়ে এল মহান যিশুর নিজেরই একটি প্রতিমূর্তি, হাতে একটি বেত এবং মাথায় কাঁটার মুকুট, ধাপগুলোর ওপরে সারি দিয়ে দাঁড়ানো জনতার ওপরে– রক্তাক্ত আর বেপথু।

একেবারে নিচের ধাপে বেদিটি যখন পৌঁছল, ক্ষণিক সেই বিরতিতে খানিকটা শৃঙ্খলায় পাশাপাশি দাঁড়াবার চেষ্টা করল সেই অনুতাপীরা। এর পরেই জাহাজি সেই বাবুর্চিটিকে দেখতে পেছনে ডি'আরাস্ট। কোমরের ঊর্ধ্বঙ্গ অনাবৃত তার, একটা শোলার গদির ওপরে আয়তকার বিশাল এক শিলাখণ্ড শ্মশ্রুমণ্ডিত মুণ্ডের ওপরে বহন করে গাড়ি বারান্দার নিচ থেকে কোমর বেরিয়ে এসেছে সে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দৃঢ় পদক্ষেপেই গির্জার ধাপ বেয়ে নিচে নেমে এল সে, খর্বুটে, পেশিবহুল দু হাতের খিলানে নিখুঁত ভারসাম্যে পাথরটিকে বসিয়ে। বেদির পেছনে পৌঁছতেই সে, শোভাযাত্রা এগোতে শুরু করল। গাড়ি বারান্দা থেকে তুমুল বাজনায় ফেটে পড়ল বাজনদাররা, পরনে উজ্জ্বল রঙের কোট এবং পেতলের ভেঁপু বাজাচ্ছিল তারা। দ্রুত কুচকাওয়াজের ছন্দে অনুতাপী মানুষেরা চলার গতি বাড়িয়ে দিল তাদের এবং উদ্যান পেরিয়েই একটি পথে পৌঁছে গেল। তাদের পেছনে বেদিটি যখন অদৃশ্য হয়ে গেল, সেই বাবুর্চিটি আর শেষ বাজনদার ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না তখন আর। তাদের পশ্চাতে, আতশবাজির বিস্ফোরণের ভেতরে চলতে শুরু করল জনতা, আর সেই উড়োজাহাজটি, ইঞ্জিনের গুরু-গর্জনে পিছিয়ে-পড়া দলগুলোর মাথায় ওপরে উড়ে এল ফিরে-ফিরতি। ডি'আরাস্ট সেই বাবুর্চিটির দিকেই তাকিয়ে ছিলেন একমাত্র, পথেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল সে তখন, আর সহসাই মনে হলো তাঁর, লোকটির কাঁধ দুটি বেঁকে যেতে দেখলেন যেন। কিন্তু সেই দূরত্বে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না কিছু তিনি।

বন্ধ দোকান-পাট এবং দরজার মাঝখান দিয়ে সুনসান রাস্তা পেরিয়ে বিচারক, পুলিশ-প্রধান এবং ডি'আরাস্ট পৌঁছে গেলেন টাউন হলে। বাজনদার আর আতশবাজি থেকে সরে এলে তাঁরা, নৈঃশব্দ্য শহরটার দখল নিয়ে নিল ফের এবং গুটিকয় উড়ুবাস ইতিমধ্যে ছাদগুলোর পুরনো অবস্থানে ফিরে এসেছিল আবার, আবহমানের দখলদারি সেখানেই যেন তাদের। প্রান্তীয় কোনও অঞ্চল থেকে গির্জার উদ্যানের দিকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘ, সংকীর্ণ একটি পথের ওপরে টাউন হলটির অবস্থান। সেই মুহূর্তে, ফাঁকা ছিল পথটি। যতদূর চোখ যায়, ঝুল-বারান্দা থেকে অজস্র খানা-খন্দ-বহুল শান-বাঁধানো পথ ছাড়া কিছু দৃষ্টিগোচর নয় আর, সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে পাঁক জমে আছে সেখানে। সূর্য, একটু নিচেই এখন, পথের দু পাশে জানালাবিহীন ঘরবাড়ির সামনেটা ঠুকরে চলেছিল তখনও। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেন তাঁরা, বিপরীত দেয়ালে সূর্য-বিচ্ছুরণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, যতক্ষণ না ক্লান্তি আর মাথা ঝিম-ঝিম করা ফিরে অনুভব করলেন তিনি। সুনসান রাস্তা আর নির্জন ঘরবাড়ি একই সঙ্গে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করতে লাগল তাঁকে। এ দেশ ছেড়ে আরও একবার চলে যাবার বাসনা হলো তাঁর; সেইসঙ্গে মস্ত সেই শিলা-খণ্ডের কথাও ভাবলেন তিনি; সেই কৃচ্ছ্রসাধনের অবসান হোক– এটাও অভিপ্রেত ছিল তাঁর। নিচে নেমে গিয়ে কিছু একটা খোঁজার কথা বলতে যাবেন, এমন সময় তুমুল শব্দে বেজে উঠতে শুরু করল গির্জার ঘণ্টা। একই সঙ্গে, তাঁদের বাঁ দিকে পথের অপর প্রান্তে থেকে, উৎক্ষিপ্ত হলো একটি কোলাহল আর আবির্ভূত হলো রৌদ্র-দগ্ধ একদল মানুষ। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল দল বেঁধে বেদির চারপাশে পাক খাচ্ছিল তারা, মিলেমিশে গিয়েছিল পুণ্যার্থী আর অনুতাপীর দল এবং আতশবাজি আর উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে অপরিসর সেই পথ বেয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তারা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কানায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কানায় পূর্ণ হয়ে গেল সেই পথ, অবর্ণনীয় এক বিশৃঙ্খলায় টাউন হলের দিকে এগোতে লাগল তারা– বয়স, জাতি এবং পরিধেয়, বিস্ফোরিত চোখ আর কোলাহলমুখর মুখের মিছিলে একাকার হয়ে গেল। জ্বলন্ত সূর্যালোকে ম্রিয়মাণ হয়ে আসা অগ্নিশিখা নিয়ে একদল মোমবাহী বর্শাফলকের মতোই বেরিয়ে এল জনতার ভেতর থেকে। কিন্তু কাছে এসে পৌঁছল যখন, ঝুল-বারান্দার নিচে জনতার ভিড়ের চাপ এমনই ছিল যে মনে হতে লাগল, দেয়াল বেয়েই ওপরে উঠে আসছে বুঝি তার; ডি'আরাস্ট দেখতে পেলেন জাহাজি বাবুর্চিটি সেখানে নেই।

বিদ্যুৎ-ঝলকেরই মতো তড়িৎগতিতে, কোনও মার্জনা ভিক্ষা ছাড়াই, ঝুল-বারান্দা এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি, লাফিয়ে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে, ঘণ্টা আর আতশবাজির কর্ণ-বিদারী শব্দের ভেতরে পথে এসে দাঁড়ালেন। সেইখানে আনন্দমুখর জনতা, মোমবাতি-বাহক আর অভিভূত অনুতাপী মানুষের ভিড় ঠেলে এগোতে হলো তাঁকে। কিন্তু সমস্ত তাঁর শক্তি প্রয়োগে মানুষের সেই ঢেউ কাটিয়ে দুর্দমনীয় এমন এক গতিতে নিজের জন্য পথ করে নিলেন তিনি যে বেসামাল হয়ে পড়েই গেলেন প্রায়, জনতা পেরিয়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে অবশেষে মুক্তি পেলেন যখন। অগ্নি-তপ্ত দেয়ালে ঠেস দিয়ে যতক্ষণ না নিঃশ্বাস নিতে পারলেন, অপেক্ষা করে রইলেন তিনি। তারপর চলতে শুরু করলেন আবার। সেই মুহূর্তে পথের ওপরে উপস্থিত হলো একদল মানুষ। সামনের দিকে ছিল যারা, পেছনের দিকে হাঁটছিল তারা সব এবং ডি'আরাস্ট দেখতে পেলেন বাবুর্চিটিকে বেষ্টন করে আছে তারা।

স্পষ্টতই সে ছিল ভয়ানক ক্লান্ত। থামল সে, তারপর, মস্ত সেই শিলাখণ্ডের নিচে ন্যুব্জ দেহে খালাসি আর কুলিদের ত্রস্ত পদক্ষেপে দৌড়ে গেল খানিকটা– দ্রুত আর একঘেয়ে থপথপে পদক্ষেপ। সে থামলে পরে ধুলো আর মোমের ফোঁটায় প্রার্থনার নষ্ট পোশাকে চারপাশে জমায়েত অনুতাপীরা উৎসাহী করল তাকে। তার বাঁ-পাশে তার ভাই নিঃশব্দে হাঁটছিল কিংবা ছুটছিল। ডি'আরাস্টের মনে হলো, তাঁদের মধ্যবর্তী স্থানটুকু পূর্ণ করতে অনন্ত সময় নিচ্ছিল তারা। প্রায় তাঁর কাছটিতে পৌঁছে বাবুর্চিটি থামল আবার এবং নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে দেখল চারপাশ। ডি'আরাস্টকে দেখল সে যখন– তাঁকে চিনতে না পারার মতো করেই– থমকে দাঁড়াল সে, ঘুরে দঁড়াল তাঁর দিকে। তৈলাক্ত, নোংরা ঘামে জবজবে তার মুখ, ধূসর দেখাচ্ছিল; সুতোর মতো থুতুতে ভরা ছিল দাড়ি তার; আর বাদামি শুকনো ফেনা আঠার মতো জুড়ে দিয়েছিল ঠোঁট দুটিকে। হাসতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু গুরুভারের তলায় অস্থির, গোটা তার শরীরটাই বিকম্পিত হচ্ছিল, কাঁধ দুটি ছাড়া কেবল, মাংসপেশিগুলো স্পষ্টতই একটা খিঁচুনির পরবশ। ভাইটি, ডি'আরাস্টকে চিনতে পেরেছিল যে এ কথাটুকুই বলল তাঁকে 'এর মধ্যেই পড়ে গিয়েছিল ও।' আর সক্রেটিস, শূন্য থেকেই মুখ বাড়িয়ে যেন, কানের কাছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফিসফিস করল তাঁর 'বেশি নাচানাচি করেছে, মি. ডি'আরাস্ট, গোটা রাতভর। ক্লান্ত ও।'

ঝাঁকুনি দেওয়া পায়ে বাবুর্চিটি এগোল আবার, এগোতেই চায় এ রকম কোনও মানুষের মতো নয়, গুঁড়িয়ে দেওয়া গুরুভার থেকে পালিয়ে যেতেই বরং, গতির কারণেই হালকা হয়ে যাবে– এই আশায়। ডি'আরাস্ট নিজেকে ঠিক তার ডান পাশেই দেখতে পেলেন, কেমন করে, জানেন না তা। আলতো করে নিজের হাতখানি রাখলেন তিনি বাবুর্চিটির পিঠে এবং দ্রুতি ভারী পদক্ষেপে হেঁটে চললেন পাশপাশি তার। পথের অন্য প্রান্তে, অদৃশ্য হয়ে গেছে বেদি, আর সেই জনতা, উদ্যানটি সম্ভবত পূর্ণ করে রেখেছিল যারা, আর এগোচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। কয়েক মুহূর্ত তার ভাই আর ডি'আরাস্টের মাঝখানে এগিয়ে গেল বাবুর্চিটি। কুড়ি গজের মতো একটা জায়গা চট করেই সেই দলটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল তাকে, টাউন হলের সামনে তার চলে যাওয়া দেখার জন্য জমায়েত হয়েছিল যারা। আবার, থেমে গেল যদিও সে। ডি'আরাস্টের হাত ভারী হয়ে এল। 'এগিয়ে এসো বাবুর্চি, এই আর একটু মাত্র', বললেন তিনি। মানুষটি কেঁপে উঠল, মুখ থেকে আবার থুতু গড়িয়ে পড়তে লাগল তার, গোটা তার শরীর থেকে কুলকুল করে বইতে লাগল ঘাম। গভীর প্রশ্বাসের চেষ্টা করল সে এবং থামল। আবার শুরু করল চলতে, তিন পা এগোল এবং টলমল করল এবং আচমকাই সেই শিলাখণ্ড পিছলে পড়ে গেল তার কাঁধে, কেটে বসে গেল এবং ভূমিতলে পড়ে গেল তারপর। ভারসাম্য হারিয়ে তাঁরই দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বাবুর্চিটি। এগিয়ে ছিল যারা সামনে এবং তাড়া দিচ্ছিল, বিকট চিৎকারে লাফিয়ে পিছিয়ে এল তারা। তাদের মধ্যে একজন শোলার টুকরোটি ধরে ফেলল, অন্যরা শিলাখণ্ডটি, তার ওপরে চাপিয়ে দিতে ফের।

ঝুঁকে পড়ে খালি হাতেই ডি'আরাস্ট তার কাঁধ থেকে রক্ত আর ধুলো মুছে নিলেন, ভূমিতলে মুখ রেখে খুদে সেই মানুষটি তখন হাঁপাচ্ছে। কিছুই শুনতে পেল না সে এবং নড়াচড়া করল না। ব্যাকুলভাবে মুখ হা করছিল সে, প্রতিটি নিঃশ্বাসই যেন অন্তিম তার। কোমরের চারপাশে বেড় দিয়ে ডি'আরাস্ট জাপটে ধরলেন তাকে এবং একটা শিশুর মতোই অনায়াসে তুলে ধরলেন। তাঁর শরীরে পূর্ণ দৈর্ঘ্যে এলিয়ে-থাকা খাড়া সেই মানুষটিকে শক্ত মুঠোয় ধরে, নিজের শক্তিকেই শরীরে তার সঞ্চারিত করে দিতেই ডি'আরাস্ট তার মুখের কাছে কথা বললেন যেন। পর মুহূর্তেই, রক্তাক্ত এবং ধুলো-মাটি-মাখা সেই বাবুর্চিটি, মুখময় অবসন্ন এক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে, বিচ্ছিন্ন করে নিল নিজেকে। টলতে টলতে শিলাখণ্ডটির দিকে এগিয়ে গেল সে, অন্যরা সামান্য তুলে ধরছিল সেটাকে তখন। কিন্তু থামল সে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শিলাখণ্ডটির দিকে এবং মাথাখানি নাড়ল তার। তার দুই পাশে ঝুলে পড়ল দু বাহু, এবং ডি'আরাস্টের দিকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঘুরে দাঁড়াল সে। বিধ্বস্ত মুখ বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুপ্রপাত। কথা বলতে চাইছিল সে, কথা বলছিলও, কিন্তু কোনও বর্ণমালাই তৈরি হচ্ছিল না মুখের ভেতর। 'আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম', বলছিল সে। আর, তারপর 'ওহ্, ক্যাপ্টেন! ওহ্ ক্যাপ্টেন!' অশ্রুতে রুদ্ধ হলো তার কণ্ঠ। সহসাই পেছনে হাজির হলো তার ভাই, দু পাশে ছড়িয়ে দিল তার হাত দুটি এবং বাবুর্চিটি, কাঁদতে কাঁদতেই, ভেঙে পড়ল তার গায়ে– পরাজিত, মাথাটাকে ছিটকে ফেলে পেছনের দিকে।

ডি'আরাস্ট তার দিকে তাকালেন, কী বলবেন ভেবে পেলেন না। দূরে জনতার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি, চিৎকার করছিল এখন তারা। আচমকাই, যারা ধরে রেখেছিল, শোলার টুকরোটা ছিনিয়েই নিলেন তাদের কাছ থেকে এবং শিলাখণ্ডটির দিকে অগ্রসর হলেন। অন্যদের সামনে সেটাকে তুলে ধরার ভঙ্গি করলেন তিনি এবং অনায়াসেই তুলে ফেললেন সেটাকে তারপর। শিলাখণ্ডের চাপে মাথা তাঁর অবনত, ন্যুব্জ দুটি কাঁধ, নিঃশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট, নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি নামালেন তিনি, শুনতে পেলেন বাবুর্চিটির ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। দৃঢ় পদক্ষেপে নিজেই চলতে শুরু করলেন তারপর, পথের প্রান্তসীমায় জনতার সঙ্গে তাঁর অবস্থানের দূরত্ব অতিক্রম করলেন ক্লান্তিবিহীন এবং প্রথম সারির ভিড় ভেদ করে, গমন-পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল যারা, সোৎসাহে পথ পরে নিলেন নিজের। ঘণ্টাধ্বনি আর আতশবাজির হট্টগোলে হঠাৎই চুপ মেরে-যাওয়া এবং হা করে বিহ্বল তাকিয়ে-থাকা দর্শকবৃন্দের ঠাসা দুটি জমায়েতের ভেতর দিয়ে উদ্যানে পৌঁছলেন তিনি। দুর্মর একই গতিতে এগোতে লাগলেন এবং গির্জায় যাবার জন্য জনতা পথ করে দিল তাঁকে। গুরুভার তাঁর মাথা আর গলা গুঁড়িয়ে দিতে শুরু করেছিল, তবুও গির্জা আর বেদিটি, তাঁরই জন্য দরজার কাছে অপেক্ষমাণ বলে মনে হচ্ছিল, দেখতে পেলেন তিনি। সেই দিকে লক্ষ করেই উদ্যানটির মধ্যভাগ ইতিমধ্যেই যখন পার হয়ে গিয়েছিলেন, নির্মমের মতোই, কেন, তা জানেন না, বাঁ দিকে দিক-বদল করলেন এবং পূণ্যার্থীদের মুখোমুখি হতে বাধ্য করে সরে গেলেন গির্জা থেকে। পেছনেই কিছু একটা দৌড়তে শুনতে পেলেন তিনি। তাঁর সামনে সব দিকেই মুখগুলো হা হয়ে গেল। চেঁচিয়ে কী বলছে তারা বুঝতে পারলেন না তিনি, তাঁর দিকে নিরন্তর বর্ষিত একটি পর্তুগিজ শব্দ যদিও বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হলো। হঠাৎই হাজির হলো সক্রেটিস, ত্রস্ত ঘূর্ণায়মান চোখে অসংলগ্ন কথা বলতে বলতে এবং তাঁরই পশ্চাদ্বর্তী গির্জার পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 'গির্জার দিকে! গির্জার দিকে!' সক্রেটিস এবং জনতা চিৎকার করে বলছিল তাঁকে। ডি'আরাস্ট তাঁরই নির্দিষ্ট পথে চলতে লাগলেন তবুও এবং একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সক্রেটিস, হাস্যকরভাবেই বাতাসে উত্তোলিত তার দুটি বাহু,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জনতাও চুপ মেরে গেল ক্রমেই। ডি'আরাস্ট প্রথম পথটিতে প্রবেশ করলেন যখন, বাবুর্চিটির সঙ্গে যেখানে ইতিপূর্বেই গিয়েছিলেন তিনি এবং সে কারণেই জানতেন– নদীর দিকেই নেমে গেছে তা, বিমূঢ় এক হট্টমালায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে ঠিক তাঁর পেছনেই উদ্যানখানি সেই।

মাথার ওপরে শিলাখণ্ডের ভার যন্ত্রণাবিদ্ধ করছিল তাঁকে এখন এবং সেই ভার হালকা করতে গিয়ে দীর্ঘ দু বাহুর সবটুকু শক্তিরই প্রয়োজন ঘটছিল তাঁর। পেছল ঢালের প্রথম পথে পৌঁছলেন যখন, কাঁধ দুটি ততক্ষণে কাঠ মেরে গিয়েছিল তাঁর। থামলেন তিনি এবং শুনলেন। একাকী ছিলেন তিনি। শোলার ভিতের ওপরে শক্ত করে শিলাখণ্ডটি বসালেন এবং সতর্ক কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপেই নেমে গেলেন কুটিরগুলোর দিকে। সেখানে পৌঁছতেই দম তাঁর নিঃশেষিত-প্রায়, শিলাখণ্ডের নিচে বাহু দুটি থর-থর কম্পমান। পায়ের গতি বাড়ালেন তিনি, শেষমেশ পৌঁছে গেলেন ছোট্ট সেই উদ্যানটিতে, বাবুর্চিটির কুটিরখানি দাঁড়িয়ে আছে যেখানে, দৌড়ে গেলেন কাছে তার, লাথি মেরে খুলে ফেললেন দরজা এবং ঘরের মাঝখানে তখনও জ্বলন্ত সেই অঙ্গারের ভেতরে আচমকাই ছুড়ে দিলেন শিলাখণ্ডটি। আর সেখানে, সহসাই মহীরূহ হয়ে-ওঠা পর্যন্ত সিধে তুলে ধরে নিজেকে, উদভ্রান্তের মতো দারিদ্র্য আর ভস্মরাশির পরিচিত সেই ঘ্রাণ গলাধঃকরণ করে দুর্বোধ্য আর শ্বাস-রোধ-করা উল্লাসের প্রবল এক অভিঘাত অন্তরে উৎক্ষিপ্ত হতে অনুভব করলেন, নামকরণে অক্ষম তিনি যার।

কুটিরবাসীরা পৌঁছল সেখানে যখন, পেছনের দেয়ালে কাঁধ রেখে ডি'আরাস্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তারা এবং নিঃশব্দে তাকাল ডি'আরাস্টের দিকে, প্রশ্নালু, যেন বা। কিন্তু কথা বললেন না তিনি। ভাইটি এরপর বাবুর্চিটিকে শিলাখণ্ডের দিকে নিয়ে গেল, সেখানেই ভূমিতলে পতন ঘটল তার। ভাইটি বসে পড়ল, ইশারায় ডেকে নিল অন্যদের। বৃদ্ধা রমণীটি তার কাছে গেল, তারপর আগের রাতের সেই মেয়েটি, কিন্তু কেউই ফিরে তাকাল না ডি'আরাস্টের দিকে। শিলাখণ্ডটি ঘিরে নিঃশব্দে একটি বৃত্ত রচনা করে উবু হয়ে বসে রইল তারা। ভারী বাতাস-বাহিত নদীর কল্লোল ছাড়া আর কোনও শব্দই পৌঁছচ্ছিল না তাদের কাছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, কোনও কিছু না দেখেই, শুনলেন ডি'আরাস্ট, আর সেই জল-কল্লোল পূর্ণ করে দিল তাঁকে তুরীয়ানন্দে। মুদ্রিত নেত্রে আনন্দে আপন শক্তির জয়গান করলেন তিনি, নবজীবনে উত্তরণের জয়গান করলেন আরবার। সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো একটি আতশবাজি, মনে হলো কাছেই খুব। বাবুর্চিটির পাশ থেকে সামান্য সরে গেল ভাইটি এবং ডি'আরাস্টের দিকে আধ-পাক ঘুরে কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়েই, খালি জায়গাটা দেখিয়ে দিল এবং বলল 'আমাদের সঙ্গে বসুন।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও